প্র থ ম আ লো

রসতত্ত্ব : নৃসিংহরসাদ ভাদুড়ি ❧ গাহিতে হয় দুজনে গান
শ্রদ্ধাঞ্জলি : রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ❧ প্যারিসে মিলান কুন্দেরার খোঁজে
অবিচুয়ারি : ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় ❧ বিদায় সমরেশ...শেষকথা ২৩শে এপ্রিল
ধ্রুপদী : সত্যম রায়চৌধুরী ❧ কবি ওয়ার্ডসওয়র্থ ও একটি ডায়েরি
শারদোৎসব : গৌতম ভট্টাচার্য ❧ পুজোর আজকালপরশু
স্বগোতক্তি : জয়ন্ত ঘোষাল ❧ সলিলকি... একাকী নির্জনে
দেশ কাল সমাজ : ইমানুল হক ❧ মিশ্র সংস্কৃতি ছাড়া দেশ বাঁচবেনা
স্মৃতিকথা : মাজাহারুল ইসলাম ❧ উদ্বাস্তু সরণি
ভ্রমণ : পটচিত্রে পুরী ❧ স্বর্ণাভা কাঁড়ার
শাহাব আহমেদ ❧ রাশিয়া, সুবর্ণ অঙ্গুরীয় ও কম্যুনারকা
পৌরাণিক : জয়তী রায় ❧ অমৃতকন্যা পুতনা
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী : রূপা মজুমদার ❧ মেরি কুরি, দাম্পত্য ও প্রেম
ধর্ম কর্ম : আশিস গুহ রায় ❧ কামাখ্যা তীর্থে অম্বুবাচী মেলা

গুচ্ছ কবিতা ❧
বীথি চট্টোপাধ্যায় এবং সাদাত হোসাইন

কবিতা ❧
মুহাম্মদ সামাদ অরুণ কুমার চক্রবর্তী কালীকৃষ্ণ গুহ অসীম সাহা অংশুমান কর পঙ্কজ সাহা
চৈতালী চট্টোপাধ্যায় শিবাশিস মুখোপাধ্যায় ঋজুরেখ চক্রবর্তী যশোধরা রায়চৌধুরী সুব্রতা ঘোষ রায়
স্মরণজিৎ চক্রবর্তী মৌ রায়চৌধুরী দুর্গাদাস মিদ্যা প্রীতি সান্যাল অনিন্দিতা বসু সান্যাল ঋত্বিক ঠাকুর প্রণতি ঠাকুর
তামান্না জাসমিন রামকৃষ্ণ মাহাত ধীমান ভট্টাচার্য প্রশান্ত ভট্টাচার্য শকুন্তলা সান্যাল অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
ফেরদৌস নাহার তাপস রায় তপন রায় প্রধান সুহিতা সুলতানা অর্পণা মৌলিক কিশোর ভট্টাচার্য অমিত চক্রবর্তী
ড. নির্মল বর্মন সত্যগোপাল দে সরোজ উপাধ্যায় সুধাংশুরঞ্জন সাহা অংশুমান চক্রবর্তী আশিস চৌধুরী নীলাঞ্জন শাণ্ডিল্য
সুদীপ দত্ত অনীশ ঘোষ অঞ্জনা সাহা স্বপন শর্মা মাসুদ পথিক মামুন রশীদ মোহম্মদ শাহবুদ্দিন ফিরোজ
মধুসূদন দরিপা ভক্ত গোপাল ভট্টাচার্য গৌতম ভরদ্বাজ সৈয়দ খালেদ নৌমান রাজা চক্রবর্তী প্রদীপ আচার্য রাজীব ঘোষ
অমিত কাশ্যপ সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় কানাইলাল জানা সোমা মুখোপাধ্যায় গার্গী মুখোপাধ্যায় সুদীপ্তা চট্টাপাধ্যায়
সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায় জবা চৌধুরী শান্তশ্রী চৌধুরী গোপা চক্রবর্তী শিবানী মুখার্জি পাণ্ডে
সুস্মেলী দত্ত অর্ঘ্য রায় উদ্দালক ভরদ্বাজ সুপ্তশ্রী সোম জয়তী চ্যাটার্জি আনিসুর রহমান শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

গল্প ❧
শঙ্করলাল ভট্টাচার্য সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম সৌমিত্র বিশ্বাস প্রবীর ঘোষ রায় চুমকি চট্টোপাধ্যায় দেবযানী বসু কুমার
ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় বোধিসত্ব রায় দীপান্বিতা রায় অদিতি সেন চট্টোপাধ্যায় অমৃতা মুখার্জি জয়নারায়ণ সরকার

অসংশোধনীয়

শঙ্খ ঘোষ নেই। সুনীলদা নেই। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নেই। তাঁদের লেখা আছে। কিন্তু তাঁদের রাজত্ব নেই। তাঁদের সিংহাসন শূন্য। সাহিত্য জগতে সব কবিদের আলাদা আলাদা রাজ্য আর রাজত্ব থাকে। আলাদা দল থাকে। এটা জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে যুগেও ছিল। সুনীল, শক্তি, শঙ্খ জমানাতেও ছিল।

দল, মত অনেক কিছুই আলাদা ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে ছিল বিপুল পড়াশোনা। সহবত। আমরা ছোটোরা কেউ কোনও ভুল করলে, ভুল লিখলে শুধরে দেবার জোর ছিল তাঁদের।

এই ভুল শুধরে দেওয়াটা খুব জরুরি। এখন আমরা ভুল শুধরে দিতে ভয় পাই। দল থেকে ছেলেমেয়েরা চলে যেতে পারে তার কোনো ভুল শুধরে দিলে, জনপ্রিয়তা কমে যেতে পারে।

সুনীলদারা কি জনপ্রিয়তা নিয়ে ভাবতেন না? অবশ্যই ভাবতেন। কিন্তু তাঁরা কখনও ভাবেননি ভুল ধরিয়ে দিলে দল ভেঙে যাবে। দল তখনও ভাঙত। মতের অমিলে বা ঐহ্যিক স্বার্থের প্রবল সংঘর্ষে কত শিবির ভাগ হয়েছে বাংলা কবিতায়, কিন্তু কারুর ভুল ধরিয়ে দেবার জন্যে কেউ কাউকে ছেড়ে যায়নি।

আমরা ভুল ধরিয়ে দিলে ভুলটা শুধরে নিতাম। এখন আমরা নিজের ভুল হতে পারে এই সত্যটা মানতে চাই না।

সম্পাদক
বীথি চট্টোপাধ্যায়

সহ-সম্পাদক
মোহর চট্টোপাধ্যায়

স্বত্বাধিকারী বীথি চট্টোপাধ্যায়
রাজবাড়ি
১৯ আর, ডোভার প্লেস, ফ্ল্যাট-২এ
কলকাতা-৭০০ ০১৯
মোবাইল : ০৯৮৩০১১৭৪৬৩৫
E-mail : bithirmail@yahoo.com

বিশেষ উপদেষ্টা
সেলিনা হোসেন
সত্যম রায়চৌধুরী

৫০ টাকা

বানানে উল্লেখযোগ্য ভুল কেউ শুধরে দিলে আমরা বলি টাইপিং মিসটেক। লেখাটা একেবারেই কাঁচা হলে আর সেটা কেউ ধরিয়ে দিলে আমরা নিজেকে ভালো লেখার জন্যে তৈরি করি না। মনে করি আমার লেখাকে কাঁচা বলা! এত সাহস! আমরা তখন উত্তর দিতে চাই সপাটে থাপ্পড়ের আদলে। সত্তরটি শারদীয়ায় নিজের কবিতা ছাপিয়ে উত্তর দিতে হবে। আমি লিখতে না-পারলে ছাপা কেন হবে এত এত? এত এত অনুষ্ঠানে কেন কবিতা পড়াবে আমাকে? আমাকে আরও পড়ে, আরও শিখে তারপর লেখালিখি করবার জ্ঞান দিলে আমি সপাটে উত্তর দেব। আমার সহবত নেই, আমার থাপ্পড় আছে। আমার মাথা সবসময় গরম। বাহাত্তরটি শারদীয়া লিখে, বিরাশিটি অনুষ্ঠানে কবিতা পড়ে, ফেসবুকে বত্রিশটি প্রশংসা পেয়ে আমি বিরাট হনু। আমাকে কেউ শেখাতে এলে আমি সপাটে দেব। আমি তেল মারতে পারি, ঘুষ দিতে পারি, কিন্তু কিছু শিখতে পারি না। আমার এই আমি কিন্তু আগে ছিল না। আগে আমি ভালো লিখলে ভাবতাম আরও ভালো লেখা যাবে কি কখনও। লিখতে না- পারলেও শিখতে পারতাম অনেক।

একবার একটি বাচ্চাদের নাচগানের অনুষ্ঠানে আমার কবিতা পড়বার কথা ছিল। তখন আমি সদ্য লিখতে এসেছি। সেই অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল একটি দৈনিক কাগজে।

বিজ্ঞাপনটি দেখে সুনীলদা ফোন করলেন আমাকে। তিনি বললেন 'এসব কী শুরু করেছ? একটা হালকা নাচগানের অনুষ্ঠান, সেখানে তুমি কবিতা পড়বে? এগুলো করা যায়না। ' আমি তখন সত্যি আনাড়ি। বললাম, 'কেন ওঁরা তো আপনাকেও ডেকে নিয়ে গিয়েছে আগে।' তখন মেজাজ হারালেন সুনীলদা ' কতদিন লিখছ তুমি? ছ-মাস লিখে তুমি একটা মেঠো প্রোগ্রামে কবিতা পড়বে। আবার কাগজে তার বিজ্ঞাপন? এসব হাস্যকর বিষয় বন্ধ করো। তোমার নাম এভাবে যেন বিজ্ঞাপনে আর না-দেখি আমি। লিখলে সব করা যায় না।' আমি সেই অনুষ্ঠানে কবিতা পড়িনি তারপর। সাহস হয়নি। বুঝেছি কবিতা পড়বার একটা পরিসর আছে। সব জায়গায় সবকিছু মানায় না। আমি তারপর কবিতা লিখতে পারলাম কিনা সেটা সময় বলবে। কিন্তু এই যে উনি বকলেন, এর ফলে আমার জীবনের পরিধিটা বড়ো হয়ে গেল। একটা নতুন জিনিস শেখালেন উনি। সব মঞ্চ, সবার নয় শিখে গেলাম। এই নতুন শেখার আনন্দ কি একেবারেই হারিয়ে গেল সাহিত্য জগৎ থেকে, যে-কারণে এখন কেউ শুধরে দিলে আমরা ক্ষেপে যাই। কিন্তু ভুল শুধরোনো না হলে, এভাবে চললে তো ভুলের পাহাড়ে ঢেকে যাবে বাংলাভাষার নরম মাটির রাজত্ব। তখন কেইবা কার লেখা পড়বে? কেইবা কার লেখার প্রশংসা করবে। শেষে সকলকে লাফাতে লাফাতে নিজের ঢাক নিয়ে হাতে ঘুরতে হবে না তো সারাক্ষণ? এই প্রশ্নটা মাথায় একেবারে শিকড় গেড়ে বসেছে কয়েক বছর ধরে।

কবিতা

৫-৩৪

মুহাম্মদ সামাদ অরুণ কুমার চক্রবর্তী কালীকৃষ্ণ গুহ অসীম সাহা অংশুমান কর
পঙ্কজ সাহা চৈতালী চট্টোপাধ্যায় শিবাশিস মুখোপাধ্যায় ঋজুরেখ চক্রবর্তী
যশোধরা রায়চৌধুরী সুব্রতা ঘোষ রায় স্মরণজিৎ চক্রবর্তী মৌ রায়চৌধুরী
দুর্গাদাস মিদ্যা প্রীতি সান্যাল অনিন্দিতা বসু সান্যাল ঋত্বিক ঠাকুর প্রণতি ঠাকুর তামান্না জাসমিন
রামকৃষ্ণ মাহাত ধীমান ভট্টাচার্য প্রশান্ত ভট্টাচার্য শকুন্তলা সান্যাল অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
ফেরদৌস নাহার তাপস রায় তপন রায় প্রধান সুহিতা সুলতানা
অর্পণা মৌলিক কিশোর ভট্টাচার্য অমিত চক্রবর্তী ড. নির্মল বর্মন সত্যগোপাল দে
সরোজ উপাধ্যায় সুধাংশুরঞ্জন সাহা অংশুমান চক্রবর্তী সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায়
আশিস চৌধুরী সুদীপ দত্ত অনীশ ঘোষ অঞ্জনা সাহা আনিসুর রহমান
স্বপন শর্মা মাসুদ পথিক মামুন রশীদ মোহম্মদ শাহবুদ্দিন ফিরোজ মধুসূদন দরিপা
ভক্ত গোপাল ভট্টাচার্য গৌতম ভরদ্বাজ সৈয়দ খালেদ নৌমান রাজা চক্রবর্তী
প্রদীপ আচার্য অমিত কাশ্যপ সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় কানাইলাল জানা সোমা মুখোপাধ্যায়
গার্গী মুখোপাধ্যায় রাজীব ঘোষ সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায় শিবানী মুখার্জি পাণ্ডে
জবা চৌধুরী শান্তশ্রী চৌধুরী গোপা চক্রবর্তী নীলাঞ্জন শাণ্ডিল্য সুস্মেলী দত্ত
অর্ঘ্য রায় উদ্দালক ভরদ্বাজ সুপ্তশ্রী সোম জয়তী চ্যাটার্জি শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

গুচ্ছ কবিতা

৩৫

সাদাত হোসাইন

৩৮

বীথি চট্টোপাধ্যায়

রসতত্ত্ব

৪০

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি

গাহিতে হয় দুজনে গান

শ্রদ্ধাঞ্জলি

৪৬

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্যারিসে মিলান কুন্দেরার খোঁজে

অবিচুয়ারি

৪৯

ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়

বিদায় সমরেশ...শেষকথা ২৩শে এপ্রিল

ধ্রুপদী

৫২

সত্যম রায়চৌধুরী

কবি ওয়ার্ডসওয়র্থ ও একটি ডায়েরি

শারদোৎসব

৫৫

গৌতম ভট্টাচার্য

পুজোর আজকালপরশু

স্বগোতক্তি

৫৮

জয়ন্ত ঘোষাল

সলিলকি... একাকী নির্জনে

দেশ কাল সমাজ

৬০

ইমানুল হক

মিশ্র সংস্কৃতি ছাড়া দেশ বাঁচবেনা

স্মৃতিকথা

৬৩

মাজাহারুল ইসলাম

উদ্বাস্তু সরণি

ভ্রমণ

৬৮

স্বর্ণাভা কাঁড়ার

পটচিত্রে পুরী

৭২

শাহাব আহমেদ

রাশিয়া, সুবর্ণ অঙ্গুরীয় ও কম্যুনারকা

পৌরাণিক

৮০

জয়তী রায়

অমৃতকন্যা পুতনা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

৮৫

রূপা মজুমদার

মেরি কুরি, দাম্পত্য ও প্রেম

ধর্ম কর্ম

৮৮

আশিস গুহ রায়

কামাখ্যা তীর্থে অম্বুবাচী মেলা

গল্প

৯১-১৫৬

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য সহযাত্রী

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম কাছে আসার গল্প

সৌমিত্র বিশ্বাস দশাননের দশা

প্রবীর ঘোষ রায় ছাতার মাথার গল্প

চুমকি চট্টোপাধ্যায় ভালো আছি, ভালো থেকো

দেবযানী বসু কুমার রামকৃষ্ণদা ভার্সেস বোবো

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় বসন্ত এসে গেছে

বোধিসত্ব রায় হারুন আল রসিদের আয়নামহল

দীপান্বিতা রায় স্বর্ণচাঁপার সুগন্ধ

অদিতি সেন চট্টোপাধ্যায় ভিত

অমৃতা মুখার্জি পুনরাবর্তন

জয়নারায়ণ সরকার আমার মা কখনও মেট্রো রেল চড়েননি

মুহাম্মদ সামাদ
তুমি খুব ভালো

কালো বেড়ালের চোখে যেমন ঠিকরে পড়ে আলো
প্রিয়তমা, তোমার হৃদয়–মন ঠিক সে রকম ভালো
স্বচ্ছ জলে অথবা প্রবাল দ্বীপে মানুষ যেভাবে দেখে
রঙিন মাছের নাচ, বাহারি বাগান–গাছ, ঘনবন
সেরকম আমি দেখি তোমার সরল জলরং মন;

তোমার হৃদয়ে জ্বলে স্বাতী নক্ষত্রের মুখ
তার ভেতরে আমার তন্বী বেড়ালের চোখ
কখনো নড়ে না, নেভে না, পড়ে না
ঈশ্বরের মতো জেগে থাকে; আর তৃষ্ণার্ত
চাতকের মতো সে আমাকে নিশিদিন ডাকে;

তোমার আমার মধ্যে রাতদিন সুন্দরের উথালপাতাল
তুমি শান্ত স্থির— আমি অশান্ত অধীর— টালমাটাল
তুমি ধীরে–সুস্থে আসো— কথা কও, কাঁদো, চুমু খাও
মৃদু হাসো— আর অপার আনন্দে ভালোবাসো;
তোমার হৃদয়ে ভরপুর আলো— তুমি খুব ভালো।

অংশুমান কর
মিমিজান

দু-টি শব্দের মধ্যে যে-নীরবতা
সেই নীরবতা হয়ে আমাকে ঘৃণা করো।
মুমূর্ষু ভিখিরির ডাককে যেভাবে অম্লানবদনে এড়িয়ে
পাঁচটা সাতাশের লোকালে উঠে যান বড়োবাবু,
অবহেলা করতে হলে আমাকে সেভাবে অবহেলা করো।
অক্লেশে যেভাবে ক্যামেরা আর মাইক্রোফোনের সামনে
মিথ্যে বলেন রাজনীতিক
আমার নামে কুকথা বললে, এভাবেই বলো।
মেনে তো নিয়েছি সব।
এও মেনে নেব
এই আশায় যে,
একদিন ওই হিমাচলি মেয়েটির মতো
আমি পাহাড়ের মতো দিনগুলো ভেঙে ভেঙে উঠতে থাকব
আর পিঠে বাঁধা ঝোলায় ওর পুঁচকে সোনাটার মতো
শুয়ে থাকবে তুমি,
বুঝবে আর কিছু নয়, ভালোবাসা শুধু এই।

কালীকৃষ্ণ গুহ
কথকতা

দিন চলে যায় ধীরে ধীরে
দিন চলে যায় অতি দ্রুত
কীভাবে দেখবে তুমি জান
আকাশে কত যে তারা জ্বলে!

সূর্যোদয় আর অস্তাচলে
আমরা ছিলাম কাছাকাছি
রৌদ্রে শায়িত দিনগুলি
স্বপ্নের মতো কেটে গেছে।

স্বপ্ন কেটেছে আলোছায়ায়
ভুলে ভরা ছিল ভালোবাসা?
ভুল ছিল পথ চিনে নিতে ?
পাগল এসেছে ঘরে ফিরে।

আজ যদি বসি স্মৃতি ঘিরে
দূর থেকে হাওয়া বয়ে যাবে
মৃত্যু বিষয়ে কথকতা
শেষ করে দিয়ে হা-হা হাসি।

অরুণ কুমার চক্রবর্তী
চিঠি-কাব্য

ভাবলাম, ভাববো
আরও আরও ভাবনার, নিজেকে
নিজের করে চেনাবার বা চেনবার,
শেখাবার বা শেখবার কথা আরও ভাবনার, ভাববো, ভাববো

চিঠি-কাব্যের জল টলটল অবিরল অতল অতল দিকে ধাবমান, তুমি আমি
আমরা সকল, কঠিন বৃত্তে বৃত্তে খুঁজে ফিরি, যেন অন্ধের দুটি হাত
ঘুরেফিরে কাকে খোঁজে, আরও অন্ধ, আরও আরও অন্ধ-অন্ধকারে কার
মুখোমুখি বসে কথার ঝর্নামেলা, চেনবার বা চেনাবার দায় কিছু থেকে যায়,
আবেগের বেলায় অবেলায় তবু অন্বেষণ, প্রসারিত হাত, হাতের আঙুল কার
ছোঁয়া পেলে থামবো
ভাববো
এ তো তোমার-আমার সবার সবার চিঠি, চিঠির কাব্য...

কানাইলাল জানা
কথা

জঙ্গল-জঙ্গল গন্ধ নিয়ে যেসব কথা সামনে আসে লুকিয়ে রাখি গাছের কোটরে মুহূর্তের জার্নালে । যখন কথা খুব শক্ত লাগে আলাপের মধ্যে জারিয়ে রাখি। কথা যখন ঘোরালো ডুবসাঁতারের তলায় পুষি। লৌকিক কথাকে ধরে ধরে পাঠাই রহস্যের ঘেরাটোপে যাতে একদিন সে অলৌকিক হয়ে ওঠে..

সম্পর্কে যদি সামান্য ফাটলও দেখা দেয় মিহি কথা দিয়ে রিফু করি। মনের খাঁজে খাঁজে পুঁটি মাছের মতো চুপটি করে বসে থাকে যেসব অলস অথচ আঁশটে কথা, তাদের শেখাই জাদুবিদ্যা যাতে একদিন পৃথিবী থেকে অদৃশ্য করে দেয় প্রতিশোধ ও পলায়নবিদ্যা...

অসীম সাহা
উপেক্ষা

একটি জীবন কেটেই গেল
ঘূর্ণায়মান চাকায়;
সময় যখন উদাস চোখে
দূরের পানে তাকায়
তখন কারা ডাকে—
পাতার ফাঁকে মৌমাছিদের
সম্মোহনী চাকে?

স্মৃতি?
হয় না জানা এক জীবনে
এই অচেনা রীতি।
তবুও যেতে হয়;
হৃদয় থেকে সংগৃহীত
সামান্য সঞ্চয়
সঙ্গী করে অনেক দূরের দেশে;
একটি জীবন কেটেই গেল
জেনেও তুমি ধরলে না এই হাত দু'খানি
শুধুই ভালোবেসে।।

জানলে না এই বুকের নীচে
কীসের এত ক্ষয়;
অন্তরালে কীসের এমন
তৃষ্ণা জেগে রয়?
জানলে না এই নদী
কীসের ব্যথায় কাতর এবং
তোমার পানে বইছে নিরবধি।

জানলে না এই আর্ত হাহাকার;
জানলে না এই বুকের ভেতর
লক্ষ যুগের কান্নাটুকু কার!

পঙ্কজ সাহা
ইতিহাস

ইতিহাসের ঘর ভর্তি হয়ে গেছে
রক্তে উপহাসে অবিশ্বাসে
এখন ওঘরের জানালাগুলো
খুলে দাও
হাওয়া আসুক আলো আসুক
ঘর ভরে যাক ফুলের ঘ্রাণে
পাতায় পাপড়িতে ঢেকে দিক
রক্ত কাঁটা
আলোয় ধুয়ে যাক
উপহাস অবিশ্বাস

কিন্তু ইতিহাস তো ফিরে ফিরে
তার মুখ দেখে
তাই ইতিহাসের ঘর
বরং ভরে যাক আগুনে

আগুন নিভলে
মানুষ আরও একটি ঘর বানাবে।

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

কিন্নর-কিন্নরী

মা-র চোখে জল লেগে থাকে।
বাবা কোনো সেভিংস রাখেনি,
আমার বিয়ের জন্য।
কাজের মাসিটা রোজ চোরাচোখে তাকায়,
আমি জানি ও কী দেখতে চায়!
পাশের ফ্ল্যাটের দুই পিসি,
বলাবলি করছিল, 'এত বড়ো মেয়ে,দেখ,
বুক ওঠেনি', শুনে ফেলেছিলাম!
দিদি কাল বাজার করতে গিয়ে, লঁজারে
কিনে এনে দিল, আমিও ফেলে দিলাম ছুড়ে,
এসব পরতে ভালো লাগে না যে...
জানলায় দাঁড়ানো দায়,
নীচে, চায়ের দোকান থেকে হাসাহাসি উড়ে
আসে, 'কী রে,ফুটো আছে?'
আমি জানি কোনো এক বসন্তবিকেলে,
বারান্দায় আসব যখন,
ঝুঁকে দেখব,ওই ওরা হেঁটে যাচ্ছে,
আমিও ওদের দলে, নাচের ছন্দের মতো
হাততালি দিতে দিতে
ঠিক মিশে যাব

শিবাশিস মুখোপাধ্যায়

মৃত্যুর আগে বাপ্পাদিত্যর বলা নাটকের শেষ সংলাপ

ঋণ : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার বাবাকে যারা মেরে ফেলল তুমি সেই ভিল
অথচ তোমারই সঙ্গে সারাদিন ঘুরেছি প্রান্তরে
ঘুরেছি রক্তাক্ত পথে, যুদ্ধজয়ে, আত্মীয়হননে
কুলশীলহারা হয়ে, বংশের লতিকা ভুলে গিয়ে;
ভালোবাসা? তারও সঙ্গে দেখা হয়েছিল একবার
সে এক গভীর বনে, রাজকুমারী পূর্ণিমা আলোয়!

কী বললে? সাম্রাজ্য ছেড়ে সে এখনও সন্ন্যাসিনী বেশে
ভালোবেসে মরে আছে? হিংসায় বাঁচেনি তার প্রাণ?
হায় রে অভাগা, তোর বর্শামুখ হরিণে হত্যায়
মরেছে পাথরে শুধু মাথাকুটে, অলীক, নিষ্ফল!

আমার বাবাকে যারা মেরে ফেলল, না, তুমি সে নও
তুমি যে আমরই বাল্য, ক্রীড়াদ্যুতি, তুমিই তো কবিতা!

কে আছিস? আমাকে একটু জল দে না রে, চোখদুটো কেমন
অন্ধকার হয়ে আসছে, উঃ, এ কী তীব্র অন্ধকার
মুঠোয় ভ্রমর তাকে সারাদিন দুমড়ে-মুচড়ে আমি
আলোকে মেরেছি আজ অন্ধকারই আমার নিয়তি!

কে আছিস? বেত্তমিজ, জল দে না রে,বেগম কোথায়?
শেষকালে অন্তত তুমি কাছে এসো, শুনে রাখো, সব যদিও কালো

আমার বংশের নাম সূর্যবংশ, আমার ধ্বংসের নাম আলো!

যশোধরা রায়চৌধুরী

দাম্পত্য

তুমি একমাস ধরে সাবানের মতো ক্ষয়ে যাও
আমি তিন দিন ধরে বারান্দাস্থিত গামছা
এই উদাসীন খুব উদাসীন দাম্পত্য
তবু দেবত্রে বসে লিখে দিই দানপত্র

তুমি মগে করে ঢালা ভীরু জল, নও ঝর্না
আমি লবঙ্গপান, দিইনি তো, যারপরনাই
খুশবাস নেই, রস মরে আমসত্ত্ব
এই অনুদার খুব অনুদার দাম্পত্য।

সুব্রতা ঘোষ রায়

ভিটের গল্পরা

কতটা ছেড়ে গেলে কতটা রয়ে যায় তবুও আশ?
অশ্রুজল নিয়ে কতটা খুশি থাকে স্বল্পভাষ?
ঝড়ের রাতে কার দুয়ার ভেঙে যায় সংশয়ে!
মন কোথায় থাকে? শরীর যায় কোন আশ্রয়ে?
প্রলয় কাকে বলে? কখন ছাদ ওড়ে দিগ্বিদিক?
ভিটের গল্পরা আস্থা খোঁজে তবু অলৌকিক।
পুজোর দক্ষিণা পূজারি তাল বুঝে নেয় গুণে,
কপাল জানে না তো, তবুও চর্চিত চন্দনে!
রঙ্গমঞ্চ, আর যোগ-বিয়োগ করে ঘুঁটির দল!
হারায় পেনসিল হারিয়ে গেল কার ঘাটের জল...
শুকনো ঘাটে মাথা ঠুকছে দেখো কোন আনমনা...
সব হারিয়ে শুধু শুকনো হাতে থাকে কাল গোনা,
তবুও এভাবেই না হয় না হতই গল্পশেষ...
অঙ্ক মেপে করে মনেই জমা হয় ভুলের রেশ!
যে তৃণ চলে যায় একেবারেই যায়... ফেরানো দায়!
বিশ্বজয়ী হাসি মন তবুও নিঃসঙ্গতায়...

ঋজুরেখ চক্রবর্তী

দাহ

বাতাসে বারুদগন্ধ—
অথচ বিদ্যুৎবাহী হবে সুপবন, কথা ছিল।
যেদিকে তাকাও—দূরে অথবা নিকটে—
ক্রমিক সংখ্যায় তোড়ে ভেসে আসা প্রশ্নপত্রে ভুল
জীবনের পূর্ণ মান একশো থেকে চুইয়ে চুইয়ে
ঝরে-পড়া বেহায়া রক্তের ইতিকথা।
নিকোনো মেঝেয় তুমি ভাতের থালাটি
ঠিক কোন দ্রাঘিমাংশে রেখে মনে কর বাঁচা গেল?
আমাদের বেঁচে থাকা,
আমাদের বেঁচে যাওয়া,
আমাদের স্মৃতিকাতরতা—
সব চুরি হয়ে গেছে, সর্বনাশ হয়ে গেছে, আর
তুমি শুধু একটা-দুটো প্রিয় স্লোগানের
বিমার কাগজ হাতে বসে আছ, এই বুঝি দেবদূত এল!
বাতাসে বারুদগন্ধ—
তুমি আজ খেলা ভেঙে ক্লাবঘর পোড়াতে যাবে না?

আনিসুর রহমান

একটি শূন্যতা

তিনি দিলেন নাম ও দাম, দিলেন দেশ ও মুক্তি;
রাতের অন্ধকারে দানবেরা হত্যা করে তাঁহারে;
মানুষের মর্যাদা ধূলায় লুটিয়ে পড়ে, লজ্জায়—
চন্দ্র ও সূর্য কালো মেঘে তাই মুখ আড়াল করে।

যন্ত্রণা ভাষার অতীত, সকলে ছটফট করে ভেতরে
ভেতরে; বিবেকী মানুষ কাতরায় অন্তরে বাহিরে;
দেশে কাল কিয়ামত ভর করে জমিনের পরে।

দুর্গাদাস মিদ্যা
পথের পরিচয়

নতুন ঠিকানার খোঁজে বারবার হেঁটে যাওয়া এই
গুঢ় অন্বেষণ চলমান কতকাল কে জানে এতটা
পথ এভাবে এসে মানুষ হয়েছে মানুষ পৃথিবীকে
ভালোবেসে। সরে গেছে অন্ধকার, ফুৎকারে উড়ে গেছে
ভয়জ্ঞানের আলোকে অজানাকে জেনেছে বিশ্বময়
এই গরিমার কথা কিছু মানুষ তবু ভুলে যায় তুলে নেয়
হিংসার ধনুক তাই কালে কালে সভ্যতার মুখ কালো
হয়ে যায়। এইসব অপরাধের কথা ভুলে মানুষ এগিয়ে
যায় সভ্যতা বিকাশের নতুন ধারায়। হিংসা, দ্বেষ, সে তো
মানুষের কাজ নয় ভালোবেসে আলো জ্বেলেছে যারা
তারাই সঠিক মানুষের পরিচয়।

সুদীপ দত্ত
নির্বাসন

এখন স্বেচ্ছানির্বাসন, প্রহর মরে আসে
মায়ের ক্ষীণ শাঁখা, শূন্যে শুধু ভাসে।
শুয়ে আছে বর্ণপরিচয়, ভাঙা চক-খড়ি
ভগ্ন প্রহর গোনে, মরে যাওয়া ঘড়ি।
আলো সব বিপ্রতীপ, দেওয়াল আঁকে ছায়া
চার চোখ আর চার ঠোঁট, বিচ্ছেদ যেন মায়া।
দিনসব আসে যায়, শেষ সব খেলা
এখন স্বেচ্ছানির্বাসন, শুধু ভাঙা মেলা।

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী
সূর্যাস্ত

কুয়াশার বাড়িঘর, মাফলারে মেঘ লেগে আছে
ঘোড়ার নালের মতো আবছায়া পাহাড়িয়া লুপ
রঙিন পতাকা ওড়ে, অজানা পাখিরা আসে কাছে
আচমকা বরষায় কাঠের সাঁকোটি আজ চুপ

তার নীচে নদী যায়, পাথরে ধাক্কা খায় হাওয়া
ট্যুরিস্ট গাড়ির দিকে হাত নাড়ে লেপচা বালক
সমস্ত হারিয়ে আজ শুধু এইটুকু ফিরে পাওয়া
পাইনের নীল বনে ভেসে থাকা হলুদ পালক

ম্যালে আজ বড় ভিড়, নানান সোয়েটার এলোমেলো
দূরের গির্জার থেকে ভেসে আসছে নরম প্রার্থনা
তুমি তার সুর ধরে এক ফোঁটা মোমবাতি জ্বেলো
শেষ বিকেলের রোদ বরফে ছড়িয়ে দিচ্ছে সোনা

সূর্যাস্ত ঘনিয়ে আসে, এ জীবন শান্ত হয়ে যায়
হলুদ পালক শেষে খুঁজে পায় ভিনদেশি পাখি
আমার পাইন বন মনে মনে এইটুকু চায় —
তোমার দুহাতে আমি বাকি সব সানসেট রাখি

মৌ রায়চৌধুরী

মা, শুনতে পাচ্ছো?

মা, তুমি কেন ভালো নেই মা?
আজ কতদিন হয়ে গেল,
মৌ বলে তো ডাকো না!
ফোন তুলে তো বলো না,
‘কী রে কী করছিস? খেয়েছিস?
সত্যম, ঋষি কী করছে?’
কত সময় ব্যস্ততায় তো বলেছি,
আমি অফিসে, পরে ফোন করছি!
তারপর হয়ত ভুলে গেছি।
আমার সব ভুলই তো তুমি,
ক্ষমা করে দিয়েছো তোমার ভালোবাসা দিয়ে,
ছোটোবেলায় তোমার হাতে মার খেয়ে কী অভিমান হত,
খেতাম না, কত রাগ করতাম, তোমার সাথে কথা বলতাম না!
তুমি খুব শক্ত হাতে আমাদের তিন ভাইবোনকে মানুষ করেছো।
দেখতেও তো তুমি মা দুর্গার মতো
সবাই বলত দশহাতে তুমি সবদিক সামলাতে হাসিমুখে।
আমার ১৮ বছরে যখন এক অজানা অসুখে
প্রায় একমাসের ওপর ক্যালকাটা হসপিটালে শয্যাশায়ী,
তখন বাঁচবো কিনা কেউ জানে না!
ডাক্তার কিছু বলতে পারছেন না।
তুমি তখন হুগলি থেকে সকাল ৯:১৫-র ট্রেন ধরে আসতে হাসপাতালে।
সারাদিন থেকে একেবারে রাতের খাবার খাইয়ে,
ঘুম পাড়িয়ে বাড়ি ফিরতে। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াতে,
তখন আমি ভাবতাম, আমি যদি মরেও যাই
তোমার কোলে মাথা রেখে মরবো।
মা তুমি আমাদের জন্য যা করেছো,
জানিনা সব মা তা করতে পারেন কিনা।
আজ তুমি শয্যাশায়ী,
কথা বলো না, কত কষ্ট তোমার, চোখে দেখা যায় না।
আমি তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারি না মা,

কত সময়, কত কষ্ট করে, কত প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়েও
তুমি আমাদের ভালো রেখেছো। অসুখে আগলেছো,
কষ্টে সামলেছো।
আর আজ আমাদের এত ক্ষমতা, প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও,
দেখো মা তোমায় আমরা ভালো রাখতে পারলাম না।
তুমি কত কষ্ট পাচ্ছো,
বাবাই তো চলে গেল
যতদিন পারি তোমায় আগলে রাখতে চাই মা।
ঈশ্বরকে বলি শুধু একটু তোমায় ভালো ক'রে দিন!
তুমি আবার ডাকো আমার নাম ধরে...
আবার বকো, মারো, শাসন করো।
আর অভিমান করবো না, রাগ করবো না।
কথা দিলাম মা তোমায়,
তুমি শুধু সুস্থ হও মাগো!

অমিত কাশ্যপ

ড্রেসিং টেবিল

ড্রেসিংটেবিলের পাশে বিকেল পড়ে আছে
কেউ তুলেও দেখছে না, থাক পড়ে থাক ভেবে
কেউ নাড়াচ্ছেও না, হ্যাট হ্যাট বলে উড়িয়ে দেবার মতো নয়
নিজে নিজে চলে যাবে বা সরে যাবে
ভাবছে সকলে, হয়তো তাইই হবে শেষপর্যন্ত

ড্রেসিং টেবিলের একটা রহস্য আছে, এখন মা'র
একসময় ঠাকুরমার ছিল, শোনা কথা, তিনিও নাকি
এইভাবে কত হাত ঘুরে ঘুরে এসেছে জানা নেই
বার্মাটিক সেগুন, বেলজিয়ামের আয়না
পালিশ হয়েছে কয়েকবার, ঘরে ঢুকেই নজর কাড়ে

প্রাচীন বললে কম বলা হয়, স্মৃতির ফাঁদ
কুলুঙ্গিতে যেমন সন্ধ্যাপ্রদীপের দাগ
দক্ষিণমুখী তুলসীতলায় এবোড়-খেবোড় ফাটল
ঠাকুরদালান, পাঁচিলের পর পাঁচিল সাজিয়ে
ভাগে ভাগে সংসার, বিকেল তেমনই পড়ে আছে

প্রীতি সান্যাল

ভালোবাসা

অন্ধকারে ছড়ানো এক পাটি
জুতো পায়ের ।
বিচ্ছিন্ন অংশ দুধের বোতল
ঝোলানো হাত কামরা থেকে বিপত্তারিণীর
তাগা বাঁধা অটুট নিপাট
নিকষ অন্ধকার ছিঁড়ে আর্তনাদ, কান্না ফোঁপানি,
বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার
সারি সারি শবদেহ ছড়ানো চারদিকে
প্রিয় খেলনা মোবাইল ফোন ভিডিয়ো ক্যামেরা

গতকাল অনেকেই সুটকেস গুছিয়েছে
মাকে প্রণাম করে বলেছিল সাবধানে থাকবে
কপালে দই-এর ফোঁটা থুতনিতে চুমু
ঠাকুরের শুকনো পুষ্প এখনও পকেটে
প্রাণ নেই রক্তমাখা দেহ টুকরো ছড়ানো।

ছিটকে পড়া লাল টুকটুকে টি-শার্ট
সাদা রং বাচ্চার জুতো শরীর-শরীর নয়
ভগ্নাংশের স্তূপ আর দেখতে চাই না আমি
এ সপ্তাহে শুক্কুরবার যদি না থাকত
তা হলে কী ভাল যে হত

ঈশ্বর আছো না কি, ঘুমের দরজা ঠেলে
নিদ্রামগ্ন ছিলে!!

অনিন্দিতা বসু সান্যাল

উড়ন্ত আগুন

বর্ষাতি মুড়েছিল এ-শহর
ভাঙা মেঘে বৃষ্টি নামল কই
তুমি তো বলনি, বল
মেঘের আগুন উড়ন্তই

কেউ তো চায়নি এই
গগনবিহারী মায়াপথ
মানুষেরা জ্বলে গেছে
কেউ কেউ ভোলেনি শপথ

আষাঢ়ী পূর্ণিমায় দেখো
ভেসে যায় গ্রামীণ উঠোন
বসে-থাকা স্থবির মানুষ
নালিঘাস ঢাকে চতুষ্কোণ

দেবী-মন্ত্র জাদু ঘিরে
বাজার-মোড়ে ভিড় জমে যায়
ভৈরবীতে বাজল ভোরাই
সঙ্গ নিবি কোন অছিলায়

ঋত্বিক ঠাকুর

ধুলোগড়

রাস্তা কোথাও যায় না
শুধু বুক পেতে ধরে রাখে পায়ের পাঁচালি

কোন পা কেমন, কতদূরে যাবে
কার পা কোথায় পৌঁছোল
রাস্তা সব জানে

চটি না জুতোর দাগ
নাকি ন্যাড়া পায়ে শেষপর্যন্ত...
সমস্ত কিছু রাখা আছে
ধুলোর সংগ্রহপুরে

ভাবছ, ধুস, ধুলো তো সামান্যজীবী
তার আবার কীসের জাদুঘর!
আছে, আছে, ধুলো মস্ত সম্মোহক
পায়ে পায়ে টানে
সে টান সর্বত্র
তার খোঁজ জানে ওই ধুলো ভেলকিওয়ালা
উদয়াস্ত ধুলোয় ধুলোয় উসকিয়ে চলেছে
পথিক নিয়তি

প্রণতি ঠাকুর

শুভ হোক

সময়কে দিচ্ছি সময় আবার উঠে দাঁড়ানোর জন্য
নিস্তব্ধ ঘরে ঘড়ির টিকটিক শব্দ জানিয়ে দিচ্ছে সময় বহমান
ভেঙে যাওয়া শিরদাঁড়া জোড়া লাগানো সহজ তো নয়
সময় লাগবে, আরও কিছুটা সময়।
মনের ঘরের বাসিন্দা ঠিকানা বদল করবে
জানতে পারিনি ঘুণাক্ষরেও,
অজানা ঠিকানা, অচেনা জগতের
সন্ধান যাবে না পাওয়া
জীবন-নদীর পাড় ভাঙে একদিকে,
তলিয়ে যায় যত্নে গোছানো ঘরকন্না,
ভাটার টানে ভাসতে থাকে কাঁথাকানি,
ঝরা পাতা, চোখের নোনা জল
ওপারে যেতে হবে,
একা এবং একা,
ভাসিয়ে দিই ডিঙি
আঁকড়ে ধরে মনকে বলি
‘‘হাল ছেড়ো না
বুক ভরে শ্বাস নাও
যেতে হবে ও-পারে’’।

তামান্না জেসমিন

তুমি শব্দ-বর্ণ-উচ্চারণ-ভাষা

আমার কবিতার প্রতিটি শব্দ, বর্ণ তুমি
উন্মাতাল আবেশে আবিষ্ট করে চলেছ।
প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ অকপট আবিষ্কার
সম্মোহিত হতে হতে খণ্ডবিখণ্ড, দগ্ধ!

কবিতায় আংশিক, কখনও-বা অস্পষ্ট, আকুল;
একান্তে না-পাবার অন্তহীন আলোকবর্ষ।
আশ্চর্য স্পর্শ অনুভবের অসীমে ছুটে চলা
না-পাওয়ার নীল ছড়িয়ে যায় হৃদয়ে, দেহে!

আমার কবিতায় এক তীক্ষ্ণ, উষ্ণ উচ্চারণ তুমি
বিস্মিত হতে-হতে, ভেসে-ভেসে যাই গভীরে।
মায়াকণ্ঠের আলিঙ্গনে জড়িয়ে যাই একান্তে
শ্রবণইন্দ্রিয়সুখ, চোখ বন্ধ করা দুরন্ত অনুভূতি।

কবিতার তুমি মুখরিত ভাষা, বর্ণিল বিস্ময়
চূর্ণবিচূর্ণ হতে হতে মিশে যাই মুগ্ধ আলিঙ্গনে
দূর থেকে দূরে, তরঙ্গে-বন্ধনে-চুম্বনে-সংগমে।

রামকৃষ্ণ মাহাত

ভ্রম

গাঁয়ে গাঁয়ে এসে,

পুরোনো বই-খাতা নিয়ে যায় ফেরিওয়ালা
পুরোনো দামে

যা কিছু পড়ি বা যা কিছু লিখি
বিক্রি করে দি
পুরোনো দরে

যা পাই তাতে দু-দিন চানাচুর কিনে মুড়ি মাখি
মাঠে-ঘাটে গরু চরাই, কাশ ঘাসের ঘুঘি বানাই
নদীতে স্নান করি

তারপর ঘরে ফিরে এলে
ঘরকে বিধবা মা ভেবে বারবার ভাত চেয়ে বসি...

রাজা চক্রবর্তী

অকাল-বসন্ত

পুরোনো গন্ধমাখা সাবেকি বিকেল নতুন হয়েছিল তোমাকে ছুঁয়ে।
যানজটের শহরে সেদিন শুধু অবসর আর অবসর।

স্লোগানের দেয়ালে গোলাপ ফুটিয়েছে অস্থির তুলির টান।
তুলোর মতো আদর ভেসে বেড়াচ্ছে রাজপথে।
রাগি লাউডস্পিকার গুনগুন করে গেয়ে উঠছে, তোমাকে চাই।

ট্র্যাফিক স্যিগনালে চিরসবুজের ইঙ্গিত। যুদ্ধাবসান।

কফি হাউসে সেদিন কোনো তর্ক হয়নি। কেবলই কবিতা আর অকাল-বসন্ত।

ধীমান ভট্টাচার্য

দোস্তি

এই বেশ ভালো আছি
তুমি আমি বুড়োবুড়ি
চাহিদা নেই তো জানি
নেই কাদা ছোড়াছুড়ি

দু'জনের চাওয়া-পাওয়া
দুরকম হতে পারা
সেটাই তো স্বাভাবিক
দুটি মনে মিল ছাড়

বেদম ঝগড়াঝাঁটি
কথাদের হরতাল
বিছানা বদল আর
জীবনটা টক-ঝাল

এই রোদ এই মেঘ
বাড়াবাড়ি যতসব
বুড়োবুড়ি সংসার
জীবনটা কলরব

দিল্লি কা লাড্ডু
খেয়ে ফেলে পস্তাই
উনি রেগে বলে দেন
জীবনটা গেল ছাই

এইভাবে কেটে গেল
তিনটে দশক হায়!
সবটাই মেনে নেওয়া
জীবনটা কেটে যায়...

প্রশান্ত ভট্টাচার্য

আয়ুরেখা

বিশ্বাসী থাবার যত্নে বেড়ে ওঠে আয়ু
রেখা ছোঁবে সাধ্য কার আছে
দিঘির নির্মল জল পানের আগে
শয়তানকেও মুখ দেখে নিতে হয়।

বুঝিনি সামুদ্রিক নিষ্ঠায়
ঝরার আগে মেঘ কেন নারীর প্রতিম

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

মন

‘কাড়া’ ও ‘নাকাড়া’— শব্দ দুটো নিয়ে মাথায় পেটাবো!
গুড়গুড় গুড়গুড়... ওই উল্লাস উঠল তল ফুঁড়ে...
কোষে-কোষে তাল ঠুকছে রোমাঞ্চ-আতঙ্ক-ক্ষোভ-রাগও...
ধাধানা ধ্যাতানি দিচ্ছে অহরহ— সকালে-দুপুরে...

ক্ষরণের ডঙ্কা নাচে ঘিলুর ওই পাশে, স্নায়ুপাকে...
বুকজল-হয়ে-বহে ফুসকুড়িতলায়, ব্রণ-পিঠে...
উদ্দাম দামামা আজ খুঁচিয়ে বার করে দেবে ঘা-কে—
লন্ডভন্ড মাংসপিণ্ড ইতিউতি রক্ত ছিটে-ছিটে

অদ্ভুত কনসার্ট শোনো পরম আশ্চর্য নোটেশনে—
ব্যান্ডের আক্কেল গুড়ুম, তাসাপার্টির ছমছমে বাহানা...
বাজনদার বেঁকে বসছে যাবে না যাবে না নিমন্ত্রণে;
বেহদ্দ ঘোড়াও ছোটে ল্যাজ তুলে— বদহজম চানা

হুড়ুদ্দুম বেঁধে গেল: যে যেদিকে পাচ্ছে, পগারপার...
সমাহিত হই আরও; ধ্যানের গভীর এ আমার

শকুন্তলা সান্যাল

বোষ্টমীর ভাষাতেই

প্রতিটি সূর্যের ওম থেকে একটি নীহারিকা-কাল,
দেখা দিচ্ছে আবার দিচ্ছে না,
আমি শতরূপা সেজে আগুনের পাশে বসছি
আবার বসছি না,
একটি দেশ এখন বৈষ্ণবীর জীবন মাখে।

খচ্ করে কানে এসে বেঁধে কীর্তন-কথা,যে সময়
পেরিয়ে এসেছি।

তিজেল হাঁড়িতে মাংস বসিয়ে একদিন মশলার
জোগান খুঁজেছি ,
যদিও আমিষ খাবার আমরা অনেকেই খাই,
তবুও আমরা অনেকেই মাংসাশী নই,
অনেকেই মাংস রান্না করি মদ খাব বলে।

ছায়া-ছায়া একটি বিমূর্ত মার্বেল-মুখ, অর্থডক্স যেন
আমাকে ঠেলে ফেলেছিল সাহস নামের আগুনে,
কূটতর্কে ফাঁকি দিয়ে ব্যাকরণ মানিনি

সেদিনও নিরামিষ বেগুন পুড়তে পুড়তেও
ভিটামিন ডি,
যদি পঙ্কে পদ্ম সত্ত্বেও চিত্তে ওঁম,
আমি কি বলতে পারি, শতরূপা সেজে আমি
আগুনের মান রাখব না?
আগুন আমার অন্তরের বোষ্টম,

এ দেশ এখন রামমোহনের সুবিধা ভোগ করে।

ফেরদৌস নাহার

তৃতীয় নয়নের দিন

সরে যায় দৃশ্য ও দূরবীন, অন্তরিক্ষের দাপট–শাস্ত্র
সারাদিন ঠোঁটে ধরে হারানো মাউথ–অর্গানের ঝুঁটি
তৃতীয় নয়নের রাত
দেখা যায় সমুদ্র ওপার থেকে অসীম আলোর ভ্রূকুটি
স্বভাবদোষে চিৎকার, স্বভাবের কারসাজি লাভা

নাম না-জানা অভিযোগ
অগ্নিসাক্ষী রেখে বিবাহ সম্পন্ন করে শূন্যতার সাথে
ঘাটে ঘাটে নৌকায় অনিদ্রা সারারাত দুলতে থাকে
নাম না-জানা জনপদ

এ–প্রান্তে কেউ নেই, ও–প্রান্তে কালো ম্যাজিকের বাড়ি
সেরকম সীমানায় দাঁড়িয়ে কেউ সিগারেট টানে
ধোঁয়ার আলপনা আঁকছে গুচ্ছের মাউন্টেন্ট লোগো

অপসৃত গান, আয়নায় নিজেকে দেখে মুচকি হাসে
ধীর কুয়াশা, তানে নগ্ন ডালিম ফুলে চুমুক নামে
গ্রীষ্মরাতের ঘুমহীন পাখা ঘণ্টা পিটিয়ে জিজ্ঞেস করে—
পাহাড়ে উড়াল এঁকে উড়ে যাওয়া যায়, যাবে কি!

সুহিতা সুলতানা

দ্বিধার মর্মর

চারদিকে অমীমাংসিত দ্বিধার মর্মর।
নিদ্রাহীন রাত্রির উদ্বোধন দীর্ণ করে তোলে অর্ঘ্য।
আজ দখল ও দূরত্বের কাল। নির্লজ্জ দাপটে খলনায়কের ধূলিময় মুখ মহান আহ্লাদে ক্রমশ চিরন্তন হয়ে উঠতে চায়। অমানুষের আহ্লাদ চিরকাল অট্টহাস্যের মতো। কে কার মুণ্ডপাত করে মরে যেতে চায়?
যে প্রেমহীন দীর্ঘতায় আলোর গোলক হয়ে আবর্তিত হতে থাকে সে কী মানুষ না প্রেতাত্মা না ভূমিহীন টলটলে জল? এখন নিষ্ঠুরতার উল্লাসঘর, টানেল, জাহাজের বাঁক, উড়ন্ত বিমান সব কিছু থেকে চুইয়ে চুইয়ে পড়ে। ঘুরে গ্যাছে ঘুম ও মায়া অ-ঘুমের যাতনা আত্মঘাতী আগুন ও অভিধানের মতো। যেদিকে তাকাই ছদ্মবেশ,নেশাগ্রস্ত মানুষের সূচ্যগ্র চাহনি চিন্তাহীন কদর্য রূপ ...

শিবানী মুখার্জি পাণ্ডে

অর্থহীন শব্দগুলো

মধুযামিনীর রাতে শব্দগুলো অর্থহীন হোল।
তুমি বলেছিলে এমন শব্দের ব্যাঞ্জনা বেছে নাও,
যা অন্ধকারেও জ্বলে ওঠে।

একজনের পর দুজন,
দুজনের পর তিন জন
এভাবেই একের মুখ থেকে অন্যের মুখে
সাজানো হল শব্দের অর্থহীন মুর্ছনা।
কিন্তু তবুও অব্যক্ত রয়ে গেল
জীবনের সুর, তাল, ছন্দে ঘেরা
সংসারের সুসজ্জিত রক্ষা কবচ।

তাপস রায়

জানালাবাগানে আমি খুব ফুল চাষ করি

ছুরি সহ ঘুমোতে যেতে হয়, আজকাল প্রতিদিনই করি
আমার ভয়ের ভেতরে কত কী হাতছানি থাকে
উনুনের আঁচ দেয়া আমি জানি, কয়লার নীচে ঘুঁটে ও কাঠের
ইন্ধন রেখে গোটা একটা দিন জ্বলে উঠতে দিই
প্রতিটি ধানের মাথায় মাপা মাপা ছোট্ট আঘাতের কথকতা জানি
আমি ঢেঁকিতে পাড় দিই, তণ্ডুল খুঁটে খুঁটে তুলি

শিউলিপুর স্টেশনে নেমে আমি একা একা বেড়াতে বেরোব
ভেবেছি পালাব না, আমার অনেক কাজ, ট্রেনে যাত্রীদের খোঁজ নিতে হবে
কে আমাকে চেনে, দেখে-টেখে তাকেই শুধোব শিউলিপুরের কথা
বইপত্র, ঠান্ডা চায়ের গ্লাস, ডাকে আসা চিঠি পড়ে থাকবে জানি
আমি একাই নিরুপায় পা-য়ে শূন্য হতে থাকা নদীটিকে দেখে আসতে যাব
খুব সন্দিগ্ধ চোখেই তাকাব, কখনও সে কেঁদেছিল কিনা

যেকথা বলছিলাম, ছুরি আমাকে অবিরল ঘুমোতে দেয়, জানে ভোর-ভোর
তার কাজ শুরু হবে, আমি নিজের বুকেই বড়ো গর্ত করি, খুঁচিয়ে তুলে ছোট্ট হৃদয়
জানালায় টাঙিয়ে রাখি রাতের চাঁদের মতো, মজা হয়, দেখি
গৃহস্থ্যপনায় কীভাবে সূর্য বেঁকে বেঁকে যায়

মোহম্মদ শাহবুদ্দিন ফিরোজ

লেবু

না-বলা উল্লাসের পাদপ্রদীপে
অকল্যাণকর যন্ত্রণা লেখা যায়
যেখানে ছায়ার ভূমিকা অপরিহার্য
ছুঁতে গিয়েও বার-বার হাত বদলাই
আসলে যতিচিহ্ন ছুঁতে
বারংবার টিস্যুপেপার ডাস্টবিনে ফেলি

তপন রায় প্রধান

মা-ভাণ্ডানি গাথা

তখন বিকালবেলা;
এ-গ্রাম সে-গ্রাম উঠছে জমে ‘মা-ভাণ্ডানি’ মেলা।
গগনতলের বিদায় যখন বিসর্জনের ঢাকে
রাজবংশী হৃদয় নাচে ফের বোধনের ডাকে।

কথিত আছে, ফেরার পথে কৈলাসে, দুর্গায়
পথ হারিয়ে আটকে পড়েন, এ জঙ্গলে হায়!
রাতের মতো আশ্রিতা হন গরিব কৃষক ঘরে
যাবার বেলায় মা দিয়ে যান পূর্ণ-গোলা তারে।

সেই অনাদিকালে;
এই কাহিনী ছড়ায় গ্রামে পরদিন সক্কালে।
স্তব্ধ সবাই প্রণতি ’ভরে মাটিতে ছোঁয় মাথা
মুখে মুখেই রচিত হয় ‘মা-ভাণ্ডানি’র গাথা।

রাজবংশী গ্রামে-গ্রামে প্রতিষ্ঠা পায় ধাম
একাদশীর পূজায় ভক্ত পুরায় মনস্কাম।
ধন-ধান্যে থাকেন যিনি-কৃষকের ভাণ্ডারে
ধাত্রী তিনি, আমরা মানি ‘মা-ভাণ্ডানী’ তারে।

[দশমীতে বিসর্জনের পর, একাদশীতেই ফের বোধন মা দুর্গার। তবে এবার তাঁর রূপ, ভাণ্ডারনি> ভাণ্ডানি বা কোথাও-কোথাও বনদুর্গার। মুখ্যত জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও তার আশপাশে রাজবংশী অধ্যুষিত গ্রামগুলোর বেশ কিছু অঞ্চলে, একাদশীর দিনে আবারও উৎসবের সূচনা হয়। একদিনের (এখন অবশ্য তা তিন/চার দিনে গিয়ে পড়েছে, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে) এই পূজাৎসবে, দুর্গা অর্চিতা হন ‘ভাণ্ডানি’ নামে। পুজো উপলক্ষ্যে সর্বধর্মের মানুষের মিলন মেলা এর অন্যতম আকর্ষণ। দেবী ভাণ্ডানির পুজো ঘিরে রাজবংশী লোককথায় জানা যায়; বিসর্জনের পর কৈলাসে উমা ফিরছিলেন গ্রাম্যবধূর বেশে। রাতের অন্ধকারে, অরণ্যের গভীরে মা পথ হারিয়ে ফেলেন । জঙ্গল থেকে ভেসে-আসা এক গ্রাম্যবধূর কান্নার শব্দ শুনে ছুটে যান রাজবংশী সমাজেরই কিছু বাসিন্দা। তাঁকে নিয়ে যান নিজেদের গ্রামে। সেই রাত, দেবী সেই গ্রামে কাটিয়ে, একাদশীর দিন ফিরে যান কৈলাসে। গ্রামবাসীদের আতিথ্যে তুষ্ট দেবী ফিরে যাওয়ার আগে, নিজের প্রকৃত পরিচয় দিয়ে, গ্রামাঞ্চলের শস্যভাণ্ডার সদা পূর্ণ থাকার বর দিয়ে যান। সেই থেকেই দেবী ভাণ্ডানি’র পুজোর প্রচলন শুরু] শস্যভাণ্ডার রক্ষা করেন যিনি> ভাণ্ডারনি> ভাণ্ডানি*

অর্পণা মৌলিক

নৈঃশব্দ্য

শুনছ? তুমি কি শুনছ?
তোমার গভীরতা মাপছিলেন কবি।
কখনো ভেবেছেন তুমি গভীর বৈকাল হ্রদ।
আবার কখনো ভেবেছেন তোমার গভীরতা
প্রশান্তের মারিয়ানা ট্রেঞ্চ-এর মতোই ।

জানো কবি তোমায় ভীষণ ভালোবাসে।
কবি ভাবে, ডুবসাঁতারে পার হবে,
তোমার মারিয়ানা ট্রেঞ্চ-এর মতো
গভীরতার সব রহস্যজাল।

তোমার সৌন্দর্যে ডুব দেয় কবি।
তার জিজ্ঞাসু চোখে প্রশ্নরা বলে—
কে বলল নীরবতা, তোমার ভাষা নেই?
তোমার ভাষা পড়ার মতো মন কতজনের আছে?
তোমার ভাষা পড়ার মতো চোখ কতজনের আছে?
তোমার ভাষা পড়ার মতো হৃদয় কতজনের আছে?
তোমার ভাষা বোঝার মতো গভীরতা কতজনের আছে?

তুমি কত কথাই না বলো প্রতিদিন কবিকে!
তুমি কত ঘটনাই না বুঝিয়ে দাও কবিকে!
তুমি অতীত আনো ইতিহাসের ক্যানভাস থেকে।
তুমি অতীত, বর্তমানকে সঙ্গী করে
 সৃষ্টি করো ভবিষ্যতের দৃঢ় সংকল্প।
তুমি অতুলনীয়া তোমার সান্নিধ্যেই সমৃদ্ধি পান কবি।
তুমি কিছু মানুষের বড়ো প্রিয় সহেলী।

তুমি আছো বলেই সৃষ্টি জমে ওঠে;
কলমে, কাগজে, খাতার পাতায়।
তোমার গভীরতায় স্নান সারে
নীল কালির পবিত্র ঝর্না।
নীরবতা তুমি আরও গভীরতা নিয়ে পাশে থেকো।
সৃষ্টি করো অনন্ত সম্পদের বিস্তৃত খনি।

কিশোর ভট্টাচার্য

ফিরে এসো

তোমার আসতে অনেকটা দেরি হয়ে গেছে
কোনো কোনো বছর যেমন বর্ষা আসে দেরিতে
তবুও তুমি পড়ন্ত বেলায় এসো নিজের মনে করে।
গ্রীষ্মের প্রখর তাপে মরা ঘাস ফুল আবার মাথা তোলে
শীতল মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে জীবন ফিরে পায়
আমারও স্বপ্নগুলো সজীব হবে তুমি এলে।
রোজ ভোরে দাঁড়িয়ে থাকি জানালার ধারে
কোনো ঋতু না মেনে কোকিল ডাকে আপন সুরে।
শান্ত, স্নিগ্ধ, ম্লান আলোয় মন উড়ে যায় দূর আকাশে
দীর্ঘদিন অপেক্ষায় শ্যাওলাধরা শিরীষ গাছের মতো।
আর্সেনিকের আলিঙ্গন দিনের পর দিন জীর্ণ কলতলা
কোনো একদিন ঝোড়ো হাওয়ায় দাগ মুছে যাবে।
স্থির চিত্তে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছি
নানা কাজেও অসাড় হৃদয়।
চলার পথে ভুল হয়ে গেছে অনেক কিছু
যৌবনে খিদে, পেট ভরানোর মত্ততায়
কতবার প্রিয়ারে করেছি অবজ্ঞা।
তালপাতার নৌকায় কল্কে ফুল সাজিয়ে ডেকেছিল সে
আমি তখন অন্ধ অর্থের নেশায়।
কতদিন পর দক্ষিণের জানালা দিয়ে মালতীর গন্ধ আসে নাকে
আবার ফিরে পেতে চাই পড়ন্ত বেলায় পরিতাপের বাঁকে।
শিশুর মতো বৃষ্টিতে ভিজে খোলা ছাদে
দু'হাত বাড়িয়ে আহ্বান জানাই।
দেরি হলেও এসো ফিরে
তোমার ঘন কালো চুলে লাল দোপাটি দেব গুঁজে।
আর কিছু দিতে না পারি
মুঠো ভরে বৃষ্টির জল দেব তুলে
সমস্ত অভিমান ভুলে একবার এসো চলে।

অমিত চক্রবর্তী

পাগল আষাঢ় পাগলি শ্রাবণ

পাগল আষাঢ়ের সঙ্গে পাগলি শ্রাবণের
প্রথম কবে দেখা হয়েছিল
তা আজ আর মনে নেই।
একদিন আষাঢ় শ্রাবণকে ডেকেছিল;
একদিন আষাঢ়ের জল গড়িয়ে গিয়েছিল
খেয়ালি শ্রাবণের দিকে।
সেই থেকে সে বেগবতী।
তার গা পুড়ে যায় ভালোবাসায়,
তার চোখ শুধু নয় আশরীর ভেজে।
আষাঢ় ছুঁয়েছে বলে অকারণ পুলকে
সে পৃথিবীকে শস্যশ্যামলা করে।
আষাঢ়কে সে দিয়েছে আদরের ডাকনাম।
সে আজ অকুণ্ঠ আদুরি।
ওরা দুজনে আকাশের মেঘবজ্রবিদ্যুৎ থেকে
জল পৌঁছে দেয় মাটির গভীরে।
ফল্গু এক বয়ে যায়, বয়ে যেতে থাকে।
আষাঢ় ডাকে, ও শ্রাবণ!
শ্রাবণ তার কানে কানে বলে,
এসো।

ড. নির্মল বর্মন

নামহীন অস্তিত্ব

বিশ্বে নামহীন অস্তিত্ব, রূপহীন নির্যাস
তপন তাপে কেঁপে উঠে, শূন্যে সাঁতার কাটে জীবাশ্ম
কুয়াশার ছায়ায় ভাসতে ভাসতে বিভ্রান্ত ঈশ্বর
হিরণ্য দ্যুতির রেখায় নক্ষত্রের পেলবতা
সূর্যোদয়ের রক্তিম ভাসমান মেঘ কণার মাঝে
ভ্রাম্যমাণ ভালবাসার উজ্জ্বল পদচিহ্ন—

পর্বতের তুষার মালায়, তালসারির বালুকার তলায়
সমুদ্রের তীর প্রান্তে নীলাভ ঢেউয়ের বুদ্‌বুদ
দোতারার সুরে , ভায়োলেট ফুলের গন্ধে
পাখির কূজনে, মৌমাছির গুনগুন শব্দের অনুকরণে কবি।

লম্বা ঘাসের ঘনান্ধকারে কীটপতঙ্গের আনাগোনা
নির্মল জলরাশির কোনে আড়িপাতে দীর্ঘশ্বাস
ঘূর্ণিঝড়ের স্বননে ঝরা শুকনো পাতায় অশ্রু ঝরে
দলা পাকিয়ে উড়ে যায় কুণ্ডলী ধোঁয়ার তরঙ্গ
পাক খেয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায় স্বর্গের প্রান্তরে। ।

স্রোতস্বিনী সঠিক স্বচ্ছে জলপরিদের নগ্নশরীর।
প্রবালের জঙ্গলে সফেদ রত্নের সুসজ্জিত শয্যায়
উপভোগ করে চঞ্চলা জলকন্যাদের উদ্দাম নৃত্য
আনন্দে বেঁচে যায় বামন ভূতেদের সম্পদ...।

চলমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষীর সংসার
মেলবন্ধনে প্রাণ সত্তা অজানা নির্যাস খুঁজে
বিশ্ব চরাচরে লাস্যময়ী সুগন্ধীর মধ্যে
কবি হল যার মূল আধার।

সত্যগোপাল দে

ভালোবাসলে

তুমি ভাবছ আগলে রেখেছ
হৃদয় দিয়ে—ভালোবাসা দিয়ে,

ভালোবাসার পরাকাষ্ঠায়
কখন তুলেছ আগল—
টের পাওনি হয়ত তুমিও,
ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়,
আগলে রাখার ছদ্মবেশে
তুলেছ আগল প্রতিনিয়ত।

ভালোবাসলে দরজা খুলে দিতে হয়,
উড়িয়ে দিতে হয় আকাশে—
ভালোবাসার পাখিকে বলতে হয়
আমাকেও নিয়ে চল আকাশের নীলে,
দুজনেই ভেসে যাই
মেঘের ভেলায়।

সরোজ উপাধ্যায়

চাঁদ ও শুক্রের মিলন

২৪শে মার্চ
২৪শে মার্চ সন্ধ্যা কাল পশ্চিমাকাশে
মহাজাগতিক মিলন
চাঁদ শুক্রের অপরূপ আলিঙ্গন
দুই জ্যোতিষ্কের যেন বহুদিনের
কাঙ্খিত মেল বন্ধন।
মুগ্ধ জগৎবাসী সুন্দর ওই দৃশ্য করে
অবলোকন। নতুন কিছুর
কি সূচনা? বয়ে আনছে শুভ বারতা?
যেমন সেই তিনটি তারা ইঙ্গিত
করেছিল মানব পুত্রের অভ্যুদয়
মেষ পালকের গৃহে জন্মে যিনি জগতে
দিলেন ভালবাসার বাণী
পাপী তাপী দুঃখী পেল বাঁচার প্রেরণা নতুন
চেতনার আলোক গ্রহ
নক্ষত্রের অবস্থান নাকি জগত জীবনের দুঃখ
সুখের নির্ধারক? তাহলে
কি চাঁদ শুক্রের মিলন জাতিতে জাতিতে
দ্বন্দ্বের অবসানের নিরদেশক?
অথবা ধর্মে ধর্মে বর্ণে বর্ণে মহা সমণ্বয়ের
ইঙ্গিত বাহক?

অনীশ ঘোষ

ছকবন্দি

গোপন তারে বসল উড়ে একটা পাখি
মেঘলা নদীর নাও ভাসানো স্বপ্ন আঁকি
মফস্সলের আকাশ-বাতাস
আমার সাথে বন্ধু পাতাস
নীল রঙেতে ব্যালকনিটা ভরিয়ে রাখি।
ও পাখি তুই পুকুরপাড়ের পুরোনো গান
এখন আমার জলফোয়ারায় একটুকু স্নান
বাথরুমেতে আবছা আলোর ঘুলঘুলি
চিলতে ঘরে মনকে আঁকে রং-তুলি
মেয়েবেলার বাদাম ভাঙা
লক্ষ্মীপুজোর আলতারাঙা
হারিয়ে ফেলা বন্ধুরা আজ বুনছে ফাঁকি।
নাইন্থ ফ্লোরে দাবার বোর্ডে চৌকো জমি
পাগলা বাতাস কুড়িয়ে আনো পাখি তুমি
ডুবসাঁতারে পার হয়ে যাই জীবন বাকি।
তোর ঠোঁটে ওই সন্ধে-সকাল ছুঁয়ে থাকি
গোপন তারে বসলি আমার অচিনপাখি।

সুধাংশুরঞ্জন সাহা
জীবনের কথা

১

জীবন এক উর্বর ভূমি। সব ঋতুতেই সেই ভূমিতে চাষাবাদ সম্ভব।ঠিক ঠিক চাষাবাদ করতে পারলে ফলতে পারে মুঠো মুঠো ফসল। আমাদের ভুলের কারণে জীবনের যে অঞ্চল অন্ধকারে নিমজ্জিত সেখানেই নতুন করে জ্বালাতে হবে আলো ।

২

সব মানুষের হৃদয়েই থাকে এক দুঃখনদী। দুঃখের প্রিয় গানগুলো সেই নদীর সঙ্গে সম্পর্কিত। এইসব গানের কথা ও সুরনির্জন নদীর স্রোতে প্রতিরোধহীন ভেসে যায়।

অঞ্জনা সাহা
বিমূর্ত কুসুম

উৎক্ষিপ্ত বেদনার ঢেউগুলি মধ্যরাতের অন্ধকারে
মুঠোফোনের অদৃশ্য ইথারে ভেসে চলে যায়...
অন্ধকার উপকূলে সাদা চাদরে নীল নীল
ফুল হয়ে ফুটে ওঠে নৈঃশব্দ্যের প্রার্থনা!
বাউল সন্ন্যাসীর মতো তুমি
বিনিসুতোয় গেঁথে নাও অপূর্ব মালিকা।
সগৌরবে দুলে ওঠে বালকের হৃৎকমলে!
বিস্তর ব্যবধান খুব ভালো লাগে।
অমৃত স্রোতের ধারা বয়ে চলে ধমনির সমূহ গভীরে।
রক্তচক্ষুর আড়ালে বেদনাবৈভবে
নিশিদিন বাঁচি আর মরি;
ঘোর অন্ধকারে জেগে থাকে
পারিজাত আলোর বিমূর্ত কুসুম!

মধুসূদন দরিপা
আঙুর ফল টক

আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে
দশ মাস ধরে শুধু বালি বুকে থাকে
ধূর্ত শেয়ালগুলি রাতে শুয়ে থাকে
দিবালোকে মানুষেরা মাস্ক পরে থাকে
শেয়াল আর মানুষের সার্কাস দেখে
সব শালা যেতে চায় শেয়ালের দেশে
সেদেশে হরেক মাল ষোলো আনা দাম
চোদ্দো আনা রেখে খাও দু' আনার আম

ছোটো নদী ডুবে যায় বর্ষার জলে
ধূর্তেরা ঝুলে পড়ে আঙুরের ডালে
নাগাল পায় না তার বোকা শেয়ালে
টক স্বাদ আঙুরের বলে যায় চলে
আঙুরেরা নেমে আসে জল কমে এলে
লোকসভা সিংহের রাগ বেড়ে চলে

অংশুমান চক্রবর্তী
নাস্তিক

নাস্তিক মনে করো
তোমার পূজায় কোনো ত্রুটি রাখি, দেবী?

প্রতি রাত্রি জুড়ে চলে শুদ্ধ আরাধনা

ফুল-ফল-মিষ্টি নয়
উপচার সেজে ওঠে দীর্ঘ চুম্বনে...

স্বপন শর্মা

অর্জুন উবাচ-৩৩

এক সমতুল্য বীরত্বে মুগ্ধ, তবু
দৃষ্টিনন্দন সে দুর্জয়ের বিনাশ চাই কুরুক্ষেত্রে!
তাঁর রথের চাকা কি অমোঘ নিয়তি?
আঘাত থেকে বিরত গাণ্ডিব দেখে অস্ত্রহীন মূর্ছা
হঠাৎ চেতনা ফিরে পেয়ে
বাণাঘাতের জন্য উদ্যত এক দম্ভ,
নিরুপায় নিমিত্তমাত্র তাই
আমার মাতালির কূট পরামর্শে তাঁকে মৃত্যুলোকে পাঠাই।

আহত, অশক্ত, অস্ত্রহীন কিংবা শরণাগত হত্যা
ঘৃণ্য বীরত্ব—পার্থের রণনীতির পরিপন্থী।
তাই নিহত কর্ণের প্রতি করুণায়
দুঃখের মেঘ ঢেকে দেয় খণ্ডিত অস্তিত্ব।
হে কৃষ্ণ, আমি যে আমার মাটির ছায়াকে এড়াতে পারি না!

যুদ্ধে ও প্রেমে সমস্ত রীতি প্রতিকূল হাওয়ায় উড়ে যায়?
লড়াইয়ের অবিচ্ছেদ্য রূপ
পাপাশ্রয়ী ছল ও কৌশল দাঁড়ায় মাথা উঁচু
জয়ী নিজেকেও মরে যেতে হয় হয় তিলে তিলে
সমস্ত জয়ে তাই বেদনার্ত অশ্রুজল ঝরে।

আশিস চৌধুরী

সম্পর্ক

সম্পর্কগুলো যত্ন করে লালন পালন করা উচিত...
বিছানার চাদরের মতন...
টান টান...
খাট জুড়ে পাতা...
শত ব্যবহারের পরেও ভাঁজ পড়ে না...

সম্পর্কগুলো হোক গাছের চারার মতন
জল-হাওয়া মাটির গন্ধের আশকারা...
আকাশমুখী বেড়ে ওঠা...

সম্পর্কগুলো হোক মায়ের মতন
দিনের শেষে সব ভুলগুলো
ঠিক হয়ে যাওয়ার মতন, আঁচলের মতন
ঘেরাটোপের আশ্রয়।

যদি হত?
গল্প বলা সত্যির মতন?

মাসুদ পথিক

আর কোনোদিন দেখা হবে না বাবা ও সন্তানের সঙ্গে

চায়ের কাপে নদীকে ডুবিয়ে পান করছি,
নদী খুব কাঁদছে। কাঁদছে নদী...

ঠিকানা হারাতে হারাতে পৌঁছেছি ফুটপাতের এই চা-স্টলে
বয়ামে বয়ামে সাজানো নদী-ভাঙনের কবলে পড়া সব কৃষিজমি।

হাহাকার

হ্যাঁ, গ্রামবাসী জানে আমিই সে পলাতক
দাদন ব্যবসায়ী আমাকে খুঁজছে,
আমি সে পিতা, ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ চাষা
বসতভিটায় এখন অন্যের গরু চরে,

চরে তিলঘুঘু

আশ্রয়ের খোঁজে আসা ফিঙে পাখি বাবা ও সন্তানের কবরের উপর
জিগাগাছের ডালে বসে খুঁটে খায় কবরের নির্জনতা
ব্যর্থদের ফেরার পথ থাকে না শূন্যতা ছাড়া, আর
বেওয়ারিশ হিসাবেই মানানসই এইসব সর্বহারা। সর্বহারা

কবরও কোলে পায় না স্রোতে ভেসে যাওয়া অনুভূতির শব
কোনো বন্দরও পায় না খুঁজে বাস্তবতার এই জলযানগুলি।

ফুটপাতে দাঁড়িয়ে-ই প্রাণান্তকর, খুঁড়ি নিজের কবর
কবর খুঁড়ি
ঘামে ভিজে ভিজে কেবল আবার ভাবি, আর কোনোদিন দেখা হবে না

কোনোদিন দেখা হবে না মৃত বাবা ও সন্তানের সঙ্গে, যারা ঘুমিয়ে আছে
গ্রামের পরিত্যক্ত গোরস্থানে!

চায়ের কাপে-ই বয়ে বয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর শেষ নদী এবং সর্বহারা ঢেউগুলি,

ঢেউগুলি
গন্তব্যহীন এই জীবন কতদূর, আর কতদূর যেতে পারে?

শরীরের ঘামের তীব্র নদীটি ধরে তীরে উঠে আসি সাঁতরে,
তথাপি পেটের দায়ে
রিকশার প্যাডেল মেরেই চলি অচিহ্নিত সমাধি অবধি...।

সমাধি অবধি।

জবা চৌধুরী

সেই আমরা

তুমি চুপ, আমি চুপ
ফ্রেমে বাঁধা আছি বহুযুগ।
হারানো দিনের পুরোনো কথায়
আর নেই অভিযোগ, অনুযোগ।

কত হাসি-রাশি, কত কোলাহল
হাতে হাত ছিল দু'জনের
প্রাণে গান ছিল, সুরে তাল ছিল
গেয়েছি একই গান সুজনের!

রুমঝুম কত বেজেছে নূপুর
চুপি চুপি ভোরে পালানো।
একসাথে দেখা সূর্যোদয়ের
স্মৃতিগুলো সুধা মেলানো।

স্কুল-কলেজের দিনগুলো সব
কখন গেল যে হারিয়ে
বাস্তব এল কঠিন রূপে
সব ভেঙে দিল মাড়িয়ে।

তুমি চলে গেলে বহুদূরে আর
এপারের সীমা ছাড়িয়ে
দুপুর, সন্ধ্যা, রাত্রি পেরোল
রইলাম পথে দাঁড়িয়ে।

বলল সবাই বাংলা ভাগ হল
পূর্বে আর পশ্চিমে
সূর্যোদয়ের ভাগ দিলাম তোমায়
অস্ত আমাতে—অন্তিমে ।

দেশভাগ হয়ে বিদেশি আমরা
প্রেমে বিভক্ত আত্মা
স্মৃতিটুকু আজও অবিভক্ত
বাঁধানো প্রেমের স্বত্তা।

ভক্ত গোপাল ভট্টাচার্য

অস্তিত্ব হারিয়ে

কত দেখেছিলাম কৃতকৌশল ছোটোবেলায় সব অপূর্ব দৃশ্য
সেইসব মেলা মুরগি লড়াই
পাতা আর মন্ত্রশক্তির আদান প্রদান
আজও রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখি...
কিছুর অস্তিত্ব নেই
সে প্রকৃতি বা জীবকূলের হোক,
কুয়াশা মাখা এই সভ্যতায় দিনযাপন
সর্বদা এক অনন্ত কৌতূহল।
মাঝিকে আর মাঝি বলে চেনা যায় না
নদী যেমন ভাটার টানে তার প্রকৃতি হারায়
শুষ্কতায় সংসারের টানে তার বাহুবল হারিয়ে ফেলেছে
পথের দুধারে সংসার বাঁধে আর হারায়
আমি নেমে আসি ঝরে যাওয়া পাতার কাছে
আজ নগ্ন নতজানু,অতর্কিতে বলে উঠি
লাঘব করো।
ধমনির মধ্যে জমা হতে থাকে দুঃখের বাষ্প
মাথায় কালো চুলের মধ্যে প্রস্ফুটিত লতা
ডালপালা মেলে আবেগপ্রবণ পলিমাটিতে
জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ডায়েরিতে লিখে রাখি
বাতাসে ভেসে যায় আমার সহনশীলতা
অস্তিত্বের সব স্মৃতি হারিয়ে আমি কি অবিশ্বাসী
মানুষের মতো...।

মামুন রশীদ

বিচ্ছেদ

স্থানে-অস্থানে ঘুরে আজ অবসর। চাও?
মুখস্থ স্মৃতি খোদাই করতে করতে বোঝা যায়
সবই অস্থাবর, তবুও তাকেই স্থাবর, দুষ্প্রাপ্য
ভেবে আগলে আছো জগদ্দল পাথর।

ফুলগুলো অপেক্ষায় থাকতে থাকতে
উতলা হয়। হারিয়ে ফেলে রঙিন পাৰক।
হাতের মুঠোয় জমা মেঘ সে তো
আমারই পাবার কথা। অথচ অনিশ্চিত বাতাস
ভিসাহীন উন্মাদের হাসি, উড়িয়ে নিয়ে যায়
সকল আকুলতা। ছাতিমের অপঠিত শাড়ির
বেষ্টনীতে, শ্বাস আটকে থরো থরো কাঁপে।

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায়

শুশ্রূষা

ভেবেছিলাম শুশ্রূষার ঠোঁট দিয়ে
শুষে নেবে সমস্ত বিষ ও বঞ্চনা
পেরোবে বাধা বিপত্তির সাঁকো
শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে
আঁকবে অসংখ্য আসাযাওয়া
তখনও সন্ধ্যা নামেনি ,অথচ
যে স্পর্শ অপ্রত্যাশিত ছিল
তার বিড়ম্বনা নিয়ে চুপচাপ ফিরে
গেলে তুমি,আর চাইলে না এদিক পানে নির্জনতম
সাঁঝ থেকে রাত পরে রইল শুকনো ফুলের মত!
তুমি কিন্তু রাখোনি অপারগতার
ঝড়চিহ্ন নিয়ে নুয়ে থাকা সেই গাছের খবর! বোঝনি
তার শিকড় ছেঁড়ার তীব্র যন্ত্রণা! কিছু না দিয়ে কিংবা
না নিয়ে তোমার সেই চলে যাওয়া তবু নিয়ে গেল
তার জমিয়ে রাখা স্থাবর অস্থাবর সমস্ত কিছু !

সৈয়দ খালেদ নৌমান

ট্রেনের পথ সমান্তরাল

সবুজ মাঠ দূরের পথ আকাশ ধোয়া নীল
বাতাস হিম চড়াই পথ পিঙ্গল ডানা চিল
ট্রেনের পথ অনেক দূর পাথর ভাঙা দিন
কাঁকন ভরা হাতের সুর চপল রিনি ঠিন
শাড়ির নীচে গভীর রাত সিঁদুর সিঁথি চুল
ঘুমের শেষে দিনের গান অবোধ চোখে ভুল।

ট্রেনের পথ অনেক পথ পাথর ভাঙা মন
আলতো টিপ শিথিল বেণী জানলা ঝনঝন
ধূসর কাচ জলের চোখ বাড়ানো ক্ষীণ হাত
ঢেউয়ের পর কিচ্ছু নেই শাড়ির নীচে রাত
লোহার পথ গানের দেশ সময় ভাঙা বুক
খানিক পর আপন ঘর আপন চেনা মুখ।

ট্রেনের চোখ অবোধ চোখ দূরের মায়া মিল
দোরের কাছে বাড়ানো হাত অনন্ত পাঁচিল
পাথর ভাঙা পথের পর সিঁদুর সিঁথি চুল
স্বপ্নভাঙা ঘুমের পর তবু এমন ভুল।

শাড়ির রাত স্বপ্ন ঢাকে সিঁদুর ঘন লাল
রাতের পর ট্রেনের পথ সমান্তরাল।

জয়তী চ্যাটার্জি

ভারতবর্ষের মানচিত্র

ছাদে শুকোতে দেওয়া কাপড়গুলোকে দূর থেকে
ভরাগ্রীষ্মের নদীর মতো মনে হয়;
দাবদাহে পুড়ে ছাদটা লোহার মতো গরম
ঠান্ডা ঘরে বসে কথা বলে যেসব মানুষ
তারা খুব ভয় পেয়ে গেছে
বাইরের পারদ তাদের বেরোতে দিচ্ছে না,
আমিও ভয় পাচ্ছি, আমি মুখ লুকোচ্ছি সানস্ক্রিনে
শরীরটাকে মুড়ে ফেলছি সাদা বরফের মত ঠান্ডা কাপড়ে
আমার পায়ে মানাসসই জুতো।
ছাদের দুয়ার খুলে দাঁড়ালে;
আমায় গিলে নিতে আসে বাইরের লেলিহান হলকা।
আমি ছুটে আবার ঠান্ডা ঘরে ঢুকে পড়ি
কমলির মুখের দিকে আমি তাকাতে পারি না
কমলি খালি পায়ে ছাদে চলে যায়
বিয়াল্লিশ ডিগ্রির দাহ ওর জীবনের দাহ থেকে অনেক কম
ওর পায়ে ফোস্কা পড়ে, এত গরম হয়ে উঠেছিল ছাদটা!
কমলি খালি পায়ে ঘোরে।
অন্যের বাড়ির মেঝে ঘসে ঘসে পরিষ্কার করে
অন্যের এঁটোকাঁটা সরিয়ে বাসন মাজে।
'এত রোদে ছাদে গেলি কেন?'
আমি ওর পায়ের ফোস্কাগুলোর দিকে তাকিয়ে
নতমস্তকে বলে উঠি।
উত্তর না-দিয়ে ও ছুটে যায় অন্য বাড়িতে
সেখানে বাসন পড়ে আছে, ঘর দুয়ার ছাদ
অপেক্ষা করে আছে ওর জন্যে।
ওর পোড়া পোড়া চামড়া লালচে লাগে তাপে
ওর পায়ের ফোস্কাগুলো দগদগে হয়ে ওঠে
ভালো করে সেই ক্ষত দেখলে মনে হয়
যেন ভারতবর্ষের মানচিত্রে ফুটে উঠছে
রক্তবর্ণ কয়েকটি রেখা...

প্রদীপ আচার্য

দোষ তোমারই রবিঠাকুর

তুমিই আমাকে প্রেমিক করেছ রবিঠাকুর
দোষ তোমারই।
এই যে আমি বারে বারে প্রেমে পড়ি,
হৃৎপিণ্ড হাতে ধরি, হাজার মরণে নিত্য মরি
সে তো তোমার গানের বাণীর উস্কানিতে।
দোষ তোমারই। দোষ তোমারই।
‘মন যে বলে চিনি চিনি... ’ লিখতে গেলে কেন?
কেন লিখলে, ‘তুমি যে আমারেই চাও
সে তো আমি জানি...’
কেন লিখলে, ‘আমায় দাও বলে দাও
দাও গো বলে সে কি তুমি, সে কি তুমি?... ’
দোষ তোমারই রবিঠাকুর, দোষ তোমারই।

রিনিক, ঝিনিক, মিমি, রিমি মুখপুড়িরা সামনে এলেই
ঘরপোড়া সেই মন যে আমার গুমরে গুমরে
একই তো গান গায়,
‘হৃদয়ের একুল ওকুল দু'কুল ভেসে যায়... ’
রবিঠাকুর, তোমাকেই তো নিতে হবে তার দায়।

গৌতম ভরদ্বাজ

ঈশ্বর দংষ্ট্রা রাতের ময়দান

মহাকালের অস্পষ্ট ছায়া বিষণ্ণ প্রেমের মতন
কুইন্স ওয়ে লাভার্স লেন ধ’রে রেসকোর্স ফার্লং গেটের
দিকে সুখ-দুঃখ আবৃত্তি করতে করতে
জন্মহীন মৃত্যুহীন সময়হীন আনন্ত্য উজ্জ্বল
আবহে ব'য়ে যায়।

নৈঃশব্দ্যের বাক্য দিয়ে লেখা জাদুগ্রস্ত
একটি গোটা শহর-রাত!
মেঘের মতন তার ভারি মেদুর আস্তর।
নিয়ত স্রোত অশেষ পৃথিবীর মতন
সে ছায়া প্রসন্ন হয়।
আমার দুগালে চুমু খায়।
ঈশ্বর দংষ্ট্রা আমি নির্লিপ্ত বাতকেতু তখন,
ট্রামলাইনে এক অনাবলোকিত উত্থানের মতন।

দৃশ্য-শ্রাব্যের প্রয়োজনের বাইরের স্বরসন্ধানী
অবশিষ্ট পানীয়টুকু অমৃত সমান বোধ হয়।

সোমা মুখোপাধ্যায়

আলোর রথ

অজানা ওই সরু পথটি ধরে
ভোরের বেলা রোদের উঁকিঝুঁকি—
আমি তখন ঘুম চোখটি মেলে
উঠোন ফেলে পথটি বেয়ে ছুটি।

ভোরের আলো বকুলমালা হয়ে
পথের পাশে গাছের খোঁপায় দোলে,
আমি তখন রোদকিরণে নেয়ে
দিনের কাজে আপনি মেতে উঠি।

রশ্মি কিরণ বদল করে সাজ
দূর্বা ঘাসে আগুন ছড়ায় রবি
আমার তখন নেইকো অবকাশ
কাজের ঝড়ে এলোমেলো উড়ি।

সন্ধ্যা নামে ধূসর পাখির ডানায়
মাঠের সবুজ আকাশ নীলে মেশে—
আমার ক্লান্তি মুছিয়ে দিয়ে ওই
আলোর রথে গোধূলি আসে নেমে।

গার্গী মুখোপাধ্যায়

উড়ব বলে

কোনো একদিন
ইচ্ছে ডানা মেলে ছিলাম নীল আকাশে
ঘুরতে ঘুরতে কখন যেন হাঁপিয়ে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে
গেলাম মাটিতে
ওড়ার সময় যে চরিত্রগুলোকে ছোটো ছোটো রঙিন
প্রজাপতির মতো লেগেছিল
কাছে এসে দেখলাম সেগুলো জরাজীর্ণ কাদামাটি
লেপটে বিচ্ছিরি যেন সব
অনেক চেষ্টা করলাম আবার ওড়ার
ডানা দুটো ঝাপ্‌টে ঝাপ্‌টে উঁচু পাঁচিল থেকে লাফ
দিয়েও দেখলাম
কিন্তু না আর পারলাম না
তাই উঁচু থেকে নতুন করে রঙিন পৃথিবীটাকে আর
দেখা হল না
কেটে গেল কত দিন মাস বছর...

আজকাল
রোদ লাগলে চোখ দিয়ে জল গড়ায়
বোধহয় আলো সহ্য হয় না
বৃষ্টি এসে পালকগুলো ভিজিয়ে দেয়
সোঁদা মাটির সাথে ভিজে ইচ্ছেগুলোর গন্ধ মিশে যায়
টেনে-হিঁচড়ে ডানা দুটোকে জাপটে ধরে ছাদের
কার্নিশে গিয়ে বসি
দেখি শেষ চেষ্টা করে
যদি আবার একবার উড়তে পারি।

রাজীব ঘোষ
বহ্নিশিখা

প্রবল বন্যায় একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছি
আমার চারিদিকে শুধু কফিন ভেসে বেড়ায়
তবে কি এই পৃথিবী থেকে পালাতে চাইছি
সেথায় যেথা বহ্নিশিখার সাথে দেখা হবে ।

পাড়ে দাঁড়িয়ে সবাই ফুল নিয়ে হাতে
বাবি আমার সন্তান এখন সে ঘুমে
তার ঝরনার মতো মুখখানা না দেখে
কী করে শীতল হবো মেদিনীপুরের মাটি !

মৃত্যুর পর প্রিয় নারীটি যদি বদলে যায়
তার সামনে তখন মহাভারতের ছেলে
দাঁড়িয়ে বলে গতজন্মে তোমাকে কাজল
পরিয়ে দিয়ে ছিলাম ধেনুকে সাক্ষী রেখে

আমার কি তখন আবার মৃত্যু হবে
মাছরাঙা ঠোঁটে বাসা বাঁধার আগেই!
আমি তো ডুবতে চেয়েছিলাম প্রিয়তমা
তোমার ঐ দুটো চোখের আনকরা গভীরে ।

সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল
কামরুন নাহার

কত যে সহস্র-অজস্র কামরুন নাহার!
কোন কামরুন নাহারকে ভালোবেসেছিলাম
মনে পড়ে না—
দাদার খড়ম কোন কাঠের তৈরি ছিল?

মনে পড়ে রোল করা সাদা খাতা আর
নিউজ প্রিন্টের কথা,
আমার খালি বানান ভুল হত,
চাঁদের উপর ‘চন্দ্রবিন্দু’ দিতাম না।
আর হাতের লেখা ছিল— কাকের ঠ্যাং, বকের ঠোঁট।

তালিকার বাইরেও কত কত কামরুন নাহার
এক কামরুন নাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক
আরেক কামরুন নাহারকে ছোটোকাকা বিয়ে করলে
সে কাকি হয়ে গেল!
আমি মরে গেলাম।
সেই মৃত্যু ছিল ভুল বানানের মতো,
খড়মের মতো, কাকের ঠ্যাঙের মতো।

মৃত্যুর পর আউট অফ মার্কেট হয়ে গেল নিউজ প্রিন্ট।

দুটি কবিতা

উদ্দালক ভরদ্বাজ

নির্জন প্রস্তুতি

ক্রমশ রঙের পালা শেষ
ক্রমশ স্বপ্নের ঘরে নির্জন প্রস্তুতি।
যার আসার কথা ছিল, গতজন্মের
ভোর পেরিয়ে, সে আজ নিষ্কলুষ সাজে
সন্ধ্যারাগে হৃদয়-পরিখায়, এসেছে
সোনার পায়ে। পেরিয়ে জীবন জঞ্জাল
তাই তাকে দেখা, চেনা, ভালোবাসা
রংহীন, আয়োজনহীন

অতল জলের কাছে

তবু এই সান্ত্বনা থাক
তবু এই ভ্রান্ততা থাক—

ভালোবাসো তুমি আমায়...
এই নিখিল-ছাপানো মিথ্যের অরণ্যে
একটি স্বপ্নগুল্মের মতো, সাদা মিথ্যের মতো
থাকুক এই কুয়াশা চাদরে ঢাকা নির্ভেজাল

আলোটুকু,
        অন্ধকারটুকু
                মনের ছায়ায়...
ঘিরে থাক প্রচ্ছন্ন মায়ায়
বাঁধনের প্রতিভূ, আকাঙ্ক্ষার
        নিভু নিভু সলতে—
যেটুকু জীবন এখনো ডানা ঝাপটায়,
        থাকুক আলোয়

        অচেনা, মিথ্যে বনেদিয়ানায়
আমাকে এই মিথ্যেটুকু দাও রিনি
আমায় বাঁচাও
        প্লিজ!

মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায়

সোনাঝুরি ও প্রোফাইল পিকচার

এদেশে সোনাঝুরি নেই
এখানে সর্বত্র কনিফারের জঙ্গলে
একমাত্র সোনাগাছ মিলে গেল তার।
তার নীচে দাঁড়িয়ে, কালো জোব্বা আর মেঘ,
মেঘ-বৃষ্টিতে ঝুপঝাপ বিকেলে
ঝুরি-নামা সোনাফুলে সূর্য মিশে গেলে
নীচে দাঁড়ানো তার, এই তার আকাঙ্ক্ষিত ক্ষণ,
যদিও মন ভার, নিজেকে সূর্যে সঁপে দিয়ে বলে,
‘হে মহাতরু, তুমি নাও এ মহাভার,
জীবের এ অসহ্য নৈঃসঙ্গে সূর্য হয়ে জ্বলা।’

এমন কথা বলেছিল যে মেয়ে
রক্তে এখনও তার অহংয়ের খেলা—
সোনাঝুরি ঝকঝক জ্বলে গাঢ় বিষাদের গায়ে,
এমনটাই দেখতে পেয়ে
এপ্রিলের কোনো এক অমোঘ সকালে
প্রোফাইল থেকে উধাও হল ছবি।
ছেয়ে গেল দশদিক লাল-নীল-গোলাপি আমোদে—
এই দেখো বেশ আছি, মহাবৃক্ষ, ক্ষমা করে।
আমার আরো মৃত্যু, আরো জন্ম বাকি।

শান্তশ্রী চৌধুরী

কথা দিলাম

কথা দিলাম আবার দেখা হবে
যখন কৃষ্ণচূড়া গাছটা রং-এর আগুনে
নীল আকাশের নীচে অপেক্ষা করবে প্রেমের
স্পর্শ আর ভালোবাসার আবেগ ভরা গোধূলি
লগ্নে চুপি চুপি আমাদের কথা শুনতে

আবার আর এক জীবন কিন্তু তুমি কি আমায়
চিনতে পারবে নতুন রূপে তোমার সাদা-কালো
চুল পাইপের গন্ধ আমি কিন্তু এক প্রজাপতি
হয়ে হাওয়ায় ভাসব মাঝে মাঝে তোমার কাছে
আসব চিনতে পারবে তো আমাকে...

চলার পথে একাকিত্বের মাঝে তোমার একলা
জীবনে আমি সঙ্গে থাকব মিষ্টি হাওয়া হয়ে...

সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়

পরিভাষ

আমরা দু-জন এক বিছানায় থাকি,
সে-ই আমাদের বিধিসম্মত সুখ;
ফাঁকির গলায় সূত্র বেঁধে রাখি,
হাসির ছটায় ফুলিয়ে তুলি বুক।
আমাদের অভিমানের নামটি ভঞ্জনা।
আমাদের পাশে থাকার নামটি কোন জনা!
বদনামি তো দেবেই সুশীল সজ্জনে,
আমাদের অজুহাতের নামটি খঞ্জ না।

অর্ঘ্য রায়

ঈশ্বর ও বিচ্ছেদ সংলাপ

আমি বেকারের পকেটের পাশে গিয়ে বসি!
বেকার আমার আমার পকেটের কাছে!
জমানো খুচরো গুনে রাখে ভোরের পাগল।

ভোর রাতে বাস আসে, কৈলাস ছুঁয়ে বাস থামে বাঁধের উপর!
স্বর্গের দরজায় শব্দ নিয়ে হাজির হয় স্বপ্নখোর কাঙাল!

সপ্তাহের শেষে ঘরে ফেরে স্বপ্ন ফেরি করা বোকা মানুষের দল...

নিষিদ্ধ মাংসের থালা হাতে বসে থাকে দেহাতি বামুন।
কিনে ফেলতে পারলেই সেসব অমৃত হয়ে যায়!
দেহাতি বামুন এখানে ঋত্বিক হয়ে ওঠে। মন্ত্র বদলে যায় !

অন্যায়ের অক্ষরে-অক্ষরে লেখা হয় নতুন সংবিধান!
অভিধানে মুখ লুকিয়ে থাকেন পরকালের দেবতা!

ত্রিদেবের কঙ্কাল এখানে মানদণ্ড তুলে দেন, চামারের হাতে!

ওখানে ব্রহ্মচারী জীবন, ভেলায় ভাসা বারণ!
দেবী সমাগম ঘটবে। শুধু তাকিয়ে দেখাও পাপ...
ক্ষমাহীন অপরাধ আর নির্বাসন!

মৃত্যুমুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ভুলের গাছ,
পাতা ঝরায়, মাটির সাথে আকাশের লাল মিশে একাকার!

নিরাকার দেবতা এখন দোয়া করবেন! আমরা ছলনা।

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

সেই তো আমার প্রিয়া

ভালো আমি যারে বাসিতে যে চাই
বুঝি নাই আমি কোথা তারে পাই
দুহাত বাড়ায়ে রয়েছি দাঁড়ায়ে
কে আসিবে কাছে ধরিবে জড়ায়ে
হঠাৎ সেদিন আলো-আঁধারিতে
পিছন হইতে জড়ালো আচম্বিতে
যত বলি তারে মুখটি দেখাও
হাসিয়া আকুল বলে দেখে নাও
কার ডাকে যেন ঘুম ভেঙে যায়
দেখি ছবির মধ্যে হাসিমুখে চায়
আর কেহ নহে সে আমার সুপ্রিয়া
বাঁধিয়া রাখিব সাতটি জনম
সেই তো আমার প্রিয়া।

গোপা চক্রবর্তী

লাল কাশ্মীরি শাল

অঘ্রানে ধানের খেতে হলদেটে রং ধরলে যদি ঝাঁক ঝাঁক
বনটিয়া উড়ে যায় তার ওপর দিয়ে;
মনে কোরো এমন বিকেল টাকে
একখানি প্রেমের কবিতা
যেন মলাটহীন খাতার বুকে।
যদি অঘ্রানের বিবর্ণ পাতায়
মুখ লুকোয় কোনো লক্ষ্মীপ্যাঁচা
মনে কোরো এমনি এক সন্ধ্যায় আমি ডেকেছিলাম
তোমায় উষ্ণ পেয়ালার আমন্ত্রণে।
যদি কোনো পৌষের শীতার্ত সকালে
হলুদ পাখির ছানাটা রোদ পোহায় কয়েত বেলের ডালে
মনে রেখো সেই সকালে
আমার অদৃশ্য ছোঁয়া জড়িয়ে থাকবে তোমার লাল কাশ্মীরি শালে।

সুপ্তশ্রী সোম

রাধাজীবন

জীবনের আনাচ কানাচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে যে অ-নিরুদ্ধ হাওয়া তাকে বাঁধতে গেলেই সে পালিয়ে যায়। অথচ কেমন এক মনকেমনিয়া সুরে বাঁশি বাজিয়ে ডেকে চলেছে। যেন আমি রাধা হবো বলেই তার এই আয়োজন। ঘরের চৌকাঠে লেখা অনুশাসনের লিপি মুছে আমি পা বাড়ালে চৌকাঠে দেওয়ালের কঠিন উপস্থিতি। তবু অমোঘ আশ্রয়ে পথকেই আঁকড়ে ধরি। সঘন শ্রাবণের রাত্রি আমাকে আড়াল দিয়েছে। পথ হারাবো বলে হারিয়ে ফেলেছি সব ঘরে ফেরার পথ। সামনে ধূসর আলপথের বাঁকে ওই কি তোমার কুঞ্জবন। সুনিপুণ তিরন্দাজিতে আমার সমগ্র জুড়ে যে কাঁপন তুলেছ তাকে সামলাতে পারে এমন দীর্ঘ অনুচ্ছেদ কোথাও খুঁজে পাইনি। সেই অক্ষত জমিন জুড়ে এখন অপেক্ষা আর অপেক্ষা। অলীক আশ্বাসে পথ বেঁধে আমি কুটিরের দরজার পাশে এলে দেখি কুঞ্জবনে তোমার সম্ভোগে অচেনা চন্দ্রমা। বুঝি রাধাদের যাত্রা আছে কিন্তু গন্তব্য নেই। ঘর আর কুঞ্জবনের মাঝের পথটুকুই সম্বল। এইটুকু গণ্ডিতেই রাধার অভিসার আর বিরহ।

নীলাঞ্জন শাণ্ডিল্য

শৃঙ্খলিত মহীরুহ

পথের দুপাশে ছিল ছায়া ঘেরা
মায়াময় কিছু মহীরুহ—
আজ তারা স্মৃতি।
পিচের রাস্তার ধারে ধারে ফাজিল ছোকরার ঢঙে
ল্যাম্পপোস্টগুলো সারি সারি এসে দাঁড়িয়েছে।

ঘুমঘুমভাঙানিয়া পাখপাখালির মৃদু ডাক
সন্ধ্যায় ঝিঁঝির কনসার্ট
কবে চুপ।
ঘুম ভাঙে হর্নের চিৎকারে।

প্রাণ খোলা হা-হা হাসি শেষ কবে—
এখন দস্তুর
মুখ টিপে ছেঁদো হাসি, নকল ভদ্রতা।
কোণের টেবিলে ঠিক যেন
রথের মেলার থেকে কেনা
শৃঙ্খলিত কোনো মহীরুহ।

সুস্মেলী দত্ত

চিলেকোঠার গল্প

হা-পিত্যেশ নষ্ট বুকে এল শ্রাবণ মাস
উষ্ণ ছোঁয়া ঠোঁট-পাঁচালি আর কী বলি, চাস?

জন্ম বোধে বিষণ্ণতা যাপন বোধে সুখ
ফালতু মেঘে যাক না সরে মন্ত্রয়ানা তুক

রোজ বিকেলে ঝুপ নেমেছে অন্ধকারের সারি
সব ছেড়ে দে সব ভুলে যা দূর গগনে পাড়ি...

বিসমিল্লা না-থাক যদি স্বপ্ন ঘিরে রাখা
রাস্তা মরে রাস্তা ওড়ে ছটাক আঁকাবাঁকা

যা হচ্ছে তা থাক না দূরে শান্ত ভুঁয়ে চোখ
একটা নদী কুলকুলাল সবার ভালো হোক—

চুপ শোণিতে জমছে ধুলো বাড়ছে নকশি কাঁথা
বৃষ্টিবেলা ভর করল আমায় ধরে বাঁধ

ফুলছে ঢেউ ফুটছে মোম যে যার মতো ঘোরে
বিড়িবিড়িয়ে নিশির ডাকা অক্ষরে অক্ষরে

শরীর বোঝে তাগিদ ছিল একটু দেখা ছুঁয়ে
ভেজার মতো ভিজতে থাকি পাল্লা একে দুয়ে...

সাদাত হোসাইন-এর
প্রেমের কবিতা

১.

একদিন উবে যাব উড়ো মেঘ হয়ে
লিখব না চিঠি আর কান্নার জলে,
সোনালি রোদের সাথে সোনারঙা দিন
লেগে থাক তোমার ওই না-ভেজা আঁচলে।
একদিন চলে যাব এ থাকার মতোই
যেমন থেকেও কভু ছিলে না তো তুমি,
বুকের বসতি জুড়ে যে ব্যাকুল হাওয়া,
তার নাম দিয়ে দেব ঝড় মৌসুমি।

২.

একদিন এ আঁধার বুকে করে সব
চলে যাব দিয়ে সব বিভা-বৈভব
হারালে মানুষ যে ছিল না কখনো
সে কখনো পারে না তো ছুঁতে অনুভব।

আমিও তেমন করে অনুভবহীন
চলে যাবো চুপিচুপি 'বেদনাবিহীন'
তারপর আলো তুমি বুক ভরে নিয়ে,
জ্বেলে দিয়ো সোনারঙা স্বপনের দিন।

দূরের তারার মতো আরো দূরে কেউ
হারায় জলের বুকে নামহীন ঢেউ
তার কথা তার ব্যথা কে-ই রাখে মনে,
শুধু তারা জানে কী পোষে সে সঙ্গোপনে।

৩.

আমাদের আর কখনো দেখা হবে না।
যেখানে শেষ দেখা, সেখানে পড়ে থাকবে শিউলি ফুল, অথচ গন্ধ ছড়াবে রাফ্লেশিয়া। অলকানন্দা নামের যে নদী, সেও শুকিয়ে যাবে। আর সেখানে জেগে উঠবে আদিগন্ত সাহারা। আমাদের বুকের ভেতর ক্ষয়ে যেতে থাকবে স্মৃতির সৌধ। জেগে উঠতে থাকবে আলোকবর্ষ পথ।
আমরা দূরে চলে যাবো বিবর্ণ মেঘ, ধূসর কুয়াশা কিংবা দিগন্তরেখার মতো। দূর থেকে দূরে। আরও দূরে। আমাদের আর কখনোই দেখা হবে না। কথা হবে না। প্রাচীন রোম, গ্রিস, মেসোপোটেমিয়া, কিংবা মহেঞ্জোদারোর মতো আমাদের ঝলমলে দিন, সৌকর্য ক্রমশই ঢেকে দিতে থাকবে সময়ের অমোঘ আলখাল্লা। বিস্মৃতির অতলে ডুবে যেতে থাকবে আলো। নেমে আসতে থাকবে অন্ধকার। আমাদের দগদগে বেদনার ক্ষত হয়ে উঠতে থাকবে ক্রমক্ষয়িষ্ণু দাগ আর আমরা সময়ের ধুলোয় ঢেকে যাওয়া প্রাগৈতিহাসিক পাথরের মূর্তি, নির্বাক।

আমাদের আর কখনো দেখা হবে না।
যেখানে শেষ দেখা সেখানে পড়ে থাকবে পুরোনো আতরের ঘ্রাণ, টুকরো হৃদয়, অনন্ত বিচ্ছেদ।
আর ক্রমশই জেগে উঠতে থাকবে অলঙ্ঘনীয় দূরত্বের প্রাচীন প্রাচীর।

৪.

মানুষ জানে না কখন কোথায় ডানা ঝাপটায় পাখি
তবুও হঠাৎ বুকে জমা মেঘে কত জল ধরে রাখি।
মানুষ জানে না কখন কেন যে মেঘ থমথমে মন,
কারো মায়া চোখে বুক ভার হলে ভেবে নেয় অকারণ।

৫.

কাকে ফেলে যাও?
যে থাকে নদীর মতো
তাকে ফেলে—
স্থলে নৌকা ভাসাও?

৬.

তুমি আলোর মতোই ভালো
আমি মেঘের মতো ম্লান
তোমার রূপালি রোদ ঠোঁটে
আমার বেঁচে থাকার গান
তুমি আকাশ হলে আমি
ভীষণ বিবর্ণ এক পাখি,
তবু বিহঙ্গ এ জনমে
তোমায় ছেড়ে কোথায় থাকি!

৭.

জেনে নিয়ো
এ ধূসর প্রহর, এ ঊষর শহর
এ মেঘের দিন, তোমাতে বিলীন।
দেখে নিয়ো—
এ একা দুপুর, এ বৃষ্টি নূপুর
ভেজা কফি কাপ, কারো মন খারাপ!

৮.

কত কথা থাকে
বলা যেত তাকে
বলা হয় না।
কত ভুল ফুল
ফুটতে ব্যাকুল
ফোটা হয় না।
কত মিছে গান
মিছে অভিমান
দুয়ারে দাঁড়ায়।
কত মেঘ-জল
এ বুকে অতল
অলখে হারায়।
দূরে থাকা পাখি
আরও দূরে রাখি
ব্যথা সয় না।
কত কথা থাকে
বলা যেত তাকে
বলা হয় না।

৯.

মেয়েটাকে চিনি—
দুঃখ পেলে ভাবে, নিজেতে লুকাবে
নীরবতা দিয়ে সব অশ্রু শুকাবে।
ঠোঁটে তার আঁকা, বেদনার পাখা
যতখানি উড়ে যায়, থাকে তারও বেশি-
তাকে দেখে দূর থেকে এখানে এসেছি।

জানে শুধু জল, চোখ ছলছল
দায় নেই কারো তাই লুকায় আঁচল।
অভিমানী তুই, পাবি না কিছুই
মিছেমিছি মুছে যাবে চোখের কাজল।

মেয়েটাকে চিনি—
দুঃখ পেলে ভাবে, লুকাবে স্ব-ভাবে
যদি কেউ বুঝে নেয় না-বলা জবাবে!

মেয়েটাকে চিনি—
কাছে এসে তবু তাকে কখনো দেখিনি।

১০.

একদিন আরও কিছু হেরে, এ শহর ছেড়ে, চলে যাব— দূরে কোথাও। অচেনা স্টেশনে এক কাপ চা। তারপর যা, মেঠোপথ ধরে। দূরে পাহাড় তার মাথায় মুকুট। মেঘেদের মায়া। পায়ে তার নদী। তারপর সবকিছু ছেড়েছুড়ে যদি — আমি যাই। আলপথ ধরে হেঁটে আসা পায়ে, তোমাদের সব স্মৃতি, জীবন মাড়াই? তারপর যদি আমি ডেকে বলি— নদী। ডেকে বলি— হে মেঘের দেশ, একটু দাঁড়াই?
এইখানে বাসা বেঁধে থাকি? এইখানে ঘাসফুল, পাখিদের কাছে আমারেও রাখি?
এ দহন জীবনেরে ছেড়েছুড়ে একদিন চলে যদি যাই। না — বলে যদি যাই। যদি কোনো নির্জন রাতে, হাত রেখে হাতে, একাকী এ নিজেরেই বলি, যা কিছু আমার ছিল, যা কিছু ভেবেছি ছিল— মিছে সকলি।

মানুষ মিথের মতো আছে কী বা নাই— ঠিক জানা নাই— তবুও মানুষ নামে সৌধ বানাই।

একদিন চলে যদি যাই — ছেড়েছুড়ে সব। সব কলরব। সব মিছে মায়া। স্মৃতিদের ভুল, মুছতে আকুল — হয়ে চলে যাই, দূরে।
তোমাদের এ শহর, ভুলেদের ভিড়ে, যারা আর কখনোই আসে নাই ফিরে। কে রাখে খবর তার, কে জানে কবর তার— কই হারাবার!
মনও তো মাটির মতো গিলে নেয় সব, জীবিত বা মৃত সব; শব। একদিন তাই — চলে যেতে চাই। সব ছেড়ে দূর কোনো দেশে।
যেইখানে এসে, বলবে না কেউ—
এখানে জীবন মানে ভুল মানুষে— পাড় ভাঙা ঢেউ।

বীথি চট্টোপাধ্যায়

শারদ উৎসব

বাৎসরিক

কোথাও কি আর দেখা হয়ে যাবে
কেউ কি কোথাও থাকে?
সূর্যের আলো ঝিকমিক করে
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।

ধুলো ঝেড়ে কত গুছিয়ে রেখেছি
হারিয়ে গিয়েছে বলে,
নদীর ঢেউতে এ-জীবন ভেসে
বহুদূরে গেল চলে।

এমন বৃষ্টি তখনই নামলো
পথে ফুল ছিল পড়ে;
কোথাও আবার দেখা হয়ে যাবে
কোনও ছায়াপথ ধরে...

চরণচিহ্ন

বকুল ঝরেছে ছোট্ট চাতাল জুড়ে
রোদ ওঠে যেন বিসমিল্লার সুরে।

আকাশের কোন ঠিকানায় চিঠি আসে?
সেই ঠিকানা কি সাদা ফুল ভালোবাসে?

ফুল পড়ে থাকা পথ ধরে চলে যাওয়া,
পৌঁছেও দেখে বাকি কত কিছু চাওয়া।

উঠোনে অতিথি ক্ষণিকের আলপনা,
তারায় তারায়; মেঘে মেঘে আনাগোনা।

যে তারা প্রয়াত, সেও আলো নিয়ে আসে,
সেই আলো বুঝি সাদা ফুল ভালোবাসে?

অতিথি

গতি মুছে দিয়ে ; এসে পৌঁছোল ট্রেন
সহযাত্রীরা কেউ তো আপন নয়।
কোনও কলরব কোথাও থাকবে না?
জন্মানো মানে এতবড়ো পরাজয়?

কথায় কথায় দূরে দিন ঢলে পড়ে
কোথা থেকে এত কথা এসে যায় মনে?
কলকাতা ফিরে দেখা হবে একদিন—
আগে থেকে সব ঠিক করে নেব ফোনে।

পৌঁছে গেলে তো আলাদা হতেই হবে
কেউ আটকাতে পারবে না জোর করে।
কিন্তু কখনও যদি মনে পড়ে যায়
চলে এসো দূর কুয়াশার পথ ধরে...

কোনও কলরব কোথাও সেখানে নেই
প্রদীপ নিভিয়ে আছড়ে পড়ছে ঢেউ;
গঙ্গার জল সবই নিয়ে যায় তবু
কাউকে কখনও ভুলতে পারে কি কেউ?

জন্মানো মানে এতখানি ভেসে যাওয়া?
কে লিখছে এই অলীক জীবনধারা?
সব পড়ে থাকে সকলেরই জানা কথা
চশমা ও ঘড়ি অতল কূল-কিনারা

অসময়

কার বাড়ি থেকে উঠে চলে গেল কারা?
ধুলো জমে গেল কারুর গানের খাতায়
কোন দরজায় বহুদিন তালা দেওয়া;
পড়ে আছে কটা ওষুধের ছেঁড়া পাতা।

যেখানে কখনও আড্ডা বসত আগে?
এখন সেখানে মাকড়সা জাল বোনে,
পুজোর সময় ভাঙা জানলার পাশে
শিউলি বিছিয়ে পড়ে আছে আনমনে।

কোন স্টেশনের নামটি হয়নি পড়া
ট্রেন চলে যাবে; যাবার সময় হলে,
কোন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছে কেউ
আর কোনওদিন ফিরে আসবে না বলে...

কার হৃদয়ের টুকরোয় কাকে দেখে
কে হয়ে গিয়েছে উটের গ্রীবার মতো?
জানলায় এসে দাঁড়িয়েছে চুপ করে ;
কোন ফাঁকা ঘরে হাওয়া বয় অবিরত?

কোন বাড়িঘর কুয়াশায় ভেসে যায়?
কী কারুকার্যে মাকড়সা জাল বোনে,
কোন দরজায় বহুদিন তালা দেওয়া
শিউলি বিছিয়ে পড়ে আছে আনমনে।

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

গাহিতে হয় দুই জনে

দুই সখী শকুন্তলাকে নিয়ে তপোবনের ছোটো ছোটো গাছগুলিতে জল দিতে এসেছিলেন। আর আমাদের প্রাচীন নায়িকা-রমণীরা স্বভাবতই বড়ো পেলব আর দেহতত্ত্বে বড়োই ভঙ্গুর, হাঁটেন গজগমনে, কথা যত বলেন, বোঝান তার চাইতে বেশি। নাটকের সারা প্রথম অঙ্ক জুড়ে শকুন্তলা তাঁর প্রথম-দেখা নায়ক-পুরুষের সঙ্গে একটা কথাও বললেন না, অথচ প্রথমাঙ্কের শেষেই আমরা বুঝলাম— এই দুজনের প্রেম হয়ে গেল। বস্তুত প্রেম এখানে বড়োই পরনির্ভর— প্রথমে সখী-নির্ভর, তারপর রাজ-নির্ভর। নায়িকাদের এমনই মহতী অবস্থা যে, গালের ওপর খুচরো চুল এসে পড়লেও তা সরিয়ে দেবার জন্য সখীকুলের ডাক পড়ে— অভিসারের সময় মালাগাছিও তাঁর গলায় পরিয়ে দিতে হয় অন্যা রমণীকে, তাঁরা নিজে কিছু করতে পারেন না—

দে লো সখী দে পরাইয়ে গলে,
সাধের বকুলফুলহার।
আধফোটা জুঁইগুলি যতনে আনিয়া তুলি,
গাঁথি গাঁথি সাজায়ে দে মোরে
করবী ভরিয়ে ফুলভার।
তুলে দে লো চঞ্চল কুন্তল
কপোলে পড়িছে বারেবার।

ঠিক এই চরিত্রের এক অকর্মণ্যা, অথচ চরম-মধুর ব্যঞ্জনায় স্ফুটাস্ফুট শরীর-লাবণ্যে শকুন্তলার হাত ধরে দুই সখী অনসূয়া-প্রিয়ংবদা গাছে জল দিতে এসেছিলেন। ঠিক তখনই নবমালিকা ফুলের লতানে গাছটির ওপর নজর পড়ে প্রিয়ংবদার। এর আগে বকুলগাছ নিয়ে খানিক কথা হয়েছে তিন সখীতে। মনে তো রাখতেই হবে যে, এই তপোবনের পরিবেশে এবং মানসিকতায় গাছগাছালিও এক বড়ো ভূমিকায়। সদ্যযৌবনবতী এই তিন সখীর কৌতূহলের অন্যতম জায়গা হল কোথায় কোন্ লতা জড়িয়ে উঠেছে! প্রথমেই এক বকুল গাছের পাতায় শিরশিরানি দেখে শকুন্তলা ভাবলেন বুঝি পাতার আঙুল নাড়িয়ে বকুল গাছ ডাকছে বুঝি তাঁকে। কিন্তু একটু এগোতেই প্রিয়ংবদা সখী শকুন্তলাকে বললেন— আরে! দাঁড়াও দাঁড়াও, তুমি এই এলে ওর কাছে আর এখনই দেখছি এই বকুলগাছ যেন তার ঈপ্সিত লতা-নায়িকাটিকে পেয়ে গেছে— ত্বয়া উপগতয়া লতা-সনাথ ইব অয়ং কেশর-বৃক্ষকঃ প্রতিভাতি।

আমরা শুধু বলতে চাইছি পুষ্পিণী লতার সঙ্গে রমণী-শরীরের তুলনা করাটা প্রাচীন কবিদের একটা অন্যতম কল্প। কিন্তু একই সঙ্গে কবি প্রিয়ংবদার মুখ দিয়ে শকুন্তলাকে একাত্ম করে দিলেন বনজ্যোৎস্না

নবমালিকার সঙ্গে এবং সকৌতুকে বললেন— শকুন্তলা বনজ্যোৎস্নাকে এত করে দেখছে এই জন্যই যে, এই লতাগাছি যেমন, আঁকড়ে ধরবার মতো উপযুক্ত একটা গাছ পেয়েছে তেমনই শকুন্তলাও নিজের অনুরূপ একটা বর পাবে, সেইজন্যই এই লতাগাছিকে এত দেখা। সত্যি বলতে কী, লতার মতো অনন্ত বনিতাকুলের এই আলম্বন বিভাব নান্দনিক রসশাস্ত্রগুলির বিষয় হতে পারে— কেননা, নাট্যশাস্ত্রে নায়ক এবং নায়িকা যেমন নাটকের আলম্বন, তেমনই তাঁরা নিজেরাও পরস্পরের আলম্বন, কিন্তু আজকের এই উদোম স্বাধীনতার দিনে কোনও রমণী লতাগাছির মতো প্রেমিক কিংবা স্বামীকে অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরছেন— 'ইহা অতি অশ্রদ্ধেয় কথা'।

আরও সমস্যায় পড়েছি এতকালের চর্চিত প্রেম-নামক বায়বীয় বস্তুটির অন্তর্গত স্বভাব নিয়ে। সেখানে অখিল রমণীকুলের হৃদয়-বিশ্রান্তির মধ্যে যে স্বতঃসিদ্ধ অবলম্বন-মানস যৌবনাবধি নিহিত থাকে, সেটা যে বস্তুত আলম্বনী-বৃত্তিহীন এক আত্মমেহন-মাত্র, এ-ব্যাপারে আমার কোনও ধারণা ছিল না। এটা হতেই যে আমার শরীরের মতো আমার মনও প্রাচীন হয়ে উঠেছে, তাতে আধুনিক যুক্তিগুলি তেমন করে বুঝতে পারছি না। কিন্তু মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, তাঁদের সত্তা-সম্বন্ধে নিত্য এবং নৈমিত্তিক শ্রদ্ধাবোধের অংশ বাদ দিলে শরীর, মন, অন্তর্বৃত্তি এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে মেয়েদের স্ব-ভাষিত নিরালম্ব ভাবাটুকু আমি এতটাই গুলিয়ে ফেলি যে, আমাকে অকথ্যভাবে প্রাচীন বানিয়ে তোলে। কথাটা আমি বলেও ফেলেছিলাম একটা সেমিনারে।

সেটা মেয়েদের ওপরেই একটা সেমিনার— প্যার্টিয়ার্কি, উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট— এমনই একটা বিষয় ছিল বোধহয়। সেখানে শুনতে এসেছেন যাঁরা তাঁরা সকলেই স্ত্রীলোক— ছাত্রী থেকে শিক্ষিকা— কৈশোরগন্ধী যুবতি ছাত্রী থেকে যুবতি, প্রৌঢ়া, অবসরমুখী শিক্ষিকারা। বক্তাদের তালিকায় মান্যা এবং গণ্যা মহিলারা ছাড়াও একটিমাত্র পুরুষ এবং আমি— সর্বশেষ বক্তা। মান্যারা বলছিলেন— তাঁদের অবরুদ্ধ ক্ষোভ, পৌরুষেয়তার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ এবং নারীর জীবন-যন্ত্রণা। চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায় 'সেই হয় অকথ্য-কথন'। পুরুষ মানুষ যে কত খারাপ হতে পারে তার নারকীয় উচ্চারণ শুনে আমর প্রতিপদেই মনে হচ্ছিল যে, এই বিদ্বৎসভায় আমার কোনও বক্তৃতা দেবার যোগ্যতাই নেই। পুরুষের জঘন্য দৃষ্টিপাত থেকে আরম্ভ করে তার প্রবৃত্ত, objectification, comodification, সব এমন রমণীয় পক্ষপাতে এমন কঠিন ভাবে উচ্চারিত হল যাতে একটা আশা রইল যে, সেই পুরুষ বক্তাটি এর বিরুদ্ধে কিছু অন্তত বলবেন। আমার ঠিক আগেই তিনি বলতে উঠলেন। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম— পুরুষ-বিরোধিতায় তিনি মহিলা অধ্যাপিকাদের চেয়েও দশ গুণ বেশি। তিনি আরও ঝাঁঝালো ভাষায় অগণিত কঠিন মুখভঙ্গিতে, পৌনঃপুনিক হস্ত-সঞ্চালনে সভাগৃহকে একেবারে আন্দোলিত করে ফেলার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু মহিলা শ্রোতাদের মধ্যে আমি কোনও তরঙ্গ দেখলাম না। যখন মহিলারা বলছিলেন, তখন থেকেই এঁদের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পুরুষ-সমাজের বিরুদ্ধে সার্বিকভাবে চেতিয়ে ওঠার কোনও লক্ষণই দেখলাম না, আমার পার্শ্ববর্তিনী এক মহিলা বক্তাকে সেটা একটু জানাতেই তিনি বললেন— এরা কিছুই বোঝে না। এরা দুপুরবেলা কলেজে এসে কতগুলো আকাট ছাত্রীকে পড়াবে, আর বাড়ি ফিরে গিয়ে গুণধর স্বামীকে ফুলকো লুচি খাওয়ানোর জন্য ময়দা ঠাসবে। আমি খুব চাপা গলায় তাঁকে বললাম— আপনি বোধহয় ফুলকো লুচিও পছন্দ করেন না এবং গুণধর স্বামীও পছন্দ করেন না। তিনি বললেন— না, না আমি সেই অর্থে গুণধর বলিনি। আসল সে-ও চাকরি করে, তুইও চাকরি করিস। তাহলে তুই বাড়ি গিয়ে ময়দা ঠাসবি কেন? তোর স্বামীকে বল না ময়দা ঠাসতে। আমি বললাম— তাহলে ফুলকো লুচিটার কী হবে? কঠিনহৃদয়া অধ্যাপিকা বললেন— অই-তো! আপনারা সব বাইরে মোষ চরিয়ে এসে বাড়িতে ফুলকো

লুচি খাবেন, আর আপনার বউ সারা দিন পরিশ্রম করে এসে ময়দা ঠাসবে, অমন লুচি আপনারা মুখে তোলেন কী করে? আর মশাই! আমি আপনাকে বলছি কেন? সমস্ত পুরুষ মানুষরাই এইরকম। মেয়েরা ময়দা ঠাসছে আর আপনারা দিন-রাত মেয়েদের ঠেসে বেড়াচ্ছেন, এমনকি যে-কোনও অসুবিধে হলেই ঠেস দিতেও ছাড়ছেন না।

সভায় তখন সেই একমাত্রিক পুরুষটির আগুনে-বক্তৃতা চলছে। সামনের শ্রোতৃবর্গ 'সেমিনার'-এর যান্ত্রিকতায় প্রহর গুনছেন। আমারও অত আগুনেপনা ভালো লাগছে না। আমি সেই পার্শ্ববর্তিনীর কাছে বরং একটা সাফাই দেওয়ার চেষ্টা করে বললাম— দেখুন, ঠাসাঠাসির মধ্যে একটা গভীর পারস্পরিকতা আছে এমনকি ঠেসাঠেসি অর্থাৎ ঠেস দিয়ে কথা বলার মধ্যেও একটা মজা আছে কিন্তু। এই যে আমরা ভিড় বাসে ঠাসাঠাসি করে যাই, এখানে পরস্পরের সহায় না হলে...। কথাটা পড়তে পেল না, মহিলা বললেন— ঠাসাঠাসির মধ্যে পারস্পরিকতা? তাই না? ভিড় বাসে ঠাসাঠাসি হলে মেয়েদের কী অবস্থা হয় জানেন না? ছেলেরা সেখানে...। আমি মনে মনে বললাম— ন্যাপলা! আর নামিস না। মহিলা-মহোদয়াকে বললাম— আমি ওই বাসের ঠাসাঠাসির কথা বলিনি, আপন লেডিস সিটের সামনে দাঁড়ানোর জায়গাটা নিয়েই ভাবছেন শুধু, বাসের আরও একটা বিস্তীর্ণ স্থান আছে, যেখানে সমস্ত পুরুষেরা ঠাসাঠাসি করে গন্তব্যস্থলে যায়। আর আপনাকে এটাও জানিয়ে রাখি— আমি বহুকাল ট্রেনে যাতায়াত করেছি। সেখানে অফিসযাত্রী বেশিরভাগ মহিলারা লেডিজ কম্পার্টমেন্টে ওঠেন না। তাঁরা বলেন— সেখানে নিত্যদিন এত চ্যাঁচামেচি, এত ঝগড়া এবং এত অসহযোগিতা যে, সহ্য করা যায় না। সেখানে পুরুষদের নয়, জেনারেল কম্পার্টমেন্টে মাঝে মাঝে পুরুষদের একটু-আধটু এটা-ওটা অসভ্যতা থাকে বটে, কিন্তু সহায়তার জায়গা সেখানে অনেক বেশি। এক মহিলা এমনও বলেছিলেন যে, অফিস-টাইমে ট্রেনে ওঠার সময় কতবার যে গেটে-দাঁড়ানো ঝুলন্ত পুরুষেরা প্রায় পাঁজাকোলা করে ট্রেনের ভিতরে তুলে নিয়েছেন, তার জন্য পুরুষ-জাতির অন্যকৃত অপরাধও যেন ক্ষমা করে দেওয়া যায়।

অধ্যাপিকা মহিলা অত্যন্ত অপছন্দের সঙ্গেও আমার মত মেনে নিলেন না। ওদিকে আমরাও বক্তৃতার সময় হয়ে আসছিল। বিশেষত এই অধ্যাপিকাকে আর কিছু বোঝানোর চেষ্টা না করে এটাই আমি বিশ্লেষণ করে দেখলাম যে, মেয়েদের 'এমপাওয়ারমেন্ট'-এর ব্যাখ্যান-বৈচিত্র্যের মধ্যে একাংশের মানসিকতা কিন্তু এইরকমই যেখানে একটা ফুলকো লুচি কিংবা ভিড়ে ঠাসাঠাসির মতো যে, কোনও কথাই হোক না কেন, সেই শব্দ চয়ন করেই একটা পুরুষ-বিরোধিতার প্রকরণ তৈরি করা যায়। কেননা শব্দ এখানে উপলক্ষ্য মাত্র, যে-কোনও শব্দই এঁরা পুরুষের বিরোধিতায় পর্যবসিত করতে পারেন।

পড়ন্ত বেলায় আমি বলতে উঠলাম, শ্রোত্রী মহিলারা কেউ কেউ সারা দিনের পৌরুষেয়তায় ক্লান্ত হয়ে ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছেন, তবু তখনও বসে আছেন অনেকে। আমি ঠাকুর স্মরণ করে বলতে উঠেই জানালাম— এতক্ষণ তো অনেক শুনলাম। আমি তো আবার রামায়ণ-মহাভারত ধুয়ে জল খাওয়াব। অতটা সহ্য হওয়ার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব চাই আপনাদের কাছে। যদি সত্যি উত্তর দেন, তাহলে মহাভারতের দ্রৌপদীর কথা শোনাব, না হলে সারা দিন এত জ্ঞানের পর আমার এই মেঠো কথা না শুনলেও চলবে। বহু জায়গায় একই কথা বলে আমিও ক্লান্ত। তার থেকে শুধু প্রশ্নোত্তরীতেই এই পর্বটি শেষ হোক না। কিন্তু আমার প্রথম প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতেই হবে।

সমবেত মহিলারা— প্রবীণা এবং নবীনা— তাঁরা সমস্বরে বললেন— আপনার মহাভারত-কথা শুনব বলেই বসে আছি। আপনার প্রশ্নটা বলুন, উত্তর দিচ্ছি। আমি বললাম— এটা ঠিক প্রশ্ন নয়, এটা একটা 'সিচুয়েশন', এখানে কীভাবে রি-অ্যাক্ট করবেন

আপনারা, সত্য বলুন। ধরা যাক আপনি রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন। আপনি যুবতি। হ্যাঁ, এখানে যে-সব ছাত্রী আছ, তারা

যেমন আছ তেমনি এসো
আর কোরো না সাজ।
বেণী না হয় এলিয়ে রবে,
সিঁথে না হয় বাঁকা হবে,
নাই-বা হল পত্রলেখায়
সকল কারুকাজ।

কাজেই তোমাদের নিয়ে চিন্তা নেই, কিন্তু যাঁরা এখানে প্রৌঢ়া আছেন, যাঁদের 'দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ/হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা'— তবু এখানও এমন মৃত্যুর মতো চেহারা নয় আপনাদের। কিন্তু ভাবুন, সেইসব দিনের কথা, যেদিন আপনারা রাস্তা পার হয়ে গেলে ফুটপাতে জলতরঙ্গ বাজত।

আমরা এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি সলজ্জ প্রৌঢ়াদের সংকোচে, সলজ্জে আরও যেন অবহিত বসতে দেখলাম। বললাম, ভাবুন সেইসব দিনের কথা, যেদিন 'ধরণী তরুণা' ছিল আপনাদের কাছে। সেইসব দিনে আপনারাও কিন্তু এই ছাত্রীদের মতো— ওই মালবিকা কিংবা বৈশাখীর মতো পথ হাঁটছিলেন আনমনে। কিন্তু ভাবুন একবার, আপনি পথ হাঁটছেন, কিন্তু আপনার সম-সমাজ রাষ্ট্রের ইচ্ছার মতো সৎ বিরোধী রাজনীতিবিদদের চরমতম বিরক্তি জাগায়, এতটাই সাধু ধরা যাক, ধরা যাক আপনার সময়ের পুরুষেরা। এই পুরুষেরা আমাদের অভীষ্টতম আদর্শে তৈরি, তারা মিথ্যা কথা বলে না, অপরকে তিরস্কার করে না, গুরুজনের কথা শোনামাত্র পালন করে, সমস্ত প্রকার স্ত্রীলোকের প্রতি তাঁদের মাতৃদৃষ্টি।

এই যে আপনি পথ হাঁটছেন বিধাতার আদি-সৃষ্টির গরিমায়, আমাদের শহরের সমস্ত উচ্চাবচ ঔদ্ধত্য আপনার শরীরে বহন করে এই যে আপনি পথ হাঁটছেন, সেখানে কোনও পুরুষ পথিক আপনার দিকে তাকাচ্ছে না। কোনও যুবক এতটুকু সশ্লেষ শব্দ করেনি, শিস দেওয়া, পঞ্চমের কোনও সুর, অনর্থক কোনও অমহিম উচ্চারণ, কিচ্ছু নেই। আর ওই যে পাড়ার ছেলেগুলো এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে জটলা করে, তারা সভ্যতার কোন মন্ত্রগুণে— আপনি হাঁটছেন— এমনটা দেখামাত্রই মাথা নীচু করে ইষ্ট-নাম জপ করছে, সহমর্মী বন্ধুকে আপনার দিকে আশ্চর্য-দৃষ্টিপাত করতে দেখে, তাকে সে বলল— এসো করি শাস্ত্র আলোচনা। কবিরা যাকে কনক-কলসের সঙ্গে তুলনা করে মুগ্ধ হয়েছেন, সে দুটি বস্তুত বহুতর শিরা-গ্রন্থিতে বর্তুল দুটি মাংসপিণ্ড ছাড়া কিছু নয়— স্তনৌ মাংসগ্রন্থী কনক-কলশাবিত্যুপমিতৌ। তোমার এই মুগ্ধ দৃষ্টিপাত যেখানে নষ্ট করছ, সেই দৃষ্টি তুমি ভগবদ্-বিগ্রহ দর্শনে নিযুক্ত করো— শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে/ মুকুন্দলিঙ্গালয়-দর্শনে দৃশৌ।

আমার প্রশ্ন— এই মহতী বিদ্বৎসভার সমস্ত যুবতি-রমণীদের প্রতি প্রশ্ন। এই প্রৌঢ়াকুলের পূর্বভাবিত তরুণী-স্বভাবের কাছে প্রশ্ন— আপনি রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন, তা সত্ত্বেও এই নিষ্ক্রিয়, নিস্তরঙ্গ, অনবদ্য, সাধুপুরুষ-সমাজের মধ্যে দিয়ে চলাফেরাটাই আপনারা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করবেন কিনা? আমি সারাদিন ধরে যে বক্তৃতা শুনেছি, তাতে বোঝা যায় যে এইরকমই একটা সাধুসমাজই আপনাদের নিতান্ত কাম্য হওয়া উচিত। আমার কথা শুনে সমবেত আবালিকা প্রৌঢ়রা একেবারে রে-রে করে উঠলেন। বললেন— না না, এইরকমটা আমরা চাই না। এত সাধু চাই না আমাদের। আমি প্রায় যুদ্ধজয়ের তৃপ্তিতে বললাম— তাহলে? এতটা জয়ীভাব অবশ্য বিদুষী রমণীরা পছন্দ করলেন না। বিশেষত সকাল থেকে যে বিরাট স্বাধীনতা-সংগ্রাম চলেছে, যার মধ্যে পৌরুষেয়তার বিচিত্র অন্যায়গুলি সত্য বলেই প্রতিভাত ছিল বহুলাংশে, সেইখানে আমার প্রশ্নটা

তাঁদের সাময়িক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে দিল। তাঁরা সেই দোটানা নিয়েই বললেন যে, হ্যাঁ, সমাজটা কখনও এমন হতে পারে না যেখানে সমস্ত পুরুষ মানুষই খারাপ, তবে পুরুষের মধ্যে বিচিত্র কৌশলে নারী-নির্যাতনের ঘটনাও কিছু কম নয়। আগে যাঁরা বলে গেলেন, যে-কোনও কারণেই হোক তাঁরা পুরুষদ্বেষী হয়ে পড়েছেন। আমরা পুরুষদ্বেষী নই, কিন্তু জীবনের বহুল ক্ষেত্রেই পুরুষদের আরও অনেক সংযত হবার প্রয়োজন আছে।

আমি বললাম— আপনারা ঠিক কথা বলছেন একেবারে। সুযোগ এসে গেলেই সকলে অতিমাত্রায় চড়ে যায়। এই পুরুষদ্বেষিতা যেমন চড়া সুরে বাঁধা, তেমনই পুরুষ বলেই তাঁদের অসংযমের কোনও মাত্রা নেই, আর— মেয়েরাও সেইরকম— তাঁদের অসুন্দর এবং অনাকর্ষণীয় হয়ে ওঠার সামান্যতম কোনও চিহ্ন নেই। আমি বললাম, এ এক অনিবার্য পরিস্থিতি, কারও রেহাই নেই এখানে। বিধির বিধান এমনই স্বতঃসিদ্ধ যে, 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী' হয়েই আছে মেয়েরা, নইলে দেখুন, রবীন্দ্রনাথ তো রাস্তায় দাঁড়িয়ে মেয়েদের 'উরি উরি, উরি বাবা' বলতে পারেন না, কিন্তু তিনি এটা বুঝেছেন যে পুরুষমানুষ মেয়েদের দেখে নানা শংসা করবে, এমনকি মেয়েরা সেটা আশাও করবে। তা নইলে অমন কাকুতি করে দেবযানী বলতেন না

যদি সখা, হেথা কেহ গেয়ে থাকে গান
চিত্তে যাহা দিয়েছিল সুখ, পরিধান
করে থাকে কোনওদিন হেন বস্ত্রখানি
যাহা দেখে মনে তব প্রশংসার বাণী
জেগেছিল ভেবেছিলে প্রসন্ন-অন্তর
তৃপ্ত চোখে আজি এরে দেখায় সুন্দর,
সেই কথা মনে কোরো অবসরক্ষণে
সুখস্বর্গ-ধামে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিজনোচিত বেদনাবোধে এক রমণীর পরম ঈপ্সিত সৌজন্যবোধ যেভাবে দেখিয়েছেন— আজি এরে দেখায় সুন্দর, এই পরিমিত সৌন্দর্য-চেতনা সাধারণ আমার মতো পুরুষের কাছেই আশা করা যায় না। যার জন্য বৃহস্পতি-সূত কচকে বলতে হয়েছে—

আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয়
সখী। বহে যাহা মর্মমাঝে রক্তময়
বাহিরে তা কেমনে দেখাব।

সাধারণ্যে যেটা 'মর্মমাঝে রক্তময়' সেটা সে প্রকাশ করে ফেলে, কেননা তার রাবীন্দ্রিক সৌজন্যবোধ এবং সৌন্দর্য-তাত্ত্বিক দায় নেই। সবচেয়ে বড়ো কথা সেই বিদ্যা, সেই রমণীর হৃদয়-বোধ অথবা সেই পরিশীলন-বোধই কি জনে জনে থাকা সম্ভব, যাতে সমস্ত উচ্ছ্বাস, যা প্রাথমিকভাবে শারীরিক মাত্রা নেয়। এমনকি বেশ শরীর-শরীর শব্দেই রবীন্দ্রনাথ থেকে আমরা শত উদাহরণ দিতে পারি, যেখানে অদ্ভুত সেই রাবীন্দ্রিক সৌজন্যের মধ্যেও রমণীশরীরের প্রত্যঙ্গ-প্রশংসা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর আছেন যেমন মহান কবিরাও, যাঁরা সাধারণ্যের মাত্রা ব্যবহার করেও, যদিও সেটা কোনওভাবেই ফুটপাতের আমিষগন্ধী শব্দরাশির কাছাকাছি যাবে না, কিন্তু খুব হালকা চালে, অতি-সুকৌশলে এও কি একটা প্রশংসার ভঙ্গি নয়— দুধ চিনি ননী আর/ ভালো যাহা দুনিয়ার/ তাই দিয়ে মেয়েগুলি তৈরি।

আমরা প্রসঙ্গ থেকে সরে এসেছি, ভাবছেন তো? আসিনি। আমরা বলতে চেয়েছি—রমণীরা সাধারণত নিরালম্ব নন। সেই যৌবন-বয়সে পুরুষের স্বচ্ছাস্বচ্ছ দৃষ্টিপাত এবং স্পষ্টাস্পষ্ট প্রশংসা-শব্দে যাদের আত্মভোগ্যতা এবং আত্মারামতা তৈরি হয়, সেখানে 'মাই বডি মাই চয়েস' বলে আপনাতে আপনি অবরুদ্ধ হয়ে থাকলে কবিত্বের অহংকারটুকুই নষ্ট হয়ে যাবে, যে ভদ্রলোক নিজের দায়িত্বে লিখেছিলেন— 'শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী/ পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি/ আপন অন্তর হতে—' সেই কবির অহংকারটুকু নষ্ট করে দিলে আজকের দিনের পুরুষদ্বেষী রমণীকুলের বহুতরার মতো অনন্ত নারী-বিদ্বেষী পুরুষও তৈরি হবে।

এখন আমার আত্ম-পরিজনের মধ্যে, আমার বর্ষে-বর্ষে আসা ছাত্রীদের মধ্যে বিবাহের প্রসঙ্গ এলেই বহুল সন্দেহ তৈরি হতে দেখেছি, বৈবাহিক জীবনে দেখছি চরম অসহনীয়তা, ৪৯৮ ধারা প্রযুক্ত হচ্ছে মুড়ি-মুড়কির মতো— অথচ পারস্পরিক নির্ভরতার মধ্যে যে নান্দনিক সংবাদ আছে, সেটা এখন সবচেয়ে বেশি অপব্যাখ্যাত এক তত্ত্ব, যা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা আপন তর্কশান্তির জন্য করে থাকেন। এই বুদ্ধিজীবীরা যেমন হৃদয় নামক বস্তুটি এতটুকুও বোঝেন না। তেমনই আছেন কতগুলি মনস্তত্ত্ববিদ, যাঁরা বাঁধা গতে 'ইনসিকিওরিটি' দিয়ে কথা আরম্ভ করেন এবং সরল জিনিসকে জটিল করে তোলার তত্ত্ব বোঝেন স্বাধীত মুখস্থ বিদ্যায়, কিন্তু মন বোঝেন সব চাইতে কম।

আসলে নির্ভরতার মধ্যে নন্দনের সংবাদ আছে, সেটা বোঝার জন্য অনেক বেশি আত্মশক্তির প্রয়োজন আছে, প্রয়োজন আছে আত্মত্যাগের, প্রয়োজন আছে আপন অহংবোধের ঊর্ধ্বে ওঠার। আসলে যে অহংবোধে পুরুষ নারীদের ওপর নির্যাতন চালায়, সেই অহংবোধেই কিন্তু রমণীরাও পুরুষ-বিদ্বেষী হয়ে উঠছেন। অথচ বিফল হয়ে গেল বৈদিক কালের কত আধুনিক সেই মন্ত্র সংজাম্পত্যং সুষমম্ আকৃণুষ্ব। এখানে 'জাম্পত্য' মানে দাম্পত্য, সেই দাম্পত্য যেন গভীর পারস্পরিকতা এবং পরস্পর-নির্ভরতায় গড়ে ওঠে। সবচেয়ে বড়ো কথাটা এখানে 'সুষমম্'— স্বামী-স্ত্রী দুই পক্ষেই সমান এক আপেক্ষিক নির্ভরতা— দুই পক্ষকেই সেখানে খানিক অহংবোধ জলাঞ্জলি দিতে হয়। নান্দনিকতা আছে সেইখানেই — যেখানে আপন স্বতন্ত্রতার মধ্যেও অপরের জন্য অপেক্ষা এবং অনুসন্ধান থাকে— আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না /এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্যারিসে মিলান কুন্দেরার খোঁজে

—বিক্রি করে দাও। এই বোঝা কেন বয়ে বেড়াবে? বিক্রি করে দাও। বিক্রি করে দাও। ভালো দাম পাবে।

—ওটা আমি বেচতে পারব না। কী করে বেচব বলুন? ওটা বেচে দেওয়া যায়? ওটাই তো আমার সর্বস্ব।

—তোমার অতীত তোমার সর্বস্ব! কী যে বল! অতীতকে ঘাড় থেকে নামাও। তাছাড়া, আমরা তো বিনামূল্যে তোমার অতীত কিনছি না। ভালো দাম দিচ্ছি।

—আমার অতীত দাম দিয়ে কিনবেন?

—অবশ্যই। আমরা, কমিউনিস্টরা, তোমার অতীতের মূল্য দেব তোমার ভবিষ্যৎ দিয়ে। অর্থাৎ আমাদের সরকার তোমার অতীত কিনে নেবে তোমাকে অনেক দামি এক ভবিষ্যৎ দিয়ে। তোমার কোনও ভাবনাচিন্তা থাকবে না। তুমি কাজ করবে। আর দিব্যি থাকবে। কোনও সমস্যা নেই।

চেকোস্লোভাকিয়ায় সবে তৈরি কমিউনিস্ট শাসনের এই প্রস্তাবে রাজি হলেন না মিলান কুন্দেরা। তিনি এক তরুণ লেখক। চেক্ ভাষায় বেরিয়েছে তাঁর প্রথম উপন্যাস, 'দ্য জোক'। ১৯৬৭ সাল। প্রথম উপন্যাসে তিনি তীব্র শ্লেষে আক্রমণ করেছেন চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট অপশাসনকে। যে অপশাসন কেড়ে নিচ্ছে মানুষের মনের কথা, মানুষের স্বাধীন যাপনের অধিকার।

অতীতকে বিক্রি করে ভবিষ্যৎ কেনা? এ আবার কেমন প্রস্তাব? সত্যিই কি কেউ সম্পূর্ণ ঝাড়া হাত-পা হয়ে অতীত বিক্রি করতে পারে? কমিউনিস্টরা তাই চাইছে। বিক্রি কর স্মৃতি। বিক্রি কর হতাশা। বিক্রি কর দহন, দুঃখ, বিচ্ছেদ, বিরহ। এবং বিক্রি কর প্রেম। আর প্রেমের চিঠি? তা-ও কেড়ে নিয়েছে মিলান কুন্দেরার কাছ থেকে কমিউনিস্টরা। কারণ ওই সব চিঠিতে নাকি আছে ব্যক্তিস্বাধীনতার রোমান্টিক স্বপ্ন! এ তো দুঃস্বপ্ন, দেশদ্রোহিতা! চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাগ্ মিলান কুন্দেরার শহর। এখানেই তো তার শিকড়, মাটি, ভালোবাসা, বেদনা-আনন্দ। কিন্তু এখানে আর ভাবনার স্বাধীনতা নেই। ভাবনার স্বাধীনতা ছাড়া লিখব কী করে? কী করে গড়ে উঠবে স্বাধীন জীবন? আর প্রতিটি স্বাধীন জীবনের স্বাধীন ভাবনা, মুক্ত দর্শন? পালাতে হবে এই অচলায়তন থেকে। কিন্তু ভেরা? ভালোবাসার মেয়ে ভেরা, সে কি পালাতে রাজি হবে? রাজি হবে সঙ্গিনী হতে পরবাসে? তুমি চলে যাবে প্যারিসে আর আমি থাকব প্রাগ্-এ! তা কি হয়? বললেন ভেরা! মিলান কুন্দেরা আর ভেরা দু'জনেই চলে এলেন প্যারিসে। ততদিনে 'জোক' উপন্যাসটির খ্যাতি ক্রমশ হয়ে উঠছে আন্তর্জাতিক। ফ্রান্সের সরকার স্বাগত জানাল কুন্দেরা-দম্পতিকে।

ফ্রান্সের নাগরিক হলেন মিলান কুন্দেরা আর ভেরা। এবং কী অসীম অভিমানে দু'জনেই ত্যাগ করলেন মাতৃভাষা 'চেক্'! ফ্রেঞ্চ হয়ে উঠল তাঁদের ভাষা! পরবাসে পরভাষায় লেখক হয়ে ওঠার অসীম পাথার একদিন পার হলেন মিলান কুন্দেরা। একে একে লিখলেন তাঁর আন্তর্জাতিক বেস্টসেলার উপন্যাসগুচ্ছ: 'লাইফ ইজ্ এলস্হোয়্যার', 'দ্য ফেয়ারওয়েল পার্টি', 'দ্য বুক অফ লাফটার অ্যান্ড ফরগেটিং', 'দ্য আনবেয়ারেবল্ লাইটনেস অফ বিয়িং', 'ইমমর্ট্যালিটি', 'স্লোনেস', 'আইডেনটিটি', 'ইগনরেন্স', 'দ্য ফেষ্টিভ্যাল অফ ইনসিগনিফিকেন্স'। পৌঁছলেন খ্যাতির শিখরে। আমরা প্রতি বছর ভেবেছি, এ-বছর নিশ্চয়ই পাবেন নোবেল প্রাইজ। কিন্তু পেলেন না। ক্রমশ একা থেকে আরও একা হলেন। নিজেই বেছে নিলেন একাকিত্ব, নিরালা ও নির্বাসন। এবং একদিন খবর এল প্যারিসে ২০২৩-এর ১১ জুলাই তিনি মারা গেছেন, ৯৪ বছর বয়সে। স্ত্রী ভেরা বেঁচে আছেন।

এখানে ভেরার গল্প একটু না বলে পারছি না। ভেরা শুধু আজীবন মিলানের সঙ্গে থাকলেনই না, তাঁর জন্য আকাশের কাছাকাছি একটি বিশাল ছাদ কিনে তৈরি করলেন মিলানের ভাবনার ও ভালোবাসার বাসা! যাওয়া যায় না সেখানে? কেউ কি জানেন সেই বাড়ির ঠিকানা? মিলান কুন্দেরা যে নিজেই বারবার বলেছেন, তাঁর কোনও ঠিকানা নেই। বলেছেন, তাঁর ভাবনাই তো তাঁর বাড়ি। আর সেই বাড়ির ঠিকানা তিনি নিজেও জানেন না। জানেন না তাঁর ভাবনার বাড়ির কখন কোন রূপ!

মিলান কুন্দেরার আমি অন্ধ ভক্ত। তাঁর নামে ছাপার অক্ষরে যা কিছু বেরিয়েছে ইংরেজি অনুবাদে, সব কি পড়িনি আমি? না-পড়ে থাকতে পারিনি বলেই তো পড়েছি। তবু মনে হয়েছে, মিলান কুন্দেরার অনেক লেখা, অনেক চিঠিপত্র, অনেক প্রকাশ ও সব মনকেমন হারিয়েও গেছে! এমন শিকড়ছেঁড়া, ঠিকানাবিহীন, বিদগ্ধ বেদনাময় লেখক আর কি কেউ আছেন?

তাঁর সন্ধানে প্যারিস গেলে হয় না? ‘প্রতিদিন’–কে জানালাম এই আকুতি। এবং ২৭ আগস্ট উড়লাম প্যারিসের পানে।

বহু কষ্টে মিলান কুন্দেরার ঠিকানা শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল প্যারিসেই। আমার মতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বই বিপনি ‘শেক্সপিয়র অ্যান্ড কম্পানি’–তে। ১৯১৯–এ যে বইয়ের দোকানের জন্ম। আর যার নিয়মিত সংযোগে ছিলেন আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, জেমস জয়েস (এই বই বিপনিই জয়েস–এর ‘ইউলিসিস’ প্রকাশ করে বিশ্বজুড়ে তুমুল কাণ্ড ঘটায়), টি এস এলিয়ট, এজরা পাউন্ড, জাঁ পল সার্ত্রে, সিমন দ্য বভোয়া, আলব্যের কামু, ফিৎজেরাল্ড এবং ভিয়েনা থেকে সিগমন্ড ফ্রয়েড!

সত্যিই যখন জানলাম মিলান কুন্দেরার ঠিকানা ১০ লিতর্ স্ট্রিট এবং সেই ছাদ বাড়িতে এখনও আছেন ভেরা— কিন্তু কারও সঙ্গে দেখা করেন না। মনে হল সেই মন্দিরের দরজায় একবার অন্তত মাথা ঠেকিয়ে আসি।

গেলাম। দাঁড়ালাম ১০ লিতর্ স্ট্রিটের সিংহদুয়ারে। যেখান থেকে কোনও ডাকের ভিতরে পৌঁছনোর উপায় নেই।

বিস্মিত হয়ে দেখলাম, লিতর্ স্ট্রিট যত বড়, এই বাড়ির ছ’তলার ছাদও ঠিক ততই দীর্ঘ। যেন শেষহীন ছাদ। সেখানেই মিলান কুন্দেরার স্বপ্নের বাসা বানিয়ে ভেরা বলেছিলেন, তুমি তো আকাশের বিস্তার ও স্বাধীনতা চেয়েছিলে মিলান। তাই এ–বাড়ি তোমার জন্য আমার সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে তৈরি করেছি। এই বাড়িতেই দু’জনে একসঙ্গে থাকব, চিরকাল...। ■

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

শেষ কথা ২৩শে এপ্রিল...

ত্রিদিব, আমার এনএবিসি যাওয়া হবে না।

আহা, আপনি এখনই নেগেটিভ ভাবছেন কেন দাদা? যথেষ্ট সময় আছে। ডক্টর তো আপনাকে ফোনে বললেন, চলে যাইয়ে।

আমি তো আমার শরীরটা বুঝি। গৌতম আমার খুব প্রিয় ছেলে, বিজনেস ক্লাস টিকিট পাঠাচ্ছে, সব ঠিক। কিন্তু অতটা পথ, প্রায় ১৮ ঘন্টার ফ্লাইট, নাহ্, পারব না। তুমি বরং আমার বাংলাদেশের ভিসাটা করিয়ে দাও। আধঘন্টার ফ্লাইট, 'বাংলাদেশ প্রতিদিন' থেকে বারবার বলছে, শুনলাম তোমরাও যাচ্ছো, তোমাদের সঙ্গে যাব।

সে করিয়ে দিচ্ছি দাদা। আমেরিকার ভিসাটাও হয়ে থাকুক না!

যা ভালো বোঝ, করো। শুধু শুধু ওদের একগাদা টাকা খরচ করাচ্ছো।

একবছরের বাংলাদেশ ভিসা হয়ে এল। খুব খুশি। আমার চাপাচাপিতে ইউএস ভিসার ফর্ম ভর্তি করতে এলেন আমার অফিসে। গত মাসের মাঝামাঝি। অনেকক্ষণ আড্ডা হল। কিন্তু সেদিনই মনে হচ্ছিল, ওঁর শরীরে অস্বাচ্ছন্দ্য আছে, হাঁটাচলা করতে কষ্ট হচ্ছে।

গত বছরদুয়েক ধরে প্রায় রোজ সকালেই ফোনে কথা হতো। উনি করেছেন, আমি করতে ভুলে গেছি, অমনি প্রবল অভিমান, তুমি তো এখন অনেক বড় ব্যাপার! আমাকেই তোমার খোঁজ নিতে হবে!

আবার এই ফোনালাপেই আমাদের মধ্যে চলত নানারকম খেলা! কখনও খাওয়া নিয়ে, কখনও লেখা নিয়ে, কখনও বাইরে যাওয়া নিয়ে, অসাধারণ সব 'গুল'। আমিও পালটা দিতাম, চলত সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। কখনও গুল ধরা পড়লে খেপেও যেতেন। এই যেমন গত ডিসেম্বরে আমেরিকা থেকে কবি গৌতম দত্ত এসেছে। দেখা করবে।

সমরেশদা, কাল বাড়ি আছেন তো? গৌতমকে নিয়ে যাচ্ছি। এনএবিসি নিয়ে আপনার একটা ভিডিও রেকর্ড করবে।

কাল এসো না, পরশু। আমি কল্যাণীতে একটা অনুষ্ঠানে যাচ্ছি কাল।

কল্যাণীতে অনুষ্ঠান! জানি না তো।

মানে! সব খবর তোমাকে জানাতে হবে নাকি? আমি কাল বাড়ি থাকছি না।

আমিও ছাড়ার বান্দা নই, সঙ্গে সঙ্গে দোয়েলকে ফোন। সে অবাক, কী বলছো কাকু? বাবা সবে অসুখ থেকে উঠল, এখন কোথায় যাবে? বাড়িতেই থাকবে।

ও দাদা, দোয়েল যে বলল, আপনি আছেন। গৌতম

অল্প কটাদিনের জন্যে এসেছে।

কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ। তারপর বোম ফাটল, মেয়েরা কি আমার ঘেঁটি ধরে বসে আছে, অ্যাঁ? তুমি ওদের দিয়ে ভেরিফাই করাও কেন? ভেরি ব্যাড। আমি বলেছি, কাল দেখা করব না, ব্যস। পরশু আসতে হবে।

কী আশ্চর্য! একদিন পরে যখন গেলাম, সে অন্য মানুষ। ছাড়তেই চান না। কত পুরোনো স্মৃতি। ২০০৯ সাল। তখন গৌতমের বিরাট জিপ ছিল। সেই গাড়ির মাথায় বইমেলার বই তুলে সঙ্গে আরেক গৌতমদাকে (ফিল্ম ডিরেক্টর) নিয়ে নিউইয়র্ক থেকে নিউ জার্সি যাত্রা... সুনীলদা, স্বাতী বউদিকে নিয়ে গভীর রাত অব্দি আড্ডা... পুরোনো কথা আর ফুরোচ্ছে না। সমরেশদা বলছেন, তোমার মনে আছে ত্রিদিব, গৌতমের বাড়ির সামনের বনে হরিণের দল...ওদের চোখগুলো সোনার ফুলের মতো জ্বলছিল। তারপর মুষলধারে বৃষ্টি নামল।

সমরেশদা, নিউ জার্সির সেই রাতের কান্ডটা ভুলে গেলেন? গৌতম বলল, আপনাদের থাকার জন্যে ওরা মোটেল ভাড়া করেছিল। ডিনারের পরে আপনাদের নিয়ে মোটেলে এলাম। তখন রাত প্রায় ১২ টা, উইকএন্ড। চাবি নিলাম রিসেপশন থেকে। তারপর যেই আপনি একটা ঘরে চাবি দিয়ে তালা খুলেছেন, অমনি ভিতর থেকে —

হ্যাঁ, ওরে ব্বাপস! সাত ফুটিয়া একটা ব্ল্যাক বেরিয়ে এল। পরনে শর্ট প্যান্ট, পিছনে ওর বান্ধবী। এই মারে তো সেই মারে! তুমি শেষে ওকে বুঝিয়ে...। নইলে কপালে দুঃখ ছিল!

দোষটা পুরো ম্যানেজারের দাদা। মেলা কমিটি রুম বুক করে রেখেছিল। আসছি না দেখে ব্যাটা অন্য ফ্লাইং কাস্টমারদের দিয়ে দিয়েছে। ভেবেছে আমরা আসব না।

দশ মিনিটের জন্যে দেখা করবেন বলেছিলেন, কিন্তু আর ছাড়তেই চান না। শেষমেশ একরকম জোর করে আমরা যখন বেরিয়ে এলাম, রাত ১১ টা।

অথচ এই সমরেশ মজুমদারই আমায় দিনের পর দিন ঘুরিয়েছেন। অনীশদাকে (দেব) খুব ভালোবাসতেন। তাঁর সঙ্গে গেছি। তখনও বলেছেন, 'দ্যাখো, আমি ত্রিদিবকে নতুন বই দিতে পারব না। পুরোনো বই দেব। ও বেচতে পারবে না। তখন ও আমায় দেখে পালিয়ে বেড়াবে। মাঝখান থেকে সুন্দর সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যাবে। এইটা আমি চাই না।' অনীশদা জোর দিয়ে বলেছেন, আপনি দিয়েই দেখুন না!

কী ম্যাজিক ঘটল, জানি না। এই মানুষটাই আবার এর বছর তিনেকের মধ্যে সুনীলদা, শীর্ষেন্দুদা, সুচিত্রাদিকে ফোন করে বলেছেন, আমাদের প্রকাশনাকে বই দিতে। গভীর ভালোবাসা, অপার স্নেহ। বাইরেটা শক্ত নারকেলের মতো, ভিতরে কুলকুল করে বইছে মধুর রস। সুনীলদার মতো সকলের সঙ্গে মিশতে পারতেন না, কিন্তু ওঁর ভালোবাসার ছোট বৃত্তে যারা একবার স্থান পেয়েছে, তারা সেই চুম্বক আকর্ষণ থেকে বেরোতে পারেনি।

আমি যে বই সমরেশ মজুমদারের কাছে চেয়েছি, পেয়েছি। ধারাবাহিক সিরিজ লিখছেন, 'কলিকাতায় নবকুমার', 'দাউ দাউ আগুন', বা 'স্বপ্নেই এমন হয়', 'সোনার শিকল'...। এমনকী বৃহৎ প্রকাশকের কাছ থেকে তুলে দিয়ে দিলেন 'গল্পসমগ্র' সিরিজ। কোভিডের সময় সরাসরি পাণ্ডুলিপি থেকে লিখে দিলেন দু-দুটো বই। কেন যে এত বিশ্বাস করতেন, কে জানে! শুধু আমাকে কেন, চুমকি, আমাদের দুই মেয়ে... সবাইকেই। কিন্তু বাইরে খোঁচাতে ছাড়তেন না, যত বই-ই তোমায় দিই, রয়্যালটি তোমার ফিক্সড, সে বাড়বে না!

সমরেশদার হাত ধরেই প্রথম আমার আমেরিকা, কানাডা যাওয়া। 'চলো দেখবে, ওদেশে কত বাঙালি বাংলা বইয়ের জন্য মুখিয়ে আছে।' 'কিন্তু দাদা, ফ্লাইটের ভাড়া? কোত্থেকে পাব? ' 'আরে দাঁড়াও, সে ব্যবস্থা করছি।' করলেনও। তারপর গিয়ে উঠলাম, দাদার রক্তের সম্পর্কহীন বাংলাদেশী কন্যা শ্যামার বাড়ি। দু-দুবার। তার ওখানে একসাথে দিনের পর দিন, রান্নাবান্না করে খাওয়া, উফ্! এখন মনে হয় সব স্বপ্ন। সেখানেও

কত ঘটনা, কাহিনি।

কোথায় না কোথায় গেছি দাদার সঙ্গে। ঢাকা, পুরুলিয়ার ভালোপাহাড় থেকে ডুয়ার্সের চা বাগান। শিলচর থেকে শিলিগুড়ি, গৌহাটি, দিল্লি,ব্যাঙ্গালোর, লখনউ। আরেকটা বিচিত্র ব্যাপার, ধীরা বউদি আর দুই মেয়ে দোয়েল, পরমা, তারাও আমায় ভারি ভরসা করতেন। বউদি একবার ফোন করে বললেন, আপনার দাদা কী পড়েন জানি না, আমায় কিন্তু কিশোর ভারতী প্রতিমাসে পাঠাবেন।

সিওপিডি। এই রোগটা অনেক দিন ধরেই দাদাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। যে মানুষটা চেন স্মোকার ছিলেন, রোজ সন্ধেয় যাঁর পানীয় লাগত, সব ছেড়ে দিয়েছিলেন বেশ কয়েক বছর। কিন্তু বছর দুয়েক আগে সম্পূর্ণ সুস্থ ধীরা বউদির আকস্মিক চলে যাওয়া মেনে নিতে পারছিলেন না। একটু একটু করে মানসিক অবসাদে ডুবে যাচ্ছিলেন। প্রায়ই ফোনে বলতেন, ভদ্রমহিলা আমায় ডুবিয়ে দিয়ে গেছেন। আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না।

বেশ কয়েকবার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন দাদা। কিন্তু অসম্ভব মনের জোর। ফিরে এসেছেন, আবার লিখতে শুরু করেছেন। একবার তো বাংলা অক্ষরই ভুলে গেছিলেন! নতুন করে অ আ ক খ প্র্যাকটিস করে লেখায় ফিরলেন। ভাবা যায়!

আমার সঙ্গে শেষ কথা হয় ২৩ এপ্রিল, রবিবার। ২৪ শে এপ্রিল ফোন করতে ভুলে গেছি। ২৫শে এপ্রিল। ব্রেকফাস্ট টেবিলে চুমকি বলল, কী গো, কাল তো সমরেশদাকে কল করোনি। আজ একবার করো। বলতে বলতে ফোন বেজে উঠল, দোয়েল। ‘কাকু, বাবার মনে হয় ফের কিছু হয়েছে। কীরকম করছেন। আমি অ্যাপোলোতে নিয়ে যাচ্ছি।’

ব্যস, তারপর...তার আর পর নেই, নেই কোনও ঠিকানা!

বোঝাতেও পারব না, আমার মনের মধ্যে এখনও কী চলেছে। সব ‘বিগ জিরো।’ ■

সত্যম রায়চৌধুরী

উপেক্ষিতার ডায়েরি

১৭৯৯ সালের ২০ ডিসেম্বর। ঠান্ডায় কাঁপছে ইউরোপ। সেইসময় লন্ডনের কাছে গ্রাসমেয়ারে একটি অপরূপ ছবির মতো জায়গায় উঠে এলেন কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ আর তাঁর প্রিয়তম বোন ডরোথি। গ্রাসমেয়ারে এক বাড়িতে উঠে এলেন তাঁরা, বাড়িটি একটি বহু বছরের পরিত্যক্ত সরাইখানা। হাতে তাঁদের অফুরন্ত টাকা নেই। ঠান্ডা থেকে বাঁচতে শোবার ঘরের দেওয়ালে খবরের কাগজ সেঁটে ঘরগুলিকে গরম করতে লাগলেন ডরোথি। সাজাতে শুরু করলেন বাড়িটিকে। তাঁদের নিজেদের একটা ভুবন হয়ে উঠল এই ছোটো কটেজটি।

বাড়ির সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেই প্রথমেই বাড়ির রান্নাঘর। রান্নাঘরটি ডরোথির প্রাণ। এখানে ডরোথি কাটাতেন দিনের বেশিরভাগ সময়। এই প্রশস্ত কক্ষেই বসত পারিবারিক গল্প, আড্ডা আর পানের আসর। এই তথাকথিত রান্নাঘরটিকে মোটেই কিচেন বলতেন না উইলিয়াম ওয়র্ডসওয়ার্থ বা ডরোথি। তাঁরা তাঁদের প্রিয় ঘরটির নাম রেখেছিলেন 'হাউসপ্লেস'। বাড়ির ব্যস্ততম ঘর এই হাউসপ্লেস, এখানে ওয়ার্ডসওয়ার্থ পরিবার মিলিত হন খাওয়াদাওয়ার জন্যে। আবার এই হাউসপ্লেসের মধ্যেই আগুন জ্বালিয়ে চলে রান্না, আবার বৃষ্টিমুখর দিনে এটি হয়ে যায় পাড়ার বাচ্চাদের খেলার ঘর। এই বাড়িতে আগে ছিল 'ডাভ অ্যান্ড অলিভ' নামে একটি সরাইখানা। তখন এই রান্নাঘরটি ছিল পাব। ওয়ার্ডসওয়ার্থ পরিবারও মদ্যপান করতেন এই ঘরেই। কালচে ওক কাঠের আসবে ভর্তি ঘরটিতে একটি জানলা দিয়ে দেখা যায় পাশের গোলাপ বাগান। গোটা বাড়িটাই ছেয়ে থাকে ফুলে আর বাহারি লতায়।

১৮৪৩ সালে রানি ভিক্টোরিয়া রাজকবি ঘোষণা করেন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থকে। সেই ঘোষণাপত্রটি খুব যত্ন করে রান্নাঘরে বাঁধিয়ে রাখলেন বোন ডরোথি, সেই রাজভূষণের পাশেই রাখলেন তাঁদের প্রাণাধিক প্রিয় নেড়ি কুকুর গোলমরিচের ছবি। এই গোলমরিচ হঠাৎ করেই এসেছিল তাঁদের জীবনে। তাঁদের বাড়িতে একবার বেড়াতে এলেন কবি ওয়াল্টার স্কট। স্যর স্কটের পোষ্য ছিল গোটা কুড়ি নেড়ি কুকুর। তিনি যেখানে যেতেন সেই কুকুরদেরও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। পাছে তাঁর অনুপস্থিতিতে কোনও কুকুর হারিয়ে যায় বা মারা যায়। ওয়ার্ডসওয়ার্থের বাড়িতেও দু-ডজন পোষা 'স্ট্রিট ডগ' নিয়ে আতিথ্য নিলেন স্কট। যাবার সময় দেখলেন, ডরোথি ওয়ার্ডসওয়ার্থ খেতে না দিলে তাঁর গোলমরিচ খাবার খাচ্ছে না। এটা দেখে তিনি গোলমরিচকে রেখে গেলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ পরিবারে। সেই থেকে ওয়ার্ডসওয়ার্থের

বাড়ির প্রাণ হয়ে উঠল পিপার বা গোলমরিচ। বড়ো দুঃখের জীবন ডরোথির। নিজের বলতে কোনও কিছুই ছিল না তাঁর। মাকে হারালেন মাত্র ছ-বছর বয়সে। তার কিছুদিন পর বারো বছরে হারালেন নিজের বাবাকে। ভাইদের থেকে আলাদা হয়ে আশ্রয় মিলল ইয়র্কশিয়ারে আত্মীয়র বাড়িতে। তাঁদের বাড়িতে বাড়তি বোঝার মতো কেটে গেল কৈশোর। উইলিয়াম ডাভ হাউসটি কিনে নেবার পর ডরোথি প্রথম একটা নিজের বাড়ি পেলেন। মনের মতো করে সাজালেন ডাভ হাউসটিকে। বাড়িটির পেছনের দরজা খুললেই একটা সবুজ ঘাসের গালিচা আর বাগান। শিশিরস্নাত ফুল, লতাপাতা দিয়ে তৈরি এক মায়া উদ্যান যেন এটা। বাগানের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ছোটো একটি ঝরনা। নুড়ি-পাথর বিছিয়ে আছে ঝরনার সামনে। ঝরনার পাশে ওক, পাইন ফার গাছের জঙ্গল। কত পাখির বাসা সেখানে। উইলিয়াম তাকিয়ে থাকেন জানলা দিয়ে। প্রকৃতিকে দ্যাখেন দূর থেকে। সদ্য ফরাসি বিপ্লব দেখেছেন তিনি। সেই বিপ্লবের আঁচ তাঁর জীবন আর লেখাতেও পড়েছে। প্রকৃতিকেও তিনি দূর থেকে দ্যাখেন। তাকে অধিকার করতে যান না নৈর্ব্যক্তিক সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে থাকেন ফুল, লতাপাতার দিকে, ঝরনার দিকে। এমনকি তাঁর প্রেমেও অধিকারবোধ নেই। তিনি এক অপার্থিব নারীকে চাঁদের আলোয় কেমন দ্যাখায় সেই কথা লেখেন। কত সুন্দর সেই নারী সেকথা লেখেন কিন্তু তাঁর নিজস্ব পাওয়া না-পাওয়ার আর্তি ধরা পড়ে না তাঁর লেখায়। কোনও কিছুকে অধিকার করতে চান না উইলিয়াম। কোলরিজের সঙ্গে যুগলবন্দি হয়ে তিনি লিরিক্যাল ব্যালডস লিখছেন আর ডরোথি তাঁর ডায়েরিতে লিখে রাখছেন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ আর কোলরিজের বন্ধুত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ রসায়ন।

গ্রাসমেয়ার এক পাহাড়ি জায়গা। ঝরনা, হ্রদ, পাহাড়, গাছপালায় ঘেরা। অপরূপ সৌন্দর্য গ্রাসমেয়ারের। সেই গ্রাসমেয়ারকে প্রতিদিন আবিষ্কার করছেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ডরোথি তাঁর 'গ্রাসমেয়ার জার্নালস'। ডরোথি পশুপাখিদের খেতে দেন, গাছেদের যত্ন করেন, পাড়ার বাচ্চাদের সঙ্গে নাচগান করেন রান্নাঘরে রান্না করগে করতে। ডরোথি তাঁর দাদা উইলিয়ামকে লেখায় সাহায্য করেন নিঃস্তব্ধে। যেন রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর নতুন বৌঠান কাদম্বরী থাকছেন একটি বাড়িতে। ডরোথির নিঃশব্দ শুশ্রূষা যেন পাথরেও প্রাণ আনে।

তাঁদের কটেজের পেছনই বাগান, বাগানের পেছনে ঝরনা আর হ্রদ। হ্রদের ধারে তাঁদের নিজস্ব নৌকোটি বাঁধা। ডরোথির ঘরে বাসা বাঁধে একটি সোয়ালো পাখি। ডরোথি জানলা খোলেন না পাছে পাখিটির সংসার ভেঙে যায়। কিন্তু একদিন রান্না করে ফিরে এসে দ্যাখেন পাখিটির বাসা ভেঙে ঘরে ছড়িয়ে আছে। হয়তো এটা তাঁর আদরের গোল-মরিচেরই কাজ! বাড়িতে তো তখন আর কেউ ছিল না!

এই ছোট্ট একটা পাখির বাসা ভাঙার ঘটনায় গভীর অবসাদে ডুবে যান ডরোথি। তিনি লেখেন, অসহায় পক্ষীমাতার কান্না তিনি শুনেছেন। ওই মা-পাখির মতোই কষ্ট পেয়েছেন ডরোথি। দু-দিন পর সকালে তিনি দ্যাখেন তাঁর ঘরেই আবার বাসা বানাচ্ছে ওই মা-পাখি। সে যেন বুঝতে পারছে ডরোথি তার আপনারজন। ডরোথি চিঠি লেখেন উইলিয়ামকে, ডায়েরি লেখেন, কবিতা লেখেন কিন্তু কিছুতেই ছাপতে চান না তাঁর লেখা। লিখে বাক্সবন্দি করে রেখে দেন। সকালে তিনি ব্রেকফার্স্টে পরিজ বানান। উইলিয়াম ভালোবাসে বসে। দুপুরে, রাতে রোস্ট করেন। তাঁর আধপাগল পরিচারিকা বালতি করে জল আনে ঝরনা থেকে, জামাকাপড় কাচে সে সারাদিন ঠুকঠুক করে। কোলরিজ আসেন, স্কট আসেন, রান্নাঘরে সুরাপাত্রে টুংটাং শব্দ হয়। রাতভোর করা সেইসব আড্ডার সব উপাদান জুগিয়ে যান ডরোথি। এ-বাড়িতে আসবার আগে ডরসেটে, সামারসেটে উইলিয়ামের সঙ্গে থেকেছেন ডরোথি। তখন উইলিয়ামের হাতে পয়সা নেই। ডরোথি পাড়া-পড়শির কাছ থেকে একরকম ভিক্ষে করে আনতেন দাদার

জন্যে গরম জামা। দিনরাত এক করে খেটে বানিয়ে রাখতেন রুটি আর মাছের রোস্ট। তারপর অনেকটা প্রতিষ্ঠা পেলেন উইলিয়াম। উঠে এলেন ডাভ কটেজে। ডরোথির আর আগের মতো টাকার কষ্ট নেই। কিন্তু একটা মরা মথ দেখলেও যে কষ্ট পান ডরোথি। ডরোথির শোবার ঘরটি আগে ছিল পাবের পানশালা। সেই ঘরটিতেই থাকতেন ডরোথি। পড়তেন, লিখতেন। তাঁর নিজস্ব জগৎ ছিল তাঁর ঘর আর রান্নাঘরটি। এইভাবে তিনবছর কাটল, তারপর একদিন উইলিয়াম বিয়ে করে আনলেন মেরিকে। মেরি হাটচিনসন উইলিয়ামের প্রেয়সী, স্ত্রী, সঙ্গী। ডরোথি নিজের ঘরটি ছেড়ে দিলেন দাদা-বৌদিকে। চলে গেলেন বাড়ির সবচেয়ে ছোটো ঘরে। বিয়ে করেননি ডরোথি। তিনি আরও চুপচাপ হয়ে গেলেন। বাড়ির ভার তুলে দিলেন নতুন গৃহিণীর হাতে। নিজের বলে যে কখনও কিছুই থাকেনি ডরোথির। ধীরে ধীরে ডরোথিকে চেপে ধরল অসুখ। জীবনের শেষ কুড়িটি বছর কোনও জাগতিক বোধ ছিল না ডরোথির। কিছু মনে করতে পারতেন না। কুয়াশাচ্ছন্ন এক মানসিক অবস্থায় তিনি রয়ে গেলেন তাঁর হাতে তৈরি বাড়ির এক কোণে। তাঁর নাম হোলোনা। তাঁর লেখা লুকিয়ে রইল বহুদিন। তাঁর নিজের ঘরবাড়ি, প্রেম কিছুই রইল না। শুধু বহুদিন পর আবিষ্কৃত তাঁর লেখার খাতায় রয়ে গেল ইংরেজি ভাষার রোম্যান্টিক যুগের গায়ে কাঁটা-দেওয়া ইতিহাস। তাঁর জীবন আর ডায়েরির পাতার রং বিবর্ণ হল কিন্তু তাঁর লেখা থেকে গেল চিরকালের মতো। ■

গৌতম ভট্টাচার্য

ওই তিন দিন জীবন ছোট ছিল, পুজো বড়

প্রৌঢ়ের গ্যাঁজলা নিষ্ক্রমণ—এভাবে দেখা হলেও আপত্তি নেই। কিন্তু তখন আর এখনকার শহরের পুজো ঘিরে মনোভাবের এমন তফাৎ দেখি যে এক-একসময় মনে হয় ছোটবেলায় পড়তাম না বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব আর বিশ্বযুদ্ধ উত্তর! যেন সেই জাতীয় তফাৎ।

তখনঃ আমাদের বাড়িতে ছোট করে হলেও দুর্গা পুজো করা হতো। পুজোর সকালগুলোর প্রথম অংশ কাটত, চারপাশ থেকে ফুল পেড়ে আনায়। বিশেষ করে পণ্ডিতিয়া রোডে রানি রাসমণি বাড়ির পেছনে শিউলি ফুটত।

এখনঃ আমার ধারণা সকালে উঠে ফুল পাড়ায় অন্তত শহরের ছোট ছেলেমেয়েদের বিশেষ আগ্রহ থাকে না। তারা চোখ খুলে বরং প্রথম মোবাইল দেখে। ইন্সটা-তে কে কী সাজের ছবি দিল? ফেসবুকে তার কাল রাতের পোস্টে কটা লাইক পড়েছে, সে সব গোনে। গ্রেগ চ্যাপেল অস্ট্রেলিয়ার যুব দলের দায়িত্বে ছিলেন মাত্র ক'বছর আগেও। ছেলেদের বোঝাতেন ঘুম থেকে উঠে সেই বিশেষ দিনটায় আগে চেক ইন করো। আজ কত তারিখ? কী বার? তারপর না হয় মোবাইলটা খুলো। আমার কন্যাকে এটা বোঝাবার চেষ্টা করায় সে পাল্টা বলল, 'গ্রেগ চ্যাপেলকে এসব পাগলামির জন্যই ইন্ডিয়ান টিম তাড়িয়ে দিয়েছে।'

তখনঃ অঞ্জলি না দিয়ে খাওয়ার কোনও ব্যাপার ছিল না। কিছু কিছু নাস্তিক নিশ্চয়ই ছিল যারা অঞ্জলি দিতে চাইত না। আগে খেয়ে নিত। কিন্তু তারা সংখ্যায় এতই কম ছিল যে, নির্দিষ্ট করা যেত। পুষ্পাঞ্জলি ঘিরে শুদ্ধতার মাত্রা অবশ্যই ছিল বেশি।

এখনঃ ঘোর আস্তিকদের মধ্যেও খেয়ে অঞ্জলি দেওয়ার প্রবণতা দেখছি। বড় বড় বারোয়ারি পুজোতে গেলে উদ্যোক্তাদের পরিবারে কমবয়েসীদের মধ্যে প্রভূত আকুলতা লক্ষ্য করি। বড় আবাসনে দেখতে পাই। কিন্তু সার্বিকভাবে যেন পুষ্পাঞ্জলি ঘিরে সমর্পণ কমে গিয়েছে।

তখনঃ খাওয়াদাওয়ার বৈচিত্রের দিকে লোকে ব্যাকুলভাবে ওই চারটে দিন তাকিয়ে থাকতো। আমাদের স্কুলের শেষদিক, কলেজের পা দেওয়ার মাঝামাঝি পুজোর একটা দিন ছিল। বছরে ওই একবার মাত্র বন্ধুরা মিলে পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরাঁ সফরের জন্য নির্দিষ্ট। সেই থ্রিল এত বেশি ছিল যার সমতুল্য এখনকার দিনে ব্যাঙ্কক বেড়াতে যাওয়া।

এখন : সারাবছর খাওয়াদাওয়া চলে। পুজোর সময় আরও বেশি লোকে বাইরে খায়। কিন্তু আলাদা করে পুজোর খাওয়ার রোমাঞ্চটা টিনএজ মনে অবশিষ্ট আছে কিনা নিশ্চিত নই। এখন তো সারাবছরই লোকে সুইগি,

জোম্যাটো থেকে অর্ডার করে। বড় বড় রেস্তোরাঁর খাবার অক্লেশে বাড়িতে এনে খাওয়ার অভ্যেসের মধ্যে থাকে। সেই চার্মটাই চলে গিয়েছে যে এক বছর পর ইটিং আউটের স্পেশাল দিনটা ফিরল।

তখনঃ যাবতীয় ভিড় কেন্দ্রীভূত থাকত প্যান্ডেল চত্বরে। এমনকি সারাবছর যারা খেলাধুলো বা নাটক-টাটকে ব্যস্ত থাকতো তারাও পুজোর চারটে দিন পাড়ায় আড্ডায় কাটাতো। অনেকে অন্য অঞ্চলের বাসিন্দা হয়েও ম্যাডক্স স্কোয়ারে চলে যেত স্পেশাল আড্ডার টানে।

এখনঃ আড্ডা এখনও দেদার হয়। ম্যাডক্সেও যায় কম বয়সীরা। কিন্তু এদের আড্ডাটা এখন আর কেবল পুজোর ভৌগোলিক জনপদ ঘিরে ঘটে না। শহরে এখন প্রবল ক্যাফে সংস্কৃতি। সেই মাধ্যাকর্ষণ প্যান্ডেলের সনাতন ভিড়কে সরিয়ে নিয়ে যায় নানান দিকে। এমন অনেক অঞ্চলে যেখানে কাফে ভরপুর, কিন্তু সেখানে পুজো প্যান্ডেলের আওয়াজ আসে না। সেটা পুজোর কলকাতা, টিম্বাকটু না বসনিয়া বোঝার কোনও উপায় নেই।

তখনঃ রাস্তায় রাস্তায় এত জ্যাম ছিল না। ভবানীপুর আর কলেজ স্কোয়ারের দিকটা সতর্ক থাকতে হতো। সঙ্ঘশ্রী থেকে মুক্তদল—গড়িয়াহাট অঞ্চলে একডালিয়া এভারগ্রিন সামলে দিতে পারলে মোটামুটি ভিড় ম্যানেজ হয়ে গেল।

এখনঃ পুজোর কলকাতা মানে চতুর্থী থেকে যানজটের দাপাদাপি শুরু। যেদিকে যাবেন ভিড় আর জ্যাম আপনাকে খপ্পরে নেওয়ার সযত্ন চেষ্টায় থাকবে। দক্ষিণে ভবানীপুরের মাধ্যাকর্ষণ অতীতের তুলনায় কমেছে তো কী? সুরুচি সঙ্ঘ বা চেতলা অগ্রণী দেখতে যা এনার্জি খরচ, পুরো ভিক্টোরিয়া হাঁটলেও সেই ক্যালোরি ঝরবে কিনা সন্দেহ। আর উল্টোডাঙা দিয়ে এয়ারপোর্ট যেতে হলে তো স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে দু'ঘন্টা আগে বেরোতে হবে। নইলে নির্ঘাত ফ্লাইট মিস। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বলছেন সুরুচির পুজোর জন্য ভিআইপি রোড বন্ধ করা যাবে না...। তো সাধারণ মানুষ কী বলবে?

তখনঃ পুজো প্যান্ডেলে ছবি তোলার এত প্রবণতা ছিল না। অনেক খুঁজেও পুরনো পুজোতে নিজেদের কোনও ছবি আবিষ্কার করতে পারছি না। ক্যামেরায় যাঁরা যত্ন নিয়ে ছবি তুলতেন—ধরে নেওয়া হতো হয় তাঁরা বিদেশ থেকে আগত অথবা পেশাদার ফটোগ্রাফার।

এখনঃ ছবি ব্যাপক ভাবে ওঠে। প্রতি বেলায় ওঠে। তার চেয়েও বেশি ওঠে সেলফি। আমার এক বন্ধুর কিশোরী কন্যা বাবাকে বলেছে, পুজোতে নতুন ফ্রক চাই না। সেলফি স্টিক দাও। পুজোয় যেমন ঠাকুরের ভোগ রান্না করতে হয়, তেমনি ছবিও সময় নিয়ে রান্না করতে হয়। তোলাটা প্রথম ধাপ। তারপর লাইট, শেড,অ্যাঙ্গেল সবের অ্যাডজাস্টমেন্ট।

তখনঃ প্রতিমা এবং মণ্ডপসজ্জা ছিল দুই চূড়ান্ত নির্ণায়ক। কখনও প্যান্ডেল আলোচনায় আসত। হিন্দুস্তান পার্কের সেই কাগজের ঠাকুর জাতীয় থিম হলে উত্তপ্ত তর্ক আহ্বান করত।

এখনঃ এর বাইরেও গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক থাকছে। প্রতিমা সুন্দর হয়েও যদি প্যান্ডেলের ভেতর ওয়াইফাই না পাওয়া যায়, তাহলে বিশাল খুঁত থেকে গেল। বিভিন্ন বিচারকদের যে টিমগুলো শ্রেষ্ঠদের মাপকাঠি খুঁজতে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘোরেন, তাদের বিচারে এখন ওয়াইফাই একটা শর্ত। যুগ এতটাই বদলেছে!

তখনঃ পুজো প্যান্ডেলে পুজোর গান বাজতো। লোকে তা নিয়ে আলোচনা করত। শিহরিত হতো। রোমাঞ্চিত ভাবনা শেয়ার করতো। কিশোর কুমার যে বছর গাইলেন 'আমার পূজার ফুল / ভালোবাসা হয়ে গেছে / তুমি যেন ভুল বুঝো না /মালা গেঁথে রেখেছি / পরাবো তোমায় /তুমি যেন ছিঁড়ে ফেল না...।' শুনতে শুনতে সেই সময়ের রোম্যান্টিক মন বলেছিল, এত বড় গায়ক তো আমাকে না চিনেও আমার জন্য প্লে ব্যাক করেছেন। মনে হয়েছিল বৃষ্টির জল এসে বুকের ভেতরটা আরও স্নিগ্ধ,আরও এলোঝোলো করে দিয়ে গেল।

এখনঃ পুজোর গান বলেই কিছু বেঁচে নেই। প্যান্ডেলে

বাংলার চেয়ে বেশি হিন্দি গান বাজে। আর পুজো বলে আলাদা কোনও গানবাজনাও নেই। চ্যানেলের অনুষ্ঠান বাদ দিন। বাকি সময় বাইরে বেরোলে যা শুনবেন তা হালফিল শহরের নতুন পার্বণ গনেশ চতুর্থীতে যা, পুজোতেও তাই।

তখনঃ পুজো এবং তার আশপাশ সময়— দেবীপক্ষ থেকেই জন্ম নিত প্রেমের কবিতা ও প্রেমপত্র। দু'পক্ষই জানত, পুজোর ভীড়ে মিশে যাওয়া, প্রেমিক-প্রেমিকা হিসেবে অন্তর্ধানের সেরা সুযোগ। বাকি বছর এত সুযোগ দেয় না।

এখনঃ প্রেমপত্র অবিকল ইনল্যান্ড লেটারের স্টেটাসে। প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে একমাত্র স্মৃতিতে বেঁচে আছে। আধুনিক সময়ে ফালতু কাগজ নষ্ট বা পেন নিয়ে লিখতে বসার দরকার নেই। হোয়াটস্ অ্যাপ আছে ! দেবদাসের জগতে নতুন প্রতিবেশী। কন্টেন্টের জন্যও কষ্ট করার দরকার নেই। এআই আছে। তারাই আপনার মনের ভাব লিখে দেবে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য পুজোর ওই তিনদিন আর আল্টিমেট নয়। মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করা থেকেই পুজো শুরু হয়ে যায় আর চলে অন্তত দশ দিন। দশদিনের প্রেম-ট্রাফিক হ্যান্ডেল করার জন্য এত রাশি রাশি ক্যাফে গজিয়েছে যে কবিতা বাড়তি কী সুবিধে করে দেবে? যা টেক্সটে হার্ট সাইনসহ লাভ ইউ দুটো মোক্ষম ইমোজি বা ছোট ভিডিও পারবে না?

উপসংহার— কী চাইছি ? দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর?

না, শুধু বলতে চাইছি মাত্র দশ-পনেরো বছরে সবকিছু যেন নিমেষে বদলে গিয়েছে। আগে পুজোটা ওই তিনদিন বড় ছিল। জীবন ছোট হয়ে পুজোকে অবচেতনে জায়গা দিত।

এখন পুজো নিশ্চয়ই পুজোর দিনগুলোয় বড়। কিন্তু জীবন অনেক বেশি বড়। পুজোর কোনওরকম তোয়াক্কা না করে, কোনওরকম উপাচারের মধ্যে না গিয়ে স্রেফ আমোদ উল্লাস করে একজন আস্তিক মানুষও এখন পুজো কাটিয়ে দেয়। রাস্তা আলো ঝলমলে আগের চেয়ে অনেক বেশি। থিম পুজো এমন উন্নত শিল্প হয়ে গিয়েছে যে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। কিন্তু তার মধ্যে কি আর্তি আছে? নাকি পুজোকে ভোগ করার দুর্বৃত্তায়ন? তা কি আন্তরিক পুজো ব্যবস্থাপনার চেয়ে পুজো পরিক্রমার অ্যাওয়ার্ড গুছিয়ে রাখতে অনেক বেশি উৎসাহী?

কোথাও সন্দেহ হয় প্রশ্নের মধ্যে উত্তর লুকিয়ে আছে। শহরের চল্লিশোর্ধরা ভেবে দেখবেন! বাকিদের? বাকিদের কোনও গরজ হওয়ার কথা নয়! ■

জয়ন্ত ঘোষাল

সলিলকি / একাকী নির্জনে

সাদা পাতার সামনে কালো কালির কলম দণ্ডবৎ—

তারপর স্তব্ধ। নানা রকম ঢেউ। নানা ধরনের। নানা আকৃতির। আছড়ে পড়ে বালুতটে। তাতল সৈকতে। প্রকাশে আনন্দ। কিন্তু গলায় দলা পাকিয়ে আছে ব্যথা। অপ্রকাশিত রচনাবলি। এ এক ধ্বস্ত সময়। এ এক ত্রস্ত সময়। ভেঙে খান খান হয়ে যাওয়া সংস্কৃতি।

আমি এবং তুমি অর্থাৎ আমরা। কথা বোল না।

কেউ শব্দ কোরও না। ভগবান নিদ্রা গেছেন। গান্ধীজি কোনও কোনও দিন কথা বলতেন না। মৌন দিবস।

এর চেয়ে ঢের ভালো চুপ করে থাকা।

চুপ করে থাকলে ভাবনার স্রোত নাকি শান্ত হয়। সমাধিস্থ মন ঐকতানে আশ্রিত।

গ্রিক ক্যাথারসিস? রাবীন্দ্রিক অতিকথন? অতি ভোজনের পর হাঁটা? শুধুই হাঁটি।

প্রেমিক-প্রেমিকা কত কথা বলে চলে আজও।

ভিক্টোরিয়ার কালো পরিটার স্ট্যাচু-স্ট্যাচু খেলা দেখতে দেখতে চিনে বাদামের খোসায় খোসায় আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ।

সেলুকাসদা, প্লিজ অবাক হবেন না,

এ পৃথিবীতে চিরকাল বড়োলোকের ঢাক গরিব লোকের চামড়ায় সৃষ্ট— এটা মার্কস কী বলবেন? এটা কি রকেট বিজ্ঞান— নাকি! ওটা তো আমারও জানা পুঁজিবাদ বনাম সমাজতন্ত্র ভেবেছিলাম, এখন তো পুঁজিবাদ বনাম পুঁজিবাদে খেলা— এ নাকি দয়ালু উপকারী সৃজনশীল পুঁজিবাদ। তবে প্লুটোক্রেসির অতি ধনীতন্ত্র বেড়ে চলা অসাম্য—!! পরিবর্তন তার পরিবর্তন তারপর তার পরিবর্তন তারপর আরও আরও প্রভু দাও মোরে আরও চেতনা— দাও মোরে আরও পরিবর্তন। আরও পরিবর্তন। আরও পরিবর্তন! উরু থেকে স্ট্র দিয়ে রক্তপান। কুল ড্রিঙ্ক। এক নতুন কুরুক্ষেত্র। মতপার্থক্য না কলহ? নেহরু বনাম গান্ধী, গান্ধী বনাম সুভাষ, ইন্দিরা বনাম মোরারজি, রুজভেল্ট বনাম চার্চিল, সনিয়া বনাম পাওয়ার, আদবানি বনাম মোদি, মমতা বনাম সিপিএম। চিটফান্ড বনাম মা মাটি মানুষ।

এ এক বনামের সংস্কৃতি! এর চেয়ে ঢের ভালো ছিল বন্ধ, হরতাল, ছুটি, খিচুড়ি আর ইলিশ ভাজা খেয়ে নিরুপদ্রব দিবানিদ্রা নাগরিক থেকে কলকাতা-৭১, জন অরণ্য থেকে ইন্টারভিউ বেকার বাঙালি, লক আউট, লে অফ, নো ভ্যাকান্সি আর আজ ঊনিশে এপ্রিল থেকে ম্যাডলি বাঙালি— সবাই আইটি প্রফেশনাল্‌স্ মিনিবাসে মাকালীর ছবিতে গাঁদা ফুলের মালা দোলে দোদুল দোলে দুলো না এ কী মায়া? কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বরে জনসমাগম

বাড়ছে। বেড়েই চলেছে।

সংবাদে প্রকাশ, বিশ্বস্ত সূত্র, বিশ্বাস করো।

কাপুরুষ মহাপুরুষ সবাই একাকার হয়ে মুচিরাম গুড়ের আত্মজীবনী— আমরা সবাই জমিদার।

তবু গলায় আটকে থাকা টনসিলের যন্ত্রণা সুর করে নামাজ পড়ে হৃদয়ের অলিন্দে অলিন্দে কোনও দলাই লামা অথবা রবিশঙ্কর এসে আমায় আর্ট অফ লিভিং শেখাতে পারছে না।

ক্যান্সার রোগীর বুকে গোলাপি রিবন লাগিয়ে বলছি, তুমি হাসো। হাসো। হাসো।

পজিটিভ থিঙ্কিং।

হাসতে পারছি না। হাসতে গিয়ে গলায় কাশি আসছে খক্ খক্ খক্ করে—

এ পথের শেষ কোথায়? ওটা কলেজ স্ট্রিটে গিয়ে জেনে নেব আবু সয়ীদ আইয়ুবের কাছ থেকে।

আপাতত দু'পাত্র মদ্যপান করে সুররিয়ালিজম হয়ে যেতে পারি—

মুক্তি? মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি?

মুক্তি কোথায় পাবি?

সুচরিতা,

একদিন তোমার দূরতর দ্বীপে বিপ্লব আর প্রেমকে একাকার করে দেব ভেবেছিলাম, সুচরিতা এখন তোমার মুখে অনেক বলিরেখা মুখ যেন খরাপীড়িত মৃত্তিকা। সুচরিতা তুমি স্পা কর না? ফেসিয়াল? বিপ্লব আর প্রেমেও কি ঝগড়া? তাহলে শাহবাগে যারা শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করছিল বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ইজিপ্টে তেহরিক-ই-স্কোয়ারে। যারা সেনা-বুলেটকে ভয় পায় না, ওরা কারা? বিশু পাগলা আর নন্দিনীরা কি ওখানেও এলোমেলো দৌড়ে বেড়াচ্ছে!

আর আমি?

আমি কিন্তু ভালো আছি নিখিলেশ।

আমায় দেখে যা।

আমি সম্পাদকীয় স্তম্ভে সিমেন্টের মতো কঠিন হয়ে তার মধ্যেই লুকিয়ে আছি।

ধুতরোর মতো বুদ্ধিজীবী কঠিন কঠোর সম্পাদকীয় স্তম্ভে নেশাগ্রস্ত আমি।

ভালো আছি।

বেশ ভালো আছি।

এমনি করেই দিন যদি যায় যাক না।

গলায় শুধু ব্যথা
কথা বলতে পারি না
ধ্বংসের মধ্যে আমি
থাকি আর সৃজনের
গান গাই।
এও কি পরবাস,
সম্পাদকীয় হয়ে বেঁচে থাকা
সম্পাদকীয়
এক পলাতকা ছায়া
বিষণ্ণ হলুদ রোদ্দুরে
বেঁচে থাকার নকল অক্সিজেন
এ জীবন এক সাজানো ঘটনা?
নিউটনের লাল আপেল
তবে কোন অঙ্গুলি হেলনে ঊর্ধ্বপানে ধাবিত হয়?

কিং ক্যানিউট প্রবল ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন আচম্বিতে—

জীবনের অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ জুড়ে সে-ই সত্য হয়, যা প্রতিভাত—

অবভাসই সত্য, সত্য আসলে সত্য নয়, জাতি জানতে চায়!

এ এক নয়া কুরুক্ষেত্র
টি আর পি সত্য
জগৎ মিথ্যা
তবু আমি আছি
ভালো আছি
সম্পাদকীয় স্তম্ভ হয়ে এই বদ্বীপে বেঁচে আছি
বারীন্দ্রিক অম্লশূল নিয়ে।

ইমানুল হক

মিশ্র-সংস্কৃতি ছাড়া দেশ ও জীবন বাঁচবে না

পৃথিবীর ইতিহাস মিশ্র-সংস্কৃতির ইতিহাস। অবিমিশ্র কোনও জাতি নেই। সে যে তা খুশি গর্ব বা বড়াই করুক। ইংল্যান্ডের কথাই ধরুন। অ্যাংলো স্যাক্সন ও নর্মানদের মিশ্রণে তৈরি জাতি।

ইংরেজি বলে যে ভাষাটি জানি, তার ২৬টি হরফের মাত্র ৩ টি ইংরেজি। বাকিগুলো সব রোমান। ইংরেজি গাণিতিক অক্ষর বলে পরিচিতগুলো অর্থাৎ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 সব আরবি অক্ষর। বিশ্বাস না হলে অক্সফোর্ড অভিধান দেখুন। তাতেও সমস্যা হলে গুগল দাদাকে জিজ্ঞেস করুন।

যেমন সংস্কৃত ভাষার কোনও নিজস্ব হরফ নেই। দেবনাগরী বলে কার্যত হিন্দি চলে।

এ-সব বিষয় কঠিন মনে হলে, ইতিহাসে ফিরি। লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপ থেকে পালিয়ে যান ইখতিয়ার উদ্দিন বিন বখতিয়ার খিলজির ভয়ে। অনেকেই বলেন সংক্ষেপে বখতিয়ার খিলজি। ভুল বলেন। বখতিয়ার খিলজি ইখতিয়ার উদ্দিনের বাবার নাম। ইখতিয়ার উদ্দিন বিন বখতিয়ার খিলজি মানে বখতিয়ার খিলজির ছেলে ইখতিয়ার উদ্দিন।

তা নবদ্বীপ থেকে পালিয়ে লক্ষ্মণ সেন আশ্রয় নিলেন পূর্ব বঙ্গে।

তাঁর রাজসভায় বহু জ্ঞানীগুণী মানুষের ভিড়। কিন্তু রাজকাজ পরিচালনায় কার মতামতের মূল্য তিনি সবচেয়ে বেশি দিতেন? তাঁর নাম শেখ জালালউদ্দিন। বিশ্বাস হচ্ছে না, ‘শেখ শুভোদয়া’ বইটি পড়ুন। সেন আমলেই লেখা।

দীনেশচন্দ্র সেনের ‘বৃহৎ বঙ্গ’ গ্রন্থে বিস্তৃত তথ্য আছে। ‘রামায়ণ’ অনুবাদ ছিল নিষিদ্ধ।

অষ্টাদশ পুরাণ মানবভাষায় শুনলে রৌরব নরকে ঠাঁই হওয়ার বিধান।

কানে শিসা ঠেলা দেওয়ার নির্দেশ।

কৃত্তিবাস ‘রামায়ণ’ অনুবাদ করলেন। কে ভরসা দিলেন, টাকা জোগালেন? গৌড়েশ্বর। গৌড়েশ্বর কে? সুলতান জালালউদ্দিন।

বাংলায় ‘মহাভারত’ অনুবাদ করেছেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর। টাকা জোগালেন কে? একজন জন্মসূত্রে মুসলিম শাসক।

‘পরাগল খানি মহাভারত’ নামে 'মহাভারত'-এ একটি অনুবাদ তো বিখ্যাত। ‘ছুটি খানি মহাভারত’-ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

সুলতান হোসেন শাহের ছেলে নসরৎ শাহের আর এক নাম ছিল ছুটি খান।

মালাধর বসু—বাংলায় ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ কাব্য লিখে অমর হয়েছেন। অর্থ জুগিয়েছেন কে? ‘গুণরাজ খান’ উপাধি

দিয়েছিলেন যিনি। তিনি কে? নারায়ণ? নারায়ণ—রুকনুদ্দিন বাবরক শাহ।
রুকনুদ্দিন বাবরক শাহ মালাধর বসুকে গুণরাজ খান নামে ডাকছেন, আর মালাধর বসু লিখেছেন, গুণরাজ খান নাম দিলা নারায়ণে।
জন্মসূত্রে কায়স্থ 'হিন্দু' মালাধর বসুর কাছে নারায়ণ জন্মসূত্রে 'মুসলমান' রুকনুদ্দিন বারবক শাহ।
রুকনুদ্দিন বারবক শাহের পূর্বপুরুষ শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ প্রথম শাসন কাজে বাংলা শব্দটি ব্যবহার করেন। ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে/ সাধারণ অব্দে নাম পরিগ্রহণ করেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ--শাহ ইং বঙ্গালিয়ান।
তাঁর শাসনকাজে প্রচুর বাঙালি হিন্দুকে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন তিনি। এ-নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ইতিহাসবিদ জগদীশ নারায়ণ সরকারের চমৎকার কাজ আছে।

২

বাংলায় সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে বিপ্লব এনে দেন চৈতন্যদেব।
হিন্দু-মুসলমান কিছুটা হলেও সমন্বয় এবং তথাকথিত নীচু জাতের মানুষকে বুকে টেনে নেন তিনি।
এটা সম্ভব হল কীভাবে?
এক তো ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দ থেকে একটা সমন্বয়বাদী প্রশাসন চলছিল। তার সঙ্গে ছিল তাঁর বাবার উদার মনোভাব।
ওড়িশা থেকে চলে আসতে বাধ্য হওয়া ব্রাহ্মণ সন্তান জগন্নাথ মিশ্র আশ্রয় নিলেন নবদ্বীপের মুসলিম মহল্লায়। নাম মিঞাপুর। পরে এটাকে এখন মায়াপুর বলে চালানো হচ্ছে। তবে সেই মিঞাপুর/ মায়াপুর নদীগর্ভে। বর্তমান মায়াপুর বর্তমানে তৈরি করা জায়গা। মিঞাপুর/ মায়াপুর ছিল গঙ্গা নদীর পশ্চিমে। এখনকার বৈভবী মায়াপুর গঙ্গা নদীর পূর্ব পাড়ে।
বিশ্বাস না হলে দীনেশচন্দ্র সেনের লেখা 'বৃহৎ বঙ্গ' পড়ুন।
চৈতন্যদেবের চিন্তা প্রসারে সহায়ক হয়েছিল বাংলার উদার শাসক হোসেন শাহের উদার দৃষ্টিভঙ্গি।
রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী চৈতন্যদেবের পরবর্তীকালের দুই সহচর হোসেন শাহের সরকারের অতি গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন।

৩

এখনকার কালে একটু ফিরি।
সঙ্গীত সমাজের গল্পে।
ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ মনে করতেন, উৎকৃষ্ট দেশি ঘি, দুধ, পেস্তা, বাদাম ও মাংস ডিম, দৈনিক এবং বেশি পরিমাণে না খেলে গান বাজনা হয় না। বুদ্ধদেব গুহ একবার শীতের রাতে বর্ধমান থেকে ফেরার পথে শীতে জবুথবু আমাকে তাঁর অতি দামি কালো কাশ্মীরি শাল গায়ে চড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, বাঙালিদের মধ্যে ভালো ওস্তাদি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গায়ক কেন মেলে না জানো? নিজেই উত্তর দেন, প্রচুর পরিমাণে পেঁয়াজ, রসুন দিয়ে মাংস না-খেলে গলা ও হাতে জোর আসে না।
ওস্তাদ বিলায়েত খান নাকি এক কেজি দেশি মুরগির বিরিয়ানি খাঁটি গাওয়া ঘি দিয়ে বানিয়ে একলাই খেয়ে ফেলতেন।
ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খানের গল্প লিখেছেন পণ্ডিত কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। 'কুদরত রঙ্গিবিরঙ্গি'-তে।
অমিয়নাথ সান্যালের বইয়ে আছে, ওস্তাদ কালে খাঁ কুড়িটা লুচি, মাংস দই রাবড়ি মিষ্টি খেয়ে নাটোরের রাজবাড়িতে গাইতে বসেন।
ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খানও ব্যাপক খেতেন। দম ভরে এবং দমে গাইতেন।
কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কলকাতার বাড়ির উল্টোদিকে সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে তিনি উঠতেন। যেখানেই যেতেন সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন লুধিয়ানার খাঁটি ঘিয়ের বড়ো টিন। তো একবার ঘি গেল ফুরিয়ে। ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খান শাগরেদদের

হুকুম দিয়ে বললেন, চলো, মালপত্র গোটাও।
সবার তো মাথাখারাপ। সামনে সঙ্গীত সম্মেলন।
কী হবে! নানা কিসিমের ঘি আনা হল। সব বাতিল।
অবশেষে দুদিন সময় চেয়ে লুধিয়ানা থেকেই খাঁটি দেশি ঘি আনা হলে তিনি শান্ত হলেন।
একবার দিল্লি এলেন। সঙ্গীত নাটক আকাদেমি সবে তৈরি হয়েছে। প্রথম সচিব নির্মলা যোশি। বাড়িতেই থাকার ব্যবস্থা। নির্মলা যোশির পরিবার নিরামিষাশী। সেই মতোই বন্দোবস্ত । খাবার দেখেই খড়্গহস্ত ওস্তাদ। কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জবানিতে শুনুন:
ওস্তাদের জন্য ষোড়শোপচারে পুরী পরাঠা লাউ ঢ্যাঁড়শ তুরেইয়ের তরকারি আনা সাজিয়ে দিতে উনি রেগে টান মেরে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন; "অ্যা: খানা ঔর অ্যা: গানা? ক্যা সোচ লিয়া তুম লোগোনে?"
আর একটা ঘটনা মাদ্রাজের। ১৯৫১-র ডিসেম্বর। ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খান মাদ্রাজ (অধুনা চেন্নাই) গেছেন। কর্ণাটকি রীতির সুগায়কদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জি এন বালসুব্রহ্মণিয়াম নিজের বাড়ির আউট হাউসে থাকার ব্যবস্থা করেছেন। বালসুব্রহ্মণিয়ামের স্ত্রী আউট হাউসে মাংস, ডিম খাওয়ার কথা শুনে বললেন, এ-বাড়ির ত্রিসীমানায় ওসব ঢুকলে আমি আত্মহত্যা করব।
অগত্যা অন্য জায়গায় থাকার বন্দোবস্ত করতে হল। সেবার তিন মাস ছিলেন মাদ্রাজে। সপ্তাহে দুটি-তিনটি আসর। গান শুনে মাত শ্রোতারা।
এই রকম এক আসরে ব্রাহ্মণ সন্তান ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁয়ের পায়ের ধুলো নেন। নিয়ে বললেন, আপনিই সেরা।
চারদিকে ছিঃ ছিক্কার। চিল চিৎকার।
দক্ষিণী ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে মুসলমানের পায়ে হাত?
ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর এবং মাদ্রাজ সঙ্গীত আকাদেমির সভাপতি বালসুব্রহ্মণিয়ামের জবাব, শিল্পীদের জাত নেই। গোলাম আলি খাঁ মুসলমান হতে পারেন, কিন্তু তাঁর গলায় সরস্বতীর অধিষ্ঠান, আমি তাঁকেই প্রণাম করেছিলাম।
(কুদরত রঙ্গিবিরঙ্গি, কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পৃ ১২৪-৫)।
এটাই হচ্ছে আসল ভারত, আমাদের ভারত মিশ্র সংস্কৃতির ভারত।
এবং মিশ্র-সংস্কৃতি ছাড়া দেশ ও জাতি এবং জীবন বাঁচানো অসম্ভব। ■

মাজহারুল ইসলাম

ঝরা বকুল

চল্লিশ বছর আগে ডায়মন্ড হারবার ছেড়েছি। তখন আমার বয়স বড়ো জোর বারো কী তেরো। দীর্ঘসময়ে অনেক বদলে গেছে এই অঞ্চল। কোনোভাবেই আমার শৈশবের সঙ্গে মিলাতে পারছি না। সব কিছুই অপরিচিত লাগছে।

তখন এত দালানকোঠা বাড়িঘর কিছুই ছিল না। অধিকাংশ বাড়ি ছিল মাটির তৈরি এবং গোলপাতার ছাউনি। হাতে গোনা কিছু পাকা বাড়ি ছিল। জনবসতিও অনেক কম।

কলকাতা থেকে ডায়মন্ড হারবার এসেছি পুরোনো স্মৃতি খুঁজে পেতে। দুই ঘণ্টা ঘোরাঘুরি করেও আমাদের বাড়িটা খুঁজে গেলাম না। কলকাতা এসেছি বুবলির বাবার চিকিৎসা করাতে। বুবলি আমার ছোটোমেয়ে। মেজোছেলে বুবন ও তাদের বাবাসহ আমরা চারজন একটা টেক্সি নিয়ে এসেছি। পুত্র-কন্যারা এ যাত্রায় নানার বাড়ি দেখতে চায়, যেখানে তাদের মায়ের শৈশব কেটেছে।

পাঁচ বছর বয়সে মায়ের কোলে করে সিরাজগঞ্জ থেকে ডায়মন্ড হারবার এসেছিলাম। আমার আব্বা সিভিল সার্ভিসে চাকরি করতেন। আমরা এসে প্রথমে একটা ভাড়াবাড়িতে উঠেছিলাম। মাটির ঘর ছিল। তখন পাকা বাড়ি ভাড়া পাওয়া যেত না। কিছুদিন পর আব্বা জমি কিনে বাড়ি বানানোর কাজ শুরু করলেন। আমি প্রায়ই আব্বার সঙ্গে বাড়ির কাজ দেখতে যেতাম। বড়ো বড়ো তিনটে রুম। সামনে বড় একটা বারান্দা। সন্তানদের খেলার জন্য সামনে অনেকটা জায়গা ফাঁকা রেখেছিলেন। বাড়ির ফাউন্ডেশন দিয়েছিলেন দোতলার। আব্বার ইচ্ছা ছিল কিছুদিন পর দোতলাটা বানাবেন। বাড়ির খানিকটা সামনেই সাগর। দোতলা থেকে সাগরের নীল জলরাশি দেখবেন এমনটাই আব্বার ভাবনা ছিল। কিন্তু সেই সুযোগ আর হয়নি। সাতচল্লিশে দেশভাগের ফিরে গিয়েছিলেন। একেবারে গিয়ে উঠেছিলেন সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ গ্রামে নিজ পৈতৃক বাড়িতে। কয়েকমাসের মধ্যেই বুঝলেন গ্রামে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া হবে না। তাই অল্প কিছুদিনের মধ্যে সিরাজগঞ্জ শহরে যমুনা নদীর পাড়ে দশ কাঠা জমি কিনে বাড়ি বানালেন। আব্বার কেন জানি সাগর, নদী বা পানির প্রতি আলাদা একধরনের দুর্বলতা ছিল।

ডায়মন্ড হারবার এখন পর্যটন শহরে পরিণত হয়েছে। অনেক ট্যুরিস্ট আসে এখানে। কলকাতা থেকে ট্যাক্সি বা প্রাইভেট গাড়িতে দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা লাগে। এছাড়া ট্রেন ও বাস সার্ভিস তো আছেই। সমুদ্রের ধার ঘেঁষে

পর্যটন কর্পোরেশনের হোটেল। সেখানে আমরা দুপুরের খাবার খেলাম। খাবার খেতে খেতে ছেলেমেয়েদের এইসব গল্প বলছিলাম। ওরা খুব আগ্রহ নিয়ে আমার গল্প শুনছে। খাওয়াদাওয়ার পর্ব শেষে ট্যাক্সিতে উঠে মন খারাপ করে কলকাতা রওনা হলাম। রেস্টুরেন্ট থেকে খানিকটা পথ পেরিয়ে ট্যাক্সিটা ডানে মোড় নিতেই জায়গাটা পরিচিত মনে হল। আর একটু এগোনোর পর আমি টেক্সিওয়ালাকে বললাম গাড়িটা থামাতে। বুবন বলল, মা সময় নষ্ট না করে চলো তাড়াতাড়ি কলকাতা ফিরে যাই। কাল সকালে বাবাকে ডাক্তার দেখাতে হবে।

আমি ছেলের কথায় কান না দিয়ে জানালার গ্লাস নামিয়ে একজন পথচারীকে জিত্তেস করলাম, দাদা, সামনের ডান দিকটায় কি মেথরপট্টি?

সে মাথা নেড়ে বলল, জি।

আমার মনে হল আমি চল্লিশ বছর আগে ফিরে যাচ্ছি। আনন্দে মনটা ভালো হয়ে গেল। মেথরপট্টির পাশের রাস্তা দিয়ে আমি স্কুলে যেতাম। কাজেই আমার চিনতে অসুবিধা হল না। ড্রাইভারকে ডান দিকে যেতে বললাম। ছেলেমেয়েরা ভীষণ বিরক্ত। ওদের বাবার মুখে কোনো কথা নেই। কিন্ত আমি নিশ্চিত সেও বিরক্ত, যদিও তার চেহারা দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই।

বুবলি বলল, মা, তুমি আবার শুরু করলে? দুই ঘণ্টা খোঁজাখুঁজি করে তো বের করতে পারোনি।

আমি কোনো কথা না বলে ড্রাইভারকে গাইড করতে থাকলাম। এই রাস্তা আমার চেনা। ওই তো সামনে বাম দিকে এসডিও চাচার বাড়ি। আমি এবং আমার বান্ধবী রেনু কতদিন প্রাচীর টপকে ভেতরে ঢুকে লুকিয়ে কাঁচা আম পেড়ে এনেছি। একদিন দারোয়ানের কাছে ধরা পড়ে সে কী কাণ্ডটাই না ঘটেছিল! অনেক কাকুতি-মিনতির পর দারোয়ান চাচা সেদিন ছেড়ে দিয়েছিল। তবে সেই আমগাছটা এখন আর দেখছি না। বাড়িটাও মনে হল পরিত্যক্ত অবস্থায় গড়ে আছে। এসডিও চাচা ও আব্বা একসঙ্গে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তেন। সাত আটশো গজ সোজা যাওয়ার পর ডানদিকে মোড় নিয়ে গাড়ি দাঁড় করালাম। ডানে-বামে অনেকগুলো নতুন বাড়ি হয়েছে। গাড়ি থেকে নেমে এক বৃদ্ধকে জিত্তেস করতেই তিনি চাঁদশির ডাক্তারের বাড়িটা দেখিয়ে দিলেন।

আমি সবাইকে নিয়ে আমাদের সেই বাড়িটার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকায় বাইরে থেকে ভেতরটা দেখা যাচ্ছে না। আমরা যখন ছিলাম তখন কোনো বাউন্ডারি ওয়াল ছিল না। সিমেন্টের পিলারের সঙ্গে কাঁটাতার দিয়ে বাড়িটা ঘেরা ছিল।

সদর দরজা বন্ধ। অনেক খোঁজাখুঁজির পর কলিংবেল পাওয়া গেল, কিন্ত কয়েকবার চাপ দেওয়ার পরও কোনো সাড়াশব্দ নাই। কলিংবেল নষ্ট কি না বুঝতেও পারছি না। বুবলি দরোজায় কয়েকটা বাড়ি মারল। এবার মনে হল কেউ একজন হেঁটে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজা অর্ধেক খুলে অল্পবয়সি একজন পুরুষ মাথাটা খানিক এগিয়ে জিজ্ঞেস করল, কাকে চাই?

আমি বললাম, এটা কি চাঁদশির ডাক্তারচাচার বাড়ি?

আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? জানতে চাইলেন তিনি।

বাংলাদেশ বলার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা ধড়াম করে মুখের ওপর বন্ধ করে দিল। কী আশ্চর্য! আমি বারবার বললাম, একটু শোনেন প্লিজ। কিন্ত তিনি কোনো কথাই শুনলেন না। আমি হতভম্ব। ছেলে বলল, মা তুমি মনে হয় ভুল জায়গায় এসেছ। আর বাড়ি খুঁজতে হবে না। চলো, আমার আর ভালো লাগছে না। বুবলির বাবাও ছেলের কথায় সায় জানালেন।

শুধু বুবলি বলল, না, মা ঠিকই খুঁজে বের করেছেন। এটাই আমাদের নানুর বাড়ি। ভদ্রলোক বাংলাদেশ শুনে ভয়ে দরজা লাগিয়ে দিয়েছে।

মেয়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই দরজা খুলে গেল। দেখা গেল যাটোর্ধ্ব এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে। তিনিও দরজাটা পুরোপুরি খুললেন না। খানিকটা খুলে কোনোরকমে মাথাটা বের করে বললেন, এই ভরদুপুরে

কী চাই আপনাদের বলুন তো?

আমি বললাম, এটা কি চাঁদশির ডাক্তারচাচার বাড়ি?

তিনি বললেন, আজ্ঞে। তিনি তো অনেক অগেই গত হয়েছেন। আমি তার বড়োছেলে সমীরণ দত্ত। কিন্তু কী হয়েছে বলুন তো?

বললাম, আমি মাহাতাব উদ্দিন তালুকদারের বড়োমেয়ে। দেশভাগের সময় আমার বাবার কাছ থেকে আপনার বাবা এই বাড়িটা কিনেছিলেন।

সমীরণবাবু খুবই বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, বাবার কাছে নামটা শুনেছি। কিন্তু হঠাৎ এতদিন পর কী উদ্দেশ্যে আপনাদের আগমন ঠিক বুঝতে পারছি না।

আমি বললাম, কোনো উদ্দেশ্য নাই। এই বাড়িতে আমার শৈশব কেটেছে। হাজারো স্মৃতি এই বাড়িটা ঘিরে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেছি বাড়িটা দেখাতে। চল্লিশ বছর পর এখানে এলাম। এত বদলেছে ডায়মন্ড হারবার! অনেক কষ্টে বাড়িটা খুঁজে পেয়েছি।

এবার মনে হল ভদ্রলোক কিছুটা আশ্বস্ত হলেন যে অন্তত আমরা বাড়িটার দখল নিতে আসিনি। এতটা সময় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। একবারও ভেতরে যেতে বলা তো দূরের কথা দরজাটাই পুরোপুরি খুলছেন না। ছেলেমেয়ে দুজনই খুব বিরক্ত হচ্ছে। বুবলির বাবা রসিকতা করে বললেন, ভয় পাবেন না দাদা। আমার শ্বশুরের মাটির নীচে পুঁতে রাখা পিতলের কলসগুলো খুঁজে গেলে অর্ধেকটা আপনাকেও দেব।

এবার তিনি হেসে উঠে বললেন, সে না হয় হবে। আগে ভেতরে আসুন তো।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সবাইকে নিয়ে বাড়ির আঙিনায় প্রবেশ করলাম। আমাদের সেই একতলা বাড়িটা কালের সাক্ষী হয়ে আগের মতোই দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশেই নতুন দোতলা একটা বিল্ডিং উঠেছে। মুহূর্তের মধ্যে শৈশবের দিনগুলি যেন জ্বলজ্বল করে উঠল। সমীরণবাবু জানালেন দোতলাটা তার বাবা-মা স্বর্গে যাওয়ার পর তিন ভাই মিলে বানিয়েছেন। পরিবার নিয়ে তারা একসঙ্গেই থাকেন।

আমি প্রথমেই সবাইকে নিয়ে আমার ঘরটায় ঢুকলাম, সেখানে এখন বাড়ির কাজের লোকেরা ঘুমায়। একটা চকি ছাড়া কোনো আসবাসপত্র নেই। দেয়ালে টাঙানো রশিতে ময়লা কাপড় ঝুলছে। সিলিংয়ে মাকড়সার জাল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। দেয়ালের কোনো কোনো জায়গা থেকে প্লাস্টার খুলে পড়েছে। দখিনের জানালার একটা কপাট ভাঙা। এই জানালার গাশেই ছিল আমার পড়ার টেবিল। আহা, আমার কত স্মৃতি এই ঘরটার মধ্যে বন্দি হয়ে আছে!

আমি চকির ওপর বসে পড়লাম। বুবলি খুব বিরক্ত হয়ে বলল, মা, তুমি চেনো না জানো না কার বিছানায় বসে পড়লে!

আমি বুবলির কথার কোনো উত্তর দিলাম না। বুবলির বাবা সমীরণবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন। আব্বা-আম্মার ঘরটা এখন পুরোনো জিনিসপত্রের গোডাউন। রান্নাঘরটার সঙ্গে একটা বারান্দা আছে। মা বেশির ভাগ সময় বারান্দায় বসেই রান্না করতে গছন্দ করতেন।

এর মধ্যে বাড়ির বউ-ঝিরা এসে আমাদের দোতলায় নিয়ে গেলেন। বড়ো একটা রুম। এটাই মনে হল বাড়ির বৈঠকখানা। বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের জানার আগ্রহ অনেক। ওখানে যেতে পাসপোর্ট-ভিসা লাগে এটা তাদের জানা ছিল না। কক্সবাজারের নাম শুনেছে তারা। সেখানে একবার যেতে চায়। বুবলি ও বুবন তাদের কক্সবাজার কীভাবে যেতে হয় বিস্তারিত জানাচ্ছে। কক্সবাজার গেলে রাঙামাটি, বান্দরবান কেন যাবেন না এসব তাদের বোঝাচ্ছে। শীতকাল হলে সেন্টমার্টিন আইল্যান্ড ঘুরে আসা যেতে পারে...! মনে হল ভাইবোন মিলে ট্যুর অপারেটরের ব্যবসা খুলে বসেছে। বুবলির বাবাও সমীরণবাবু ও তার দুই ভাইকে নিয়ে গল্পে মেতে উঠেছেন। আমি একফাঁকে নীচে গিয়ে আমাদের বাড়ির বারান্দায় বসলাম। আহা কত স্মৃতি, কত কথা মনে

পড়ছে! জোছনারাতে আব্বা আমাদের সবাইকে নিয়ে এই বারান্দায় বসে গভীর রাত পর্যন্ত গল্প করতেন।

হঠাৎ আমার কানে ভেসে এল বকুলের কান্নার আওয়াজ। বকুল আমার ছোটোবোন। এই বাড়িতেই ওর জন্ম হয়েছিল। পরির মতো ফুটফুটে চেহারা ছিল বকুলের। আব্বা ওকে ডাকত 'লালবিবি' বলে। ওর জন্মের দেড় বছরের মাথায় মার কোলে এল পৃথু। তাই বকুলের সব দেখভালো আমাকেই করতে হত। আমাকে ছাড়া সে কিছুই বুঝত না। একরকম বলা যায় বকুল আমার কোলেই বেড়ে উঠছিল। আমি ওকে খুব আদর করতাম। বেশির ভাগ সময় আমার কাছেই থাকত। আমি ওকে গান গেয়ে শোনাতাম—

তুমি যে গিয়াছ বকুল-বিছানো পথে
নিয়ে গেছ হায়—
একটি কুসুম আমার কবরী হতে..."

এই গান শুনে বকুল ভ্যাঁ করে কেঁদে দিত। ওর কান্না শুনে মা আমাকে বকা দিতেন। বলতেন, এই গান গেয়ে ওকে কাঁদাস কেন? আমি তার পরও আড়ালে নিয়ে ওই গানটি গেয়ে বকুলকে কাঁদাতাম। ওর কান্না শুনতে আমার খুব ভালো লাগত।

একদিন দুপুরে মা রান্না করছিলেন। পৃথুর কান্নার আওয়াজ শুনে মা দৌড়ে ঘরে যান। বকুল আর আমি রান্নাঘরেই খেলছিলাম। বকুল গরম ডালের গামলায় পড়ে গেল। সে কী কান্না ওর! মুহূর্তেই ওকে আমি টেনে তুলে নিলাম। চিৎকার করে মাকে ডাকলাম। মা দৌড়ে এলেন। মাকে বললাম বকুল ডালের গামলায় পড়ে গেছে। বকুল তখন যন্ত্রণায় ছটফট করছে। মা ঠাস করে আমার গালে চড় দিয়ে বললেন, তুই থাকতে ও ডালের গামলায় পড়ল কী করে? মা বকুলকে টান দিয়ে আমার কাছ থেকে নিয়ে ঘরে চলে গেলেন। এরপর বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বার্নল এবং ডিম ভেঙে ফোসকা পড়া জায়গায় লাগাতে লাগলেন। বকুল আরও জোরে কাঁদতে লাগল। আমি অপরাধীর মতো দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে আছি। বকুলের কান্না কিছুতেই থামছে না। আমার কাছে আসার জন্য অস্থির হয়ে হাত বাড়িয়ে আছে। মা এবার আরও রেগে বললেন, হতচ্ছাড়ি, দাঁড়িয়ে দেখছিস কী? ওকে কোলে নিয়ে কান্না থামা। আমি দৌড়ে গিয়ে বকুলকে কোলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলাম।

খবর পেয়ে আব্বা ছুটে এসে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। আমিও আব্বার সঙ্গে গেলাম। ব্যান্ডেজ করে বকুলকে বাড়ি নিয়ে এলাম। দুদিন পর বকুলকে আবার হাসপাতালে নিয়ে গেলে ব্যান্ডেজ বদলে দিলেন ডাক্তার।

ব্যান্ডেজ খোলার সময় বকুলের সে কী চিৎকার করে কান্না! ফোসকা পড়া জায়গাগুলোতে ঘা হয়ে গেল।

ব্যান্ডেজ বদলাতে গেলে বকুল গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। দশ দিন পার হয়ে গেল কিন্তু কোনো উন্নতি নাই। ব্যান্ডেজ ভিজে পুঁজ গড়িয়ে পড়া শুরু হল। আব্বা চিন্তিত হয়ে নিয়ে গেলেন চাঁদশির ডাক্তারের কাছে। তিনি সব দেখে বললেন, গ্যাংরিন হয়ে গেছে। এত পরে কেন, আগে কেন আমার কাছে এলেন না? আব্বা বললেন, এতটা সিরিয়াস হবে ঠিক বুঝতে পারিনি।

ডাক্তারচাচা নতুন করে ব্যান্ডেজ বদলে দিলেন, সেইসঙ্গে নতুন কিছু ওষুধপত্র দিয়ে দুদিন পর আবার যেতে বললেন।

আব্বা আর আমি বকুলকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাব, আব্বা গেলেন গোসল করতে। আমি জামা বদলে বকুলের কাছে গেলাম। সে করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বুঝলাম ডাক্তারের কাছে যেতে চায় না।

আমি কোলে নিতে গেলাম কিন্তু সে আমার কোলেও আসবে না। এর কিছুক্ষণ পরই বিকট চিৎকার দিয়ে মাটিতে ঢলে পড়ল আমাদের বকুল।

ডায়মন্ড হারবার কবরস্থানে আব্বা তাঁর লালবিবিকে রেখে এসে ভীষণ কান্নাকাটি করলেন। আব্বাকে এভাবে কখনও কাঁদতে দেখিনি। আম্মার অবস্থাও একইরকম। সারাক্ষণ কান্নাকাটি করেন। শুধু আমার চোখে অশ্রু নেই।

আমি নির্বাক হয়ে অন্যদের কান্না শুনি। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে শুরু হয় আমার নিঃশব্দ কান্না।

বুকের মধ্যে একধরনের চাপা কষ্ট নিয়ে আমি ঘুমাতে যাই। সারা রাত নিঃশব্দে কাঁদতে থাকি। বালিশ ভিজে একাকার হয়ে যায়।

বুবলি কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে লক্ষ করিনি। বুবলি খুব রেগে আছে। বলল, মা, সবাই তোমাকে খুঁজে পাচ্ছে না। বাথরুম থেকে শুরু করে সব ঘরে তোমাকে খোঁজা হয়েছে আর তুমি কিনা একা এখানে এসে বসে আছ! একবার বলে তো আসতে পারতে। তোমার জন্য চা নিয়ে সবাই অপেক্ষা করছে।

আমি মেয়েকে বললাম, অনেকটা নস্টালজিক হয়ে গেছি রে মা। খুব বাবা-মার কথা মনে পড়ছে। বকুলের কান্নার আওয়াজ শুনতে পারছি।

বুবলি আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, সরি মা। আমার এভাবে বলা ঠিক হয়নি। চলো উপরে যাই।

দোতলায় গিয়ে খানিকটা লজ্জাই পেলাম। সবাই আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সমীরণবাবু প্লেটে একটা মিষ্টি তুলে দিয়ে বললেন, গোপালের মিষ্টি। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে। ডায়মন্ড হারবারের সবচেয়ে পুরোনো মিষ্টির দোকান। গোপাল স্বর্গত হয়েছে বাবার আগেই। বড়োছেলে এখন দোকানটা চালায়।

আমি আস্তে করে বললাম, জি মনে আছে।

মিষ্টির প্লেটটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। গোপালের নাম শুনে যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার কথা, তা পারছি না। এখান থেকে দ্রুত বিদায় নিতে হবে। কাল সকালে বুবলির বাবাকে ডাক্তার দেখাতে হবে, তাই তাড়া আছে—এই বলে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

চল্লিশ বছরের স্মৃতিকে পেছনে ফেলে আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে কলকাতার উদ্দেশে। আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি। ডায়মন্ড হারবারের বাড়িতে পা রাখার পর থেকেই নিজের ভেতরের আত্মদংশনটা বেড়ে গেছে। বুকের মধ্যে চাপা কষ্টটা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। চল্লিশ বছর ধরে আমি এই কষ্ট বয়ে বেড়াচ্ছি। যে কারণে অনেকবার কলকাতা আসা সত্ত্বেও ডায়মন্ড হারবার আমাকে কখনও টানেনি। এখানকার হাজারো আনন্দ-স্মৃতির মধ্যে ওই একটা হারানোর বেদনা আমাকে তিলে তিলে দগ্ধ করে যাচ্ছে, এবং সেটি হল বকুলের মৃত্যু। আমি ছাড়া কেউই এই মৃত্যুর কারণ জানে না। আমি ছাড়া কেউ আজও জানে না কীভাবে বকুল সেদিন গরম ডালের মধ্যে গড়ে ছটফট করে চিৎকার করেছে। এ-কথা কোনোদিন কাউকে বলিনি।

আমি তো ইচ্ছা করে করিনি। বকুল তো আমার আত্মারই অংশ। নিজের আত্মাকে কি কেউ হত্যা করতে পারে? কিন্তু আমি করেছি। বকুলের মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী।

স্বর্ণাভা কাঁড়ার

পটচিত্র পরিচয়ে পুরী

সাগর খুব বেশি দূরে নয়। নিশুত রাতে দমকা হাওয়ার টানে রঘুরাজপুরে শোনা যায় সমুদ্রগর্জন। গ্রামের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে যে শীর্ণ স্রোতধারা, তা মিশেছে ক্রোশটাক দূরে সেই সমুদ্রেই। ভাটার টানে নদীর জল হয়ে ওঠে নোনতা। স্রোতসম্বল নদীর বুকে জেগে থাকা সফেদ মিহি বালির চরে মাঝেমধ্যে জমে থাকে উজানে ভেসে আসা সামুদ্রিক লতাগুল্ম আর ঝিনুকের স্তূপ। গ্রাম থেকে নদীর ধার বরাবর পায়ে চলা পথ এমনিতে বড়ো নির্জন। হাটবারে সেখানেই পাঁচ গ্রামের ভিড়। গ্রাম পেরিয়ে পথ মিলেছে নদীর সেতু বরাবর রেললাইনে। ভার্গবী নদীর সেতুর ঠিক প্রান্তটিতে ছোটো স্টেশন জনকদেইপুর। লাইন পেরিয়ে খানিক এগোলে রাস্তা ঠেকেছে চন্দনপুরের হাটের সওদার ভিড়ে। চন্দনপুর হাটের মুখোখুমি হাইওয়ে। এপথে তীর্থযাত্রীদের আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। যাত্রীভর্তি কত বাস ছুটে চলে দক্ষিণে। চন্দনপুর থেকে এ রাস্তা ধরে দুকদম এগোলেই দক্ষিণে ধানখেত, নারকোল বাগিচার মাথা ছাড়িয়ে চোখে পড়বে জগন্নাথ মন্দিরের চুড়োয় ওড়া ধ্বজা। তীর্থশহর পুরী চন্দনপুর থেকে বাসরাস্তায় মাত্র আট কিলোমিটার পথ।

একদিকে যেমন রঘুরাজপুরের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া ভার্গবী নদী গিয়ে লীন হয়েছে পুরীর সমুদ্রে, তেমনি অন্যদিকে গ্রামের পথও গিয়ে মিলেছে ওই সমুদ্রশহরে। ভার্গবীতে চলে জোয়ার-ভাটার আসা-যাওয়া, পাশাপাশি গ্রামের লোকজনও প্রায় নিত্য যাওয়া-আসা করে পুরীতে। গ্রামের পসরা বিকোয় শহরের বাজারে। ব্যাপারীরা ফিরে আসে লাভের কড়ি গুণে আর সঙ্গে শহরের অভিজ্ঞতা নিয়ে।

বর্ণচোরা গ্রাম রঘুরাজপুর। নারকোল বাগিচার ঘেরাটোপের আড়ালে এখানে রং-রূপের নিত্য আয়োজন। আটপৌরে গ্রামজীবন, তবু মহারাণাদের পাড়ায় ঘরের চৌকাঠ পেরোলেই এ এক রঙিন জগৎ। বারোমাসই এ-পাড়ায় ঘরে ঘরে চলে পট গড়া বা চিত্রণের বিবিধ পর্ব।

প্রতিটি কুটিরই যেন এক-একটা চিত্রশালা। গৃহস্থালির দৈনন্দিনতা, মলিনতাকে আড়াল করে থাকে শিল্পের অঢেল সম্ভার। এক-একটা চিত্রশালায় দেওয়াল জুড়ে মুখোশের সার ঘরের আলো-আঁধারিতে মায়াবী রূপ নেয়। তারই মধ্যে মেঝেতে ছড়িয়ে থাকে রংগোলা পাত্র, বাঁশের দানিতে গোঁজা কত তুলি। মাথার ওপরে সিকে থেকে ঝোলে গুটিয়ে রাখা, তৈরি পটের বান্ডিল। ঘরে আলো যতটুকু আসে তাও ফাঁকফোকর গলে। কোণে কোণে বহুদিনের অন্ধকার যেন জমে থাকে। তাই গ্রীষ্মের দাবদাহে শিল্পীরা ঘর ছেড়ে ছবি আঁকার সরঞ্জাম গুছিয়ে বেছে নেয় কোনো গাছতলার নিরালা ছায়াটুকু, কিংবা গ্রামের রাধামোহন মন্দিরের চত্বর। গুরুবারে চিত্রশালার চৌকাঠ ভরে যায় লক্ষ্মীর পদচিহ্নে। দেওয়ালে ওঠে ধানের ছড়া, উঠোন জুড়ে পড়ে আলপনা।

বর্ষাটুকু ঘরের চালের আড়ালে ভালোয়ে ভালোয়ে কাটিয়ে দিতে পারলে আশ্বিনের পুজোর পর থেকে সারা শীতকাল চিত্রকরদের পাড়ায় প্রতিটি উঠোন জুড়ে লেগে যায়

কারিগরদের ব্যস্ততা। খড়িমাটির আস্তরণ দেওয়া পটের ওপর রেখে টেনে ফুটিয়ে তোলা হয় নকশা। পরে পটের ওপর রং লাগতেই স্পষ্ট হয় কাহিনির সূত্রটুকু। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ থেকে দেবদেবীদের লীলা, ইতিকথা নির্ভর করে তৈরি হয় রকমারি পট আর তার বহুবর্ণ চিত্ররূপ।

তৈরি পটচিত্রের ঝুলি কাঁধে নিয়ে শিল্পীরা যান পুরীর বাজারে। পুরুষানুক্রমে এই পথ ধরেই তাদের রুজি-রোজগারের তাগিদে আসা-যাওয়া। জগন্নাথ মন্দির থেকে যে প্রশস্ত 'বড়দাণ্ড' রাজপথ গুণ্ডিচামন্দির পর্যন্ত বিস্তৃত, তারই দুধারে মনোহারী দোকানের সারি। পটচিত্রের কারিগরদের বড়ো মহাজন হল পুরীর হস্তশিল্পের বড়ো দোকানদারেরা। আগাম কথামতো তারা পট নেয়, দাদন দেয়। কোনো মেলার সময় কিংবা কোনো তিথি উপলক্ষ্যে যাত্রীর ভিড় যখন বাড়ে, শিল্পীরা আস্তানা গাড়ে বড়দাণ্ড পথের ধারে। বিকিকিনি চলে। পড়ন্ত বিকেলে অনেকে পট সাজিয়ে বসে যায় স্বর্গদ্বারের কাছে সাগরবেলায়।

এক সময় পটশিল্পের ভালোো বাজার ছিল এই পুরীতে। তীর্থযাত্রীর দল এককালে দর্শন সেরে ফেরার পথে কিনে নিয়ে যেত টুকিটাকি নিদর্শন। অন্যান্য হস্তশিল্পের সঙ্গে দেবদেবীর পট, বিশেষ করে জগন্নাথ মন্দিরের ত্রিমূর্তির পট কেনার আকর্ষণ ছিল বেশি। ছাপাই ছবি প্রচলনের আগের কথা এসব। তখন পুণ্যার্থীদের জন্য নিয়মিত প্রচুর পটের চাহিদা মেটাতে হত এই চিত্রকরদের। নানা জায়গায় যাত্রীদের পট কেনার সুবাদে পুরীর পটচিত্র পরিচিত হয়েছিল দেশের অন্যান্য অংশেও। এভাবে তীর্থশহর পুরীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল পটচিত্রকরদের রুজি-রোজগার এবং তার পাশাপাশি ছিল শিল্পের উপযুক্ত পরিবেশ। পরে ছাপাই ছবি প্রবর্তনের এবং প্রচলনের ফলে পটশিল্পের টিকে থাকাই দায় হয়েছিল।

ভালোো পটচিত্র গড়তে কমপক্ষে লাগে কয়েকপুরু কাপড়ের ক্যানভাস। শিল্পীরা অনেক সময় নিয়ে হাতে তৈরি রং দিয়ে সেই জমিতে সনাতনী ধারায় ফুটিয়ে তোলেন দৃশ্যাবলি। এভাবে পট তৈরি করতে যা খরচ পড়ে, সামান্যতম মজুরির লাভটুকু পেয়ে বিক্রি করলেও মেশিনে ছাপা বা লিথোছাপাই পটচিত্রের ছবির তুলনায় তার দাম পড়ে অনেক বেশি। নকল পট বা ছাপাই ছবি তাই প্রকৃত সমঝদারির অভাবে একসময় ছেয়ে গিয়েছিল বাজারে। সেই শুরু, একালেও সেই ছাপা ছবির রমরমা একইভাবে অব্যাহত। একারণে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই পুরীর পটচিত্রীদের সামনে দেখা দিয়েছিল পটশিল্প এবং শিল্পীদের বেঁচে থাকার বড়ো কঠিন সমস্যা।

পটচিত্রশিল্প পুরীর চিত্রকরগোষ্ঠীর একান্ত নিজস্ব জাত পেশা। শুধু পেশা নয়, সৃষ্টির নেশাটিও লক্ষ করা যায় গুণী শিল্পীদের হাতের কারুকাজে। শুধু বিষয়বৈচিত্র্যই নয়, নান্দনিক দিক থেকেও সেসব পটচিত্র অনুপম সৃষ্টি।

পুরীর চিত্রকরদের মধ্যে তিনটি শ্রেণি বা 'বাড়হ' আছে। মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম বা সুভদ্রার সেবার দায়িত্ব পড়ে বংশপরম্পরায়। কে কোন দেবতার সেবায় নিযুক্ত, সেই অধিকার অনুযায়ী চিত্রকরদের মধ্যে তিন বিগ্রহের নামে তিনটি শ্রেণি আছে। চিত্রকররা নিজেদের সামাজিক পরিচয় দেবার সময় নিজের 'বাড়হ' বা শ্রেণির নাম উল্লেখ করেন। তবে তিনটি 'বাড়হ'র মধ্যে বিবাহসম্পর্ক স্থাপনে কোনো বাধা থাকে না।

রঘুরাজপুরের মহারাণা পল্লীর শিল্প ইতিহাস রয়ে গেছে বয়স্কদের সযত্ন স্মৃতি আর বংশপরম্পরা শুনে আসা কাহিনীতে। পূর্বসূরিদের হাতের কাজ শিল্পীদের ঘরে আঁতিপাঁতি করে খুঁজলেও আর মিলবে না। তবে প্রাচীন নমস্য শিল্পীদের হাতের কাজের দু-চারটে নমুনা এখনও মিলিয়ে যায়নি বোধহয় পুরীর মঠমন্দিরের দেওয়াল থেকে। ইংরেজ আমলের শেষদিকে হাতেগড়া পটচিত্রের বাজার হয়ে পড়েছিল অসম্ভব মন্দা। তাই শুধু বেঁচে থাকবার তাগিদে সেসময় মামুলি কাগজ কয়েকপুরু সেঁটে তাতে রং ধরিয়ে জলদি হাতের টানে রং, পরে রজন বার্নিশ চাপিয়ে শিল্পীদের ছুটতে হত বাজারে। অভাবের তাড়নায় অনেক শিল্পী সে যুগে জাতব্যবসা ছেড়ে অর্থ উপার্জনের অন্য রাস্তায় পা বাড়িয়েছিলেন। অনেকে হয়েছিলেন দেশান্তরী। আবার কেউ যে-হাতে রং তুলির সূক্ষ্ম কারুকাজ করতেন, সেই হাতেই তুলে নিলেন ইমারত কলি করার বুরুশ। রাজমিস্ত্রি, কাঠের কাজ, দোকানদারি এমনকি যাত্রার দল ও পেশাদার নাচিয়েদেরও সঙ্গী হল বহুজন।

একালে দেশ-বিদেশের সমঝদারেরা ছুটে আসে রঘুরাজপুরে পটচিত্রের খোঁজে। প্রয়ই দেখা যায় চন্দনপুর থেকে রঘুরাজপুরের পথে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে চলেছে পর্যটকদের গাড়ি। বিদেশি পর্যটকরাও মাঝেমধ্যে চলে আসেন ভার্গবীতীরে নারকোল গাছের ছায়ায় লালিত এই গ্রামটিতে।

সমঝদারজন রঘুরাজপুরে পা দিয়েই খোঁজ করে প্রবীণ শিল্পী জগন্নাথ মহাপাত্রের ঘরের ঠিকানা। হৃতগৌরব ফিরিয়ে এনে পুরীর পটচিত্রকে আবার নতুন উদ্যমে ঘরে ঘরে শুরু করাতে জগন্নাথ মহাপাত্রের অবদান অনস্বীকার্য।

রঘুরাজপুরের বাসিন্দারা গর্বের সঙ্গে তাঁদের গ্রামের পরিচয় দেন। কেননা, জগন্নাথ মহাপাত্রের নাম শুধু পুরী ভুবনেশ্বর বা ওড়িশাতেই নয়, সারা ভারতে সেরা কারুশিল্পীদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৭৫ সালে এই পটচিত্রের শিল্পী হিসেবেই তিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিলেন। এ গ্রামের সে আমলের আরেও অনেকের মতো কেলুচরণ মহাপাত্র বালক বয়সে আকৃষ্ট হয়েছিলেন পুরীর নট এবং দেবদাসী বা মাহারীদের নাচেগানে। কম বয়সেই 'গোতিপুয়া' বা বালক নটের দলে যোগ দিয়ে নাচে তালিম পেয়েছিলেন তিনি সেরা গুরুদের কাছে।

সেকালের মতো এখনও পুরী পটচিত্রের প্রিয় বিষয় জগন্নাথ মন্দিরের ত্রিমূর্তি এবং কৃষ্ণলীলা। বিভিন্ন তিথি এবং উৎসবে জগন্নাথ মন্দিরের বিগ্রহের বেশ এবং সাজের পরিবর্তন হয়। পটচিত্রে ত্রিমূর্তির যেসব বেশ দেখা যায় তার মধ্যে রঙের প্রয়োগও সঠিক হতে হয়। বাঁকাচূড়া বেশে বিগ্রহের কেশ থাকে কুঞ্চিত, থিয়া কেয়া বেশে মূর্তির সাজ হয় কেয়া ফুল দিয়ে, এছাড়াও আছে গজ উদ্ধারণ বেশ, পদ্মবেশ, রাজ-রাজেশ্বর বেশ, রাজা বেশ, রাধাদামোদর বেশ, কালীয়দমন বেশ, বাণভোজি বেশ, সোনা বেশ, কৃষ্ণবলরাম এবং গজানন বেশ।

কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পটে কৃষ্ণের জন্ম, পুতনা বধের কাহিনিচিত্রের চেয়ে শিল্পীদের আকর্ষণ বেশী ননীচোরা গোপাল, রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন ও বিহারের নানা দৃশ্য, কালীয়দমন, গিরিগোবর্ধন-ধারী কৃষ্ণ, গোপিনীদের বস্ত্রহরণ ও অন্যান্য ক্রীড়া, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে কৃষ্ণ জাতীয় পটচিত্র রচনায়। পটচিত্রের বিষয়বস্তু বিচিত্র এবং বেশিরভাগই হিন্দু পুরাণ ও নানা ধর্মীয় কাহিনির চিত্ররূপ। প্রাকৃতিক দৃশ্য, ফুলপাখি, ঘরবাড়ির আলাদা বা এককভাবে চিত্রণ প্রায় অনুপস্থিত হলেও পটচিত্রের মধ্যে চিত্ররচনাকে ব্যঞ্জনাময় করতে পরিপার্শ্বে এসব ছবি যথেষ্ট দেখা যায়। প্রধান সব হিন্দু দেবদেবী বা তাঁদের লীলাকথার ছবিই এককভাবে পটচিত্রে আছে। রামায়ণ, মহাভারতের আকর্ষণীয় অংশ নিয়ে অসংখ্য পট দেখা যায়। অযোধ্যার সিংহাসনে আসীন রাম, বামে সীতা, সঙ্গী ভরত ও হনুমানও আছে। দুপাশে চামর বাজনরত দাসদাসী, পাত্রমিত্র, লোকলস্কর। সবমিলিয়ে রাজসভার পরিবেশে একটা সময় থমকে আছে। হরধনুভঙ্গ, রাম-রাবণের লড়াই, আগুন সাক্ষী রেখে রাম ও গুহকের মিলন, সেতুবন্ধন, বনবাসী ত্রয়ী, গণ্ডিবদ্ধ সীতার কাছে ভিক্ষাপাত্রধারী ছদ্মবেশী রাবণ, লবকুশ, রাক্ষসনগরী লঙ্কায় হনুমান—এসবই পটচিত্রকরদের কাছে আকর্ষণীয় বিষয়।

কন্দর্পরথ পটে পাঁচটি নারীশরীর মিলে রথের রূপ নিয়েছে কামকুঞ্জ বা নরনারীকুঞ্জ পটে নয়টি নারী শরীর মিলে হাতির আকার। অর্ধনারীশ্বর বা রথযাত্রা পটে শিল্পীদের মুনশিয়ানা দেখার মতো।

সেকালের পটে দৃশ্য থাকত মোটামুটি একটাই। এযুগে যোগ হয়েছে নতুন রীতি। যে-কোনো দেবদেবীর লীলাকথা, রামায়ণ, মহাভারতের উপাখ্যানের বাছাই করা ধারাবাহিক দৃশ্যরূপ একই পটে পাওয়া যায় একালের শিল্পীদের কাজে। যেমন কৃষ্ণলীলার পূর্ণাঙ্গ পটচিত্রে পটের কেন্দ্রভাগে সবচেয়ে বেশি এলাকা জুড়ে থাকে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। প্রধান মূর্তি ঘিরে চতুর্দিকে ছোটখাটো খোপ বা বৃত্তের নকশাদার পরিধি বা ফ্রেমের মধ্যে থাকে কৃষ্ণের জন্ম থেকে আমৃত্যু প্রধান সব ঘটনার একটি করে দৃশ্যরূপ। এধরনের পটচিত্রে বোঝা যায় দৃশ্যের বিন্যাসের ক্ষেত্রে শিল্পীদের কল্পনা বেশ কিছুটা নতুনত্বের দিকে ঝুঁকেছে। আখ্যানভিত্তিক ছবিতে ধারাবাহিকতা, দৃশ্যান্তরের এমন সুষ্ঠু প্রয়োগ পটচিত্রের পাশাপাশি তসরচিত্রে এবং তালপাতা চিত্রণেও যোগ হয়েছে।

আশ্চর্যের কথা, পুরীর সমাজ ও ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে চৈতন্যদেবের যে বিরাট প্রভাব পড়েছিল, একালের পটচিত্রে তার তেমন স্থান প্রায় নেই। অন্যদিকে পুরীর গজপতি রাজাদের কীর্তি ও ইতিহাসের কিছু পটচিত্রে রাজাদের কীর্তি ও ইতিহাসের কিছু পটচিত্র জায়গা পেয়েছে। এরকমই একটি কাহিনি যা 'কাঞ্চীকাবেরী যাত্রা' বা 'কাঞ্চীবিজয়' নামে ওড়িশায় যুগে যুগে কাব্য, সাহিত্য ও শিল্পে স্থান পেয়েছে। ওড়িশী শিল্পীদের কাছে পুরীর রাজা পুরুষোত্তমদেবের কাঞ্চী রাজ্য বিজয়ের কাহিনি যথেষ্ট প্রিয় বিষয়। তাই সেই উপাখ্যানের দৃশ্যাবলি দেখা যায় প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তিচিত্র এবং পটচিত্রে।

কাঞ্চীকাবেরী কাব্যের মূল চরিত্র রাজা পুরুষোত্তমদে এক ঐতিহাসিক চরিত্র। জানা যায় তাঁর রাজত্বের কাল ছিল ১৪৬৭ থেকে ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ১৪৮৯ সালে তিনি সসৈন্য যুদ্ধযাত্রা করে কাঞ্চীর রাজাকে পরাজিত করে তাঁর কন্যা রূপাম্বিকাকে হরণ করে আনেন। ঐতিহাসিক সত্যের পাশাপাশি কাব্যের রূপকারদের হাতে এ কাহিনি হয়েছে ভক্তি ও প্রেমরসে দ্রাব এবং নাটকীয়। কাঞ্চীকাবেরী গাথার দৃশ্যচিত্র পুরীর মূল দেউলের নাটমন্দিরের দেওয়ালে কোন প্রাচীনকালে আঁকা হয়েছিল, যা আজও রয়েছে কিছুটা পরিবর্তিত রূপে।

পুরীর গঙ্গামাতা মঠে ঢুকলে মঠের বৈঠকখানার দিকে তাকিয়ে অবাক না হয়ে উপায় নেই। ঘরের চার দেওয়াল, মাথার ওপরের ছাপ সর্বত্র ছবি আর অলংকরণে সমৃদ্ধ। জগন্নাথের ত্রিমূর্তি ছাড়াও দেওয়াল-জোড়া বিশাল ভিত্তিচিত্রের এক-একটিতে রয়েছে বালকৃষ্ণ জঙ্গলে শিশুকৃষ্ণ ও তপস্যারত মুনি, নৃসিংহ অবতার, গোবর্ধন ও গোধন ও গোপী সঙ্গ কৃষ্ণ, রামচন্দ্রের অভিষেক, ঘোড়সওয়ার সেনানী। মঠের মোহন্তদের ছবি ও একটানা অলংকরণের আকর্ষণীয় কারুকাজ। গঙ্গামাতা মঠের সব ছবিই প্রাচীন, তাই কয়েক জায়গায় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে কিন্তু সব ছবিতেই ওড়িশী রীতিটুকু স্পষ্ট।

এধরনের আরও আকর্ষণীয় ভিত্তিচিত্র রয়েছে বড় ওড়িয়া মঠে। বড়ো ওড়িয়া মঠের প্রতিষ্ঠাতা জগন্নাথ দাস রাজা প্রতাপরুদ্রদেব এবং চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। বড়ো ওড়িয়া মঠের ছবির সংখ্যা অনেক। ত্রিমূর্তির ছবি ছাড়া রয়েছে কৃষ্ণের রাসলীলা, বৈষ্ণবদের নামগান, মোহন্তদের চিত্র, নৃসিংহ অবতার, গোপীদের বস্ত্রহরণ দৃশ্য, সমুদ্র মন্থনে দেবাসুরের দল আরও বহু কিছু।

নন্দনতাত্ত্বিক এম শেঠ এক প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, ওই দুই মঠের ভিত্তিচিত্র অঙ্কনের কাজে শুকনো দেওয়ালে গোলা রং লাগানো হয়েছিল। শিল্পশৈলীর বিচারে দুই মঠের ভিত্তিচিত্রই সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীতে করা। এর মধ্যে বড়ো ওড়িয়া মঠের কয়েকটি ছবিতে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশের শিল্পের এবং গঙ্গামাতা মঠে যথাক্রমে মুঘল ও রাজপুতশৈলীর উপাদান রয়েছে। ও সি গাঙ্গুলীসহ অনেক শিল্পতাত্ত্বিকেরই ধারণা ওড়িশার মঠে মন্দিরে ভিত্তিচিত্রের ধারা প্রাচীন ঐতিহাসিক কালে বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত গুহাচিত্রেরই উত্তরসূরি। ওড়িশার কেওনঝাড় জেলার সীতাবিনজি গুহায় দ্বাদশ শতাব্দীতে অঙ্কিত যে রাজকীয় শোভাযাত্রার দৃশ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, বহু ঐতিহাসিকের মতে তা ওড়িশী শিল্পেরই আদি নিদর্শন।

ওড়িশার বহু প্রাচীন মন্দিরে মিথুন ভাস্কর্য আছে। পুরীর কাছাকাছি কোনার্কের সূর্যমন্দির ছাড়াও পুরীর মূল জগন্নাথ মন্দির বা বড়দেউলের বিভিন্ন স্থানে মিথুনমূর্তি যথেষ্ট সংখ্যক রয়েছে। একসময় অশ্লীলতার দায়ে চুন-বালির আস্তরণ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল জগন্নাথ মন্দিরের বহু মিথুনমূর্তি। পুরীর মন্দির স্থপতিদের উত্তরসূরি শিল্পী ভাস্কর ও মহারাণাদের দৃঢ় বিশ্বাস — যে-কোনো বড়ো মন্দিরেই মিথুনমূর্তি খোদাই করতে হয় চূড়া বা খিলানের আশেপাশে। কেননা মিথুনমূর্তি থাকলে সে জায়গায় বাজ পড়ে না। তাই দেউলকে বজ্রনিরোধক করার প্রয়াস এটি।

রঘুনাথপুরে এক বয়স্ক শিল্পীর ঘরে রাখা আছে প্রাচীন এক পুথির নকল। সড়জাতের রাজা উপেন্দ্র ভঞ্জের রচনা চৌষট্টিটি ওড়িয়া শ্লোকে রয়েছে চৌষট্টি প্রকারের আসন বা মিথুনভঙ্গির সচিত্র অনুপুঙ্খ বিবরণী। এ ধরনের প্রাচীন পুথি যাতে শিল্পের সচিত্র নির্দেশ রয়েছে, আছে পুরীজেলার কিছু পটশিল্পীর ঘরে।

লোকশিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পীরা পূর্বসূরিদের কাছে হাতেনাতে দেখে ও শুনে শেখেন। লোকশিল্পীদের কাছে শিল্প সবসময় জীবিকা না-ও হতে পারে। তবে কৃষিভিত্তিক সমাজই আদিতে লোকশিল্পের পৃষ্ঠপোশক। দরবারি শিল্পের চরিত্র এর থেকে কিছুটা আলাদা।

শিল্পের চর্চা, শিক্ষা বা শিল্পরীতি ক্রমশ ধরাবাঁধা লিখিত নিয়মে বাঁধা পড়ে, যার ফলে অনেকসময় আলাদা ঘরানা বা শৈলীর উদ্ভব ঘটে। রাজা বদলায়। যুগ পালটে যায়। দরবারি কাল অতিক্রান্ত। পটচিত্রকরদের রুজি জোগায় এখন তীর্থযাত্রীর দল, দেশ-বিদেশের পর্যটক কিংবা সরকারি অনুদান। গত কয়েক দশকে রঘুরাজপুর এবং পুরীর পটচিত্রকরদের ঘরে আবার শুরু হয়েছে কাজ, নতুন উৎসাহে। যোগ হয়েছে নতুন মাধ্যম ও কিছু নতুন ধারা। কিন্তু বিষয়বস্তু, আর রীতি এখনও বহু শতাব্দীর পুরোনো খাতেই বয়ে চলেছে। সেই স্রোতে টান শুধু বেড়েছে। শিল্পীদের ঘরে মেয়েপুরুষ মিলে যখন হেলাফেলার টানেটোনে গড়ে পুতুল বা পট, তখন সেই ধ্রুপদি শিল্পে মার্জিত হাতের তুলিতেই ঝলসে ওঠে সুন্দরের আর এক রূপ—লোকচিত্রের আদল।

শাহাব আহমেদ

রাশিয়া, সুবর্ণ অঙ্গুরীয় ও কম্যুনারকা

১১৪৭ সাল। মাস্কভা ও নেগ্লিন্নায়া ২ নদীর মোহনায় ৪ এপ্রিলের মধ্যদিন। ভোজ, আনন্দ–স্ফূর্তি ও উৎসবের হইচই চলছে। সুজদালের ক্ষমতাসীন প্রিন্স, ইউরি দোলগা রুকি (সহজ অনুবাদে যার অর্থ দাঁড়ায় 'লম্বা হাতের ইউরি') তার মিত্র চের্নিগভের প্রিন্স স্ভিয়াতোশ্লাভ ওলগোভিচকে নিয়ে বেড়াতে এসেছেন। গ্রামটির নাম কুচকোভা, জায়গাটি পছন্দ হয়ে গেল। কিন্তু মালিক এর স্থানীয় জমিদার স্তেপান কুচকো। রাজা–রাজরার মর্জি, প্রিন্স ইউরি কুচকোর সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট না করে সরল পথে গেলেন। তার শিরোশ্ছেদের আদেশ দিলেন এবং তার কন্যা উলিতাকে নিজ পুত্র আন্দ্রেইয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। কুচকোভা গ্রামটিকে পার্শ্ববর্তী নিজের জমির সঙ্গে সংযুক্ত করে পুরো জায়গাটির নাম দিলেন মাস্কভা। ১১৫৬ সালে আদেশ দিলেন এখানে একটি শহর গড়ে তুলতে। শহরের নাম মাস্কভা। এই মাস্কভাই হল মস্কো শহর। পৃথিবীর কিছু মানুষ তাকে ভালোবাসে, কিছু সমীহ করে, কিছু ঘৃণা করে। কিন্তু তাকে এড়িয়ে যেতে পারে না।

এই ঘটনার ৯৬৩ বছর পরে, ২০১৯ সালের জুন মাসের ১ তারিখে, মস্কো শহরে আমার দেখা হল কৈশোরের বন্ধু জেমসের সঙ্গে। 'আত্মার সঙ্গীত' জাগানো এই সাক্ষাত প্রায় পৌনে এক শতাব্দী পরে। সে ভলগোগ্রাদে থাকতো, ভলগার তীরে। পবিত্র সেই নদীর বহুজল সে দেখেছে মৃদু মৃদু ঢেউ তুলে তীরে এসে বিস্ফারিত হতে। রাশিয়ার ভালো সময়, মন্দ সময় কাটিয়ে এখন সে মূলত মস্কোতেই জীবিকা নির্বাহ করে। জেমসের স্ত্রী লরা। ভলগা তীরের সুন্দর, প্রাণবন্ত নারী। এদিক থেকে জেমসের ভাগ্য পেত্রার্কর ভাগ্যের চেয়ে ভালো। লরাকে নিয়ে শুধু কবিতা লিখে জীবন কাটাতে হয়নি।

বেচারা পেত্রার্ক!

ওরা দু'জনে আমাদের হোটেলে এসে উপস্থিত হয় বেশ সকালে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য প্রদর্শনের জন্য খ্যাত সোভিয়েত আমলের বিশ্ববিখ্যাত প্রদর্শনী কেন্দ্র ভে–দে–এন–খা'র অদূরেই হোটেল। জানালা দিয়ে দেখা যায় প্রথম মহাকাশযানের আকাশে উত্তোলন নিয়ে তৈরি সুন্দর ও সুউচ্চ ভাস্কর্য। এবং একটু দূরেই উঁচু ভিত্তির ওপরে দাঁড়ানো শ্রমিক ও কৃষাণীর কাস্তে হাতুড়ি হাতের জগদ্বিখ্যাত জীবিতের চেয়েও জীবিত শ্রমজীবী যুগল।

নাস্তা সেরে প্রস্তুত ছিলাম। বের হতে দেরি করিনি, কারণ সামনে ১২ ঘণ্টার সফর। ফোনে বলেছিলাম, 'জেমস, ইভান গ্রজনির সঙ্গে সাক্ষাত করিয়ে দিতে হবে।'

'সে কোথায়?'

'আলেক্সান্দ্রভ, ভ্লাদিমির জেলায়, মস্কোর থেকে বেশ দূরে।'

'আচ্ছা নিয়ে যাব, শুধু আলেক্সান্দ্রভ' নয়, সের্গেয়েভ পসাদ, পেরিস্লাভল শহরও দেখিয়ে আনবো।'

একেই বলে বন্ধু। মেঘ চাইতেই বৃষ্টি, গান চাইতেই 'পেরিপেল'। 'পেরিপেল' হল কোয়েল জাতীয় একধরনের পাখি, অতি সুন্দর গায়।

আমরা যাকে 'আইভান দি টেরিবল' বলে জানি, রুশরা তাকে ইভান গ্রজনি বলে ডাকে।

'গ্রজনি' শব্দের উৎপত্তি 'গ্রজা' থেকে, যার মানে বজ্র। বজ্রের মত যিনি, তিনিই 'গ্রজনি' বা বজ্রেশ্বর, গ্রিকদের জিউস। ক্রুদ্ধ হলে যিনি বজ্রপ্রজ্জ্বলিত ত্রিশূল দিয়ে আঘাত করেন। মানবের মধ্যে পৃথিবীতে একজনই এই উপাধি পেয়েছেন। ইংরেজি শব্দ 'টেরিবল' রুশ গ্রজনির সঠিক প্রতিপক্ষ নয়। যা হোক, মধ্যরাশিয়ায় 'জোলাতোয়ে কালৎসো' বা 'সুবর্ণ অঙ্গুরীয়' নামে কতগুলো শহর আছে। রাশিয়ার আদি ও মধ্যযুগের প্রাণঝর্ণা বয়ে গেছে এই স্বর্ণবৃত্তের মধ্য দিয়ে। উল্লেখিত তিনটি শহর এই আঙ্গুরিয়ের তিনটি চকচকে মাণিক্য।

মস্কো থেকে বের হওয়া ছিল কষ্টকর। জুনের প্রথম দিন, উষ্ণ ও সুন্দর। শনিবার। সবার 'দাচায়' (দাচা— শাকশব্জি ফলানোর জন্য একটুকরো জমিসহ গ্রামের গ্রীষ্মালয়) যাবার দিন, অন্যদিকে হাইওয়েতে চলছে হম্বিতম্বি কাজের অর্থচুরি। পাকা ২ ঘণ্টার গলা কেটে রাস্তা ফাঁকা পাওয়া গেল। পৌঁছলাম সের্গিয়েভ পসাদ (Sergiyev Posad) শহরে। বেশ পুরনো শহর। কিন্তু সোভিয়েত আমলে, নামটি কখনও শুনিনি। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত, জাগর্স্ক নাম দিয়ে আসল নামটি ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপরে অন্যান্য বহু স্থানের মতই পুরনো নামটি ফিরে এসেছে।

নিঃস্ব হয়ে যাওয়া কোনও এক ধনবানের দুই পুত্র স্তেফান ও বার্থোলমেই সন্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে গৃহত্যাগ করেছিল। রাদোনেঝ গ্রামের ছোট্ট একটি টিলার ওপরে প্রতিষ্ঠা করেছিল ছোট্ট ট্রিনিটি চার্চ। খৃষ্টধর্মে ট্রিনিটি হল ত্রিত্ব সত্তা (ঈশ্বর, ঈশ্বর পুত্র যিশু ও পবিত্র আত্মা)। পবিত্র আত্মা আদতে কী জিনিস আমি জানি না, আমার আত্মা পবিত্র বলেই ধারণা করি। যদিও নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না। তবে তা যে ত্রিত্বের অংশ নয়, এটা নিশ্চিত। এখানে দুই ভাইয়ের জীবন কাটে দুঃসহ কষ্টে। খাদ্য জোটে না, শীত জমিয়ে দিয়ে যায় এবং ভদকা–ভক্ত মানুষের তুলনায় ঈশ্বরভক্ত মানুষের সংখ্যা নগন্য। শেষ পর্যন্ত স্তেফান মস্কো চলে যায়।

বার্থোলমেই দৃঢ় ও কৃষ্ণধাতুর কঠিন মানুষ, তিনি সের্গেই রাদোনেঝস্কি (রাদোনেঝের সের্গেই) নাম নিয়ে 'ত্রইৎস্কি মনাস্টেরি' নামে ছোট একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ত্যাগী ও অত্যান্ত ভালো মানুষ ছিলেন তিনি। সুনামও ছিল খুব। লোকজন বিশ্বাস করতো তাঁকে। তাঁর আশ্রমে ধীরে ধীরে ধর্মান্বেষী লোকজন জড়ো হতে থাকে।

তাঁর নাম–ডাক ছড়িয়ে পড়ে দূর–দূরান্তে। ১৩৮০ সালে মস্কোর প্রিন্স দিমিত্রি দনস্কোয় কুলিকভ যুদ্ধে যাওয়ার আগে আশীর্বাদ নিতে আসেন। সের্গেই রাদোনেঝকি আশীর্বাদ করেন। জগদ্দল পাথরের মত বুকে চেপে থাকা তাতার–মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে রুশদের বিশাল বিজয় হয় কুলিকভের মাঠে। রাশিয়ার ইতিহাসে মোড় ঘুরিয়ে যায়। রুশরা সাহসী হয়ে ওঠে, অজেয় মঙ্গোলদের জোয়াল ছুড়ে ফেলার স্বপ্ন বাস্তব হয়ে ওঠে। সের্গেই রাদোনেঝস্কির জীবৎকাল ১৩১৪ থেকে ১৩৯২ সাল। পরে তাঁকে 'সেইন্ট' হিসাবে গ্রহণ করা হয়। সের্গিয়েভ পাসাদ শহরের চারিদিকের কাঠের দুর্গ ভেঙে ১৫৪০–১৫৫০ সালে জার ইভান গ্রজনির নিজস্ব তদারকিতে ১২টি স্তম্ভে সমৃদ্ধ পাথরের দেওয়াল ঘেরা দুর্গ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

মঙ্গোলদের বিতাড়িত করে তাদের রাজধানী 'কাজান' দখল সম্পন্ন করার পর ইভান গ্রজনি আদেশ দেন, মস্কো ক্রেমলিনের অভ্যন্তরে অবস্থিত 'উসপেনস্কি ক্যাথেড্রাল'–এর মতো এখানেও একটি বিশাল ক্যাথেড্রাল তৈরি করার। ১৫৫৯ সালে শুরু করে ১৫৮৫ সালে সম্পন্ন করা হয় এই বিশাল কাজ। তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। বলা হয়ে থাকে, ক্রোধের বশে হাতের রাজদণ্ড দিয়ে আঘাত করে জেষ্ঠ্য পুত্রকে হত্যা করার

প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে তিনি এই ক্যাথেড্রাল তৈরি করেন। যেন তার ছেলের স্মৃতিসৌধ।

সের্গিয়েভ পাসাদ ১৬০৮–১৬১০ সালে অসামান্য বীরত্বে পোলিশ–লিথুনিয়ানদের ১৬ মাসের অবরোধ সহ্য করে টিকে থাকে। অল্পবয়সী পিটার দি গ্রেটও বিপদের টের পেলে এখানে এসে আত্মগোপন করে থাকতেন। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রচালনার প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো তিনি এখান থেকেই শুরু করেন। ১৭৮২ সালে শহরের অফিশিয়াল নাম হয় 'সের্গিয়েভ পাসাদ।' এই হল রুশ অর্থডক্স বা 'প্রাভাশ্লাভনি' চার্চের ভ্যাটিকান। চার্চের মুখ্য পোপ (Patriarch) থাকেন এখানে। রাশিয়ার সুন্দর ঝকঝকে–তকতকে স্বর্ণমণ্ডিত গির্জাগুলো দেখে মুগ্ধ হওয়ার পাশাপাশি প্রশ্ন জাগে, শ্রমিক–কৃষক ও সাধারণ মানুষের সম্পদ কেন তাদের পকেটে নেই, এই অর্থ যায় কই?

সোভিয়েত আমলে যেত চার্চ ভাঙতে ও অস্ত্র বানাতে, এখন যায় চার্চ গড়তে ও অস্ত্র বানাতে।— যেন সের্গেই রাদোনেঝস্কির আত্মা কথা বলে।

আমরা সের্গিয়েভ পাসাদ ঘুরে ঘুরে দেখি। জাঁকজমকে রাশিয়ান চার্চের সমান্তরাল কিছু নেই। ওই চার্চে গেলেই বোঝা যায় ঈশ্বর রুচিসম্পন্ন, চাকচিক্যে মুগ্ধ, সৌন্দর্য–পিয়াসী বিলাসি সত্তা। তার সাদামাটা দেওয়াল, মিম্বর, মিনার বা গম্বুজে মন ভরে না। তার চাই সোনা, সুন্দর ফ্রেস্কো আর নানা ধরণের আইকনের সাজ–সজ্জা। মানুষের চোখ যা ঝলসে দেয় না, তা তার চোখে পড়বে না এটা ওরা ভালো করে জানে। সেখানে মোমবাতি জ্বলবে, ঘণ্টা বাজবে, মা মারিয়া কাঁদবেন, তেজস্বী সন্তগণ তাকিয়ে থাকবেন— এর কোনওটাই বাদ দেওয়া যাবে না। এখানে সবটাই আছে, মুখ্য ক্যাথেড্রালের ভেতরে সুবর্ণখচিত দৃষ্টি অন্ধ করা সৌন্দর্য। বহু বিখ্যাত আইকন ও ফ্রেস্কো দিয়ে শোভিত দেওয়াল ও সিলিং। সের্গেই রাদোনেঝস্কি শুয়ে আছেন এখানেই। নীরব হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়াই তার পাশে। মানুষটি নেই, কিন্তু কীর্তি আছে।

এখানেই কাজ করতেন রাশিয়ান লিওনার্দো দা ভিঞ্চি নামে খ্যাত প্রফেসর এবং ধর্মযাজক ফাদার ফ্লোরেন্সকি, রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। তাঁর সময়কার শ্রেষ্ঠ ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার ও ম্যাথমেটিশিয়ানদের একজন। তাঁর অজস্র মৌলিক আবিষ্কার রয়েছে, যা ছিল সে সময়ের জন্য খুবই অগ্রগামী। আমার 'লেনিনগ্রাদ থেকে ককেশিয়া' বইতে তাকে নিয়ে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় রয়েছে। সমাজতন্ত্র বিনির্মাণের উন্মত্ততার যুগে আরও অসংখ্য মানুষের মতো তাঁকেও কারাগারে হত্যা করা হয়েছিল। কারণ কারোর কারোর মনে হয়েছিল, হয় তিনি ভেজাল বৈজ্ঞানিক, নয় ভেজাল ধর্মযাজক অথবা ভেজাল আপাদমস্তক। খুব বেশি মেধাবী হওয়া যে নিরাপদ নয়, রাশিয়ার লোকজন এই ব্যাপারে খুব সচেতন।

আমরা গাড়িতে চড়ে বসি পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশে। দু'দিকে ঘন বন। গাড়ির চাকায় দ্রুতি আর রৌদ্রময় দিন বাইরে। পরিষ্কার নীল আকাশ। মনে পড়ে ঢাকা কলেজের কথা। আমাদের ৫ বন্ধুর একটি পঞ্চপাণ্ডব চক্র ছিল। ছিলাম হরিহর আত্মা। একসাথে সময় কাটাতাম, ক্লাশ করতাম, একই আদর্শের মায়ামৃগের পেছনে ব্যানার হাতে মিছিলে ছুটতাম। পৃথিবীর পথে ছড়িয়ে পড়ার আগে ৫ বন্ধু একবার বোটানিক্যাল গার্ডেনে পিকনিকে গিয়েছিলাম। গার্ডেনের সীমানার বাইরে তখন বিল ছিল জলে ভরা। সবুজ দাম দলের মাথায় বাতাস হাত বুলিয়ে দিয়েছিল। বিলের বুকে ছিল কিশোর–কিশোরীর বুকের কম্পনের মত তরঙ্গ–শিশুরা।

কী যে হৃদয়–হরণীয় দৃশ্য! আমরা সাথে নেওয়া মাংস–পরোটা চেটেপুটে খেয়ে একে অন্যের কাঁধে হাত দিয়ে হাঁটছিলাম আর গান গাইছিলাম (অবশ্যই হেড়ে গলায়)। একমাত্র মামুন ছাড়া আর কেউ গান গাইতে পারতো না। মামুন মাউথ অর্গান বাজাতো এবং তার সুর প্রকৃতির সেই নির্জন দ্বীপটিকে করেছিল মুখরিত। সুন্দর দিন হয়েছিল আরও সুন্দর। বয়েস ছিল অল্প, চাওয়া ছিল ছোট্ট, কিন্তু আনন্দ ছিল বিশাল। হাওয়া ছিল, পাখি ছিল, গাছ ছিল আর ছিল গাছ–পাথর স্বপ্নেরা। ১৯৮১ সাল। আজকের পৃথিবীর দিক থেকে তাকালে মনে হয় যেন মান্ধাতার কাল। মান্ধাতা যে কবে বেঁচেছিল সেই শুধু জানে। হবে নিশ্চয়ই অনেক অনেক আগে।

সেই দিনের পরেই আমরা বন্ধুরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জনপদে। মামুন, কচি গেছে জিডিআর, আমি, জেমস আর নিশীথ লেনিনের দেশে। ওই দেশগুলোর একটিও আর নেই, হারিয়ে গেছে, যেমন রৌদ্রে হারিয়ে যায় ভোরের কুয়াশার ধোঁয়া, মাসকলাই পাতায় নিঃশব্দে উবে যায় শিশিরের ঝিকিমিকি। সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন ছিল, স্বপ্ন মমি হয়েছে। সেই স্বপ্ন-মৃত্যুর কথা আজও বলি, কারণ ম্যামথ যুগের শুঁড় নাড়ানো আরশোলার মত আমরা এখনও বেঁচে আছি এবং থাকবো আরও কিছুকাল।

জেমস রয়ে গেছে রাশিয়ায়। রাশিয়ার শীতের কারণে নয়, ভালোবাসার কারণে। যৌবনে ভালোবাসা নারীর আঁচল বা স্কার্টের ছায়ায় ফোটা ড্যাফোডিল যেন, কিন্তু সময়ে উপলব্ধি হয় ভালোবাসা আরও আছে। কোনও দেশ, কোনও ভাষা, কোনও সংস্কৃতি, কোনও ইতিহাসকেও ভালোবাসা যায়। ভালোবাসা যায় ইতিহাসের মৃত্যুর শোক-উৎসবে কান্না ও হাসিতে বিভ্রান্ত মানুষেদের।

আমি চলে গেছি নষ্ট ও ভ্রষ্ট আমেরিকায়। শোষণ যার মোটো। যে একদিনের জন্য ভুলেও সাম্য, স্বাধীনতা বা শোষণমুক্তির প্রতিশ্রুতি দেয়নি। বলেছে, 'আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি।' কিন্তু ঈশ্বর হল অনর্থের অর্থ, সবলের কিরিচ, দুর্বলের বিশ্বাসের আশ্রয়। এবং যা বিত্তবান ও অস্ত্র ব্যবসায়ীদের জন্য ভালো, তা ঈশ্বরের জন্যও ভালো। ঈশ্বর আকাশের সর্ববীক্ষক উপগ্রহ বা নিউক্লিয়ার সাবমেরিন, গণতন্ত্র তাদের নিরাপদ পোতাশ্রয়।

মামুন এখন জার্মানিতে, কচি আয়ারল্যান্ডে, নিশীথ আমেরিকায় স্ব স্ব জীবন সংগ্রামে ধাবমান অশ্বের মত। তৃতীয় বিশ্বের মেধা, বাংলার সোনালি লতায় গাঁথা হৃদয় পুঁতির মালা, একই সূত্রে আবদ্ধ হয়ে একই ঈশ্বরকে স্যালুট দিই সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে সকাল এবং স্বদেশ নিয়ে নস্টালজিয়ায় কাতরতা বোধ করি।

ছোট শহর আলেক্সান্দ্রভ। কিন্তু কী দাপট ছিল এই শহরের! সারা রাশিয়া কাঁপতো এর ক্ষমতার দম্ভে। ১৭ বছর এটি ছিল 'ডি ফ্যাক্টো' রাশিয়ার রাজধানী। এখানেই ইভান গ্রজনি ইংল্যান্ড, সুইডেন, ক্রিমিয়া, নেদারল্যান্ড, লিথুনিয়া, ভ্যাটিকান-সহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং বহু আন্তর্জাতিক চুক্তি এখানে বসেই স্বাক্ষর করেছেন।

স্থানটি আলেক্সান্দ্রোভস্কায়া স্লাবোদা নামে পরিচিত ছিল। জার রাশিয়া ছিল জমিদারদের দেশ এবং ভূমিদাসেরা ছিল তাদের মালিকানাধীন সেবক প্রাণী বিশেষ। কিছু গ্রাম ছিল যার অধিবাসীরা ছিল জমিদারদের অধীনতামুক্ত এবং মূলত সরকারী কর্মচারি। এই গ্রামগুলোকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্য 'স্লবোদা' বলা হতো।

১৫১৩ সালে রাজা তৃতীয় ভাসিলি 'আলেক্সান্দ্রোভস্কায়া স্লাবোদা'য় একটি দেওয়ালঘেরা সুরক্ষিত দূর্গ বা 'ক্রেমলিন' তৈরি করেন। তার ভেতরে তৈরি করেন জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ। মস্কো থেকে এসে শিকার করা ও সের্গিয়েভ পাসাদ গির্জায় প্রার্থনা করতে যাওয়ার জন্য খুবই সুবিধাজনক স্থান। তারই পুত্র ইভান গ্রজনি। শৈশবের বহু স্মৃতি বিজড়িত এই স্থানটি ছিল তার প্রিয় এবং ১৫৬৪ সালে 'বায়ার' বা অভিজাতদের ওপর আঘাত হানার মাষ্টার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে বিশ্বস্ত লোকজন নিয়ে গোপনে মস্কো শহর ত্যাগ করে এখানে চলে এসেছিলেন।

১৭ বছর ছিলেন আলেক্সান্দ্রভে। 'রক্তপিপাসু শহর' (ক্রোভো-পিইয়িস্তভিন্নি গ্রাদ) নামে পরিচিত এই শহরে বসেই তিনি চালিয়েছিলেন অভিজাত নিধনের সন্ত্রাস। ইতিহাসে যার নাম 'অপ্রিচিনা।' রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত যে কোনও সন্ত্রাস সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করে সেই দেশের সাধারণ মানুষকে। এখানেও তাই হয়েছিল। উন্মত্ত জনতা হত্যা করেছে নিরীহ জনতাকে, জলিল করিমকে, করিম মাধবকে কিন্তু বেশিরভাগ সৈয়দ, খান ও খন্দকারেরা রয়েছে স্পর্শের বাইরে। জনগণের চোখে ধুলো দিয়ে এবং অপরিশীলিত, অশিক্ষিত ও অন্ধ জনতাকে উত্তেজিত করে নিজের দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধে কীভাবে রক্তাক্ত নৃশংস সন্ত্রাস চালাতে হয়, তার কলাকৌশল রাশিয়ায় সূত্রবদ্ধ করেন ইভান গ্রজনি।

তিনিই আধুনিক রুশ রাষ্ট্রের জন্মদাতা। তিনি তাতার মঙ্গোল শোষণের জোয়াল থেকে মুক্ত করে খণ্ড-বিখণ্ড, পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধরত রাজ্যগুলোকে একত্র করে রাশিয়াকে ইয়োরোপের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করে সর্বপ্রথম 'সারা রাশিয়ার জার' উপাধি গ্রহণ করেন। আলেক্সান্দ্রভে থাকতেই রাগে উন্মত্ত হয়ে তিনি তাঁর বড় ছেলেকে হত্যা করেন। তারপর ১৫৮১ সালে সেই যে তিনি এই স্থান ত্যাগ করেন, আর ফিরে আসেননি।

আলেক্সান্দ্রভে ১৬৫১ সালে 'উসপেনস্কি নারী আশ্রম' (মনাস্টেরি) তৈরি করা হয়, যা এখনও সক্রিয়। এটি জার পরিবারের মেয়েদের জন্য জেলখানা হিসাবে ব্যবহৃত হতো। পিটার দি গ্রেট তার বোন মার্থাকে মাথা ন্যাড়া করে বন্দি করে রেখেছিলেন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশ নেওয়ার জন্য। পিটারের মৃত্যুর পরে তার কন্যা এলিজাবেথ ১০ বছর এখানেই নির্বাসিত ছিলেন। পরে শুভ নক্ষত্র সংযোগে তিনি রাশিয়ার সিংহাসনে আসীন হন।

এই ক্রেমলিনের ভেতরে আজও অনেকগুলো ঐতিহাসিক ইমারত ও চার্চ রয়েছে, যেগুলোর প্রায় সবই এখন মিউজিয়াম। আর ইভান গ্রজনির বাসস্থানের আন্ডারগ্রাউন্ডে রয়েছে নিপীড়নের বিভিন্ন যন্ত্র। তিনি মেঝেতে জানু পেতে বসে দিনের বেশিরভাগ সময় ঈশ্বরের উপাসনা করতেন, রোজা রাখতেন, এরই ফাঁকে ফাঁকে রাজ্য চালনা করতেন এবং সময় সময় আন্ডারগ্রাউন্ডে নেমে গিয়ে নির্যাতন ও স্বীকারোক্তি আদায় প্রক্রিয়ার তদারকি করতেন। এখানেই তার বিশ্বস্ত ডান হাত, অপ্রিচিনার প্রধান মালিউতা স্কুরাকভ, সারা রাশিয়ার অর্থোডক্স চার্চের মুখ্য এপিস্কোপ ফিলিপকে গলা টিপে হত্যা করেছিল জারের নির্দেশে।

এখানকার মুখ্য চার্চ উসপেন্সকি ক্যাথেড্রালে ঢোকার দক্ষিণ ও পশ্চিম ফটকগুলি খুবই সুন্দর। এদের লুণ্ঠন করে আনা হয়েছে ভেলিকি নভগরদ শহরের সোফিয়া ক্যাথেড্রাল এবং তেভের শহরের স্পাসো-প্রেব্রাঝেনস্কি ক্যাথেড্রাল থেকে। ইভান গ্রজনির অপ্রিচনিকিরা তাঁকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে, এই দুই শহরের লোকজন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। ফল হয় হুতাশনে ঘি ঢালার মত। জার এদের শায়েস্তা করার জন্য অভিযানে বের হন। দুই শহরের অধিবাসিদের নির্বিচারে নিপীড়ন, প্রহার ও হত্যা করা হয় নারী, শিশু, বৃদ্ধ বাছ-বিচার না করে। এই দুই শহরের পথে যে শহরগুলো পড়ে তরঝক, ক্লিনা, পস্কভ ইত্যাদিও রক্ষা পায় না। ভেলিকি নভগরদ ছিল স্বাধীন এবং মস্কোর আধিপত্য না মানা উদ্ধত ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক। তিনি কেরোসিন ছিটিয়ে নভগরদ পুড়িয়ে দেওয়ার আদেশ দেন। অগ্নিদগ্ধ, মৃত, অর্ধমৃত নাগরিকদের ভলখভ নদীতে ছুড়ে ফেলা হয়। ফেলার আগে শিশুদের মায়ের দেহের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। কয়েক সপ্তাহ নদীর জল থাকে আবির লাল ও ভাসমান লাশে পরিপূর্ণ। ঘোড়ার গাড়ির পরে গাড়ি পূর্ণ করে আলেকসান্দ্রভে নিয়ে যাওয়া হয় এই শহরের ধনসম্পদ।

ক্রেমলিনের ভেতরে একটি ছোট্ট চার্চ আছে ৫০ মিটার উঁচু সুন্দর ঘণ্টা-স্তম্ভ সহ। জার গ্রজনির আদেশেই এটি তৈরি করা হয়। কথিত আছে, 'রুশ-ইকারুশ' ভূমিদাস নিকিতা পাখির পালক ও কাঠ দিয়ে পাখা বানিয়ে মোমের সাহায্যে গায়ে লাগিয়ে ওড়ার চেষ্টা করেছিল এই উঁচু স্তম্ভ থেকে ঝাঁপ দিয়ে। জার গ্রজনি তার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে উপস্থিত ছিলেন 'উজবুকি' কাণ্ড দেখার জন্য। নিকিতার উড়াল ব্যর্থ হয়। পার্শ্ববর্তী ছেরা নদীতে পড়ে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেও জার গ্রজনির ধারণা হয় এমন 'উদ্ভট চিন্তা' নিকিতার উর্বর মাথা থেকে আসেনি। নিশ্চিত তার ওপর শয়তানের ভর হয়েছে। তিনি আদেশ দেন ওর শিরশ্ছেদ করে শয়তানকে শায়েস্তা করার। তার দেহ টুকরো টুকরো করে শুকরকে খেতে দেওয়া হয়। ফেলে যাওয়া পাখাগুলো গির্জার পবিত্র জলে ধুয়ে এবাদত প্রার্থনা সেরে পুড়িয়ে ফেলা হয়। যার ওড়ার ইচ্ছা তীব্র, তার যে আসলে সত্যিকারের পাখা থাকতে হয় এবং না থাকলে এমন স্বপ্নচারী ও অকর্মন্য দাসদের ওড়াতে হয় ধারালো ধাতুর পাখায়, একটু বেশি আগে জন্মানোর কারণে নিকিতার তা জানা ছিল না।

১৫৬৯ সালে এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় রাশিয়ার প্রথম ছাপাখানা এবং তাদের প্রথম বইও প্রকাশিত হয় এখান

থেকে। আলেক্সান্দ্রভ দেখা শেষ করে আমরা আবার যাত্রা করি।

মস্কো থেকে ১৪০ কিমি দূরে অবস্থিত পেরিশ্লাভল অত্যন্ত প্রাচীন শহর। রাশিয়ার মহত্তম সন্তানদের অন্যতম, আলেক্সান্দার নেভস্কি এই শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সভ্য, সুবোধ ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হওয়ার আগে নেভা নদীপথে এসে সুইডিস এবং জার্মানরা রাশিয়া আক্রমণ করতো প্রায়ই। ১২৪০ সালে তার নেতৃত্বে রুশ বাহিনী প্রথমে সুইডিশদের, পরে জার্মানদের পরাজিত করে নেভা নদীতে। সেই থেকে তার উপাধি হয় নেভস্কি। শত্রুর বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে তিনি জনগণের হৃদয়কে এতটাই আপ্লুত করেন যে, মৃত্যুর পরে রুশ অর্থডক্স চার্চ তাকেও একজন সেইন্ট বা সন্ততে উন্নীত করে।

এখানে প্লেশ্চেভা হ্রদ সমুদ্রের মতো বিশাল। মস্কো শহরের প্রতিষ্ঠাতা ইউরি দোলগা-রুকি ১১৫২ সালে অদূরবর্তী ক্লেশ্চিন শহরকে ক্রবেঝ নদী ও প্লেশ্চেভো হ্রদের মোহনায় নিয়ে আসেন এবং শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে শহরের চারিদিকে ২.৩৫ কিমি দীর্ঘ ও ১৮ মিটার উঁচু মাটির টিলা তৈরি করেন। সেই সময়ের রাশিয়ায় এই ধরনের বিশাল স্থাপত্য আর ছিল না। পরে ইভান গ্রজনি পেরিশ্লাভল জয় করে ঐকবদ্ধ রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেন। ৫০০ বছরের গৌরবময় উপস্থিতির কালে এই শহর লুণ্ঠিত ও নিঃস্ব হয় ১২ বার। ৫ বার তাতার-মঙ্গোলদের হাতে, ৫ বার অন্য রুশ রাজ্য ও ২ বার পোলিশদের হাতে। কিন্তু প্রতিবারই শহর নতুন করে গড়ে ওঠে ফিনিক্স পাখির মতো। অন্যান্য রুশ শহরের মতই পেরিশ্লাভল অসংখ্য সুন্দর সুন্দর গির্জা দিয়ে সাজানো। বেশিরভাগই অত্যন্ত প্রাচীন।

৬৫০ বছর পুরনো নিকোলস্কি মনাস্টেরি বোমা মেরে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ঈশ্বর বিতাড়ন উৎসবের অংশ হিসাবে ১৯২৩ সালে। তা নতুন করে তৈরি করা হয়েছে কিছুদিন আগে। বরিসো-গ্লেবস্কি মনাস্টেরিরও হয়েছিল একই ভাগ্য, এখনও তা পুনর্নির্মাণ হয়নি, তবে রাশিয়ায় এখন চার্চের যে বিজয়-উৎসব ও ক্ষমতার বিস্তার চলছে, তাতে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে হয় না।

১৬৮৮ সাল থেকে পিটার তার নৌবাহিনী গড়ার প্রাথমিক পর্যায়ে জাহাজ তৈরি করে তা প্লেশ্চেভ হ্রদে পরীক্ষা করা শুরু করেন। সেই সময়কার একটি জাহাজ এখনও সংরক্ষিত রয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব শহর এই পেরিশ্লাভল। জলকেলি, রৌদ্রস্নান, ঘুড়ি ওড়ানোর জনপ্রিয় স্থান হিসাবে গ্রীষ্মে নাকি এখানে লোক গিজগিজ করে। গ্রীষ্মের প্রথম দিনে আমরা উপস্থিত হয়েছি। হ্রদের তীর ঘেঁষে তাঁবু উত্তোলনের উৎসব শুরু হয়ে গেছে। স্তালিনের আমলে নিষ্পেষিত, ক্ষুধাপীড়িত এবং আত্মহত্যার মাধ্যমে নির্বাপিত কবি মারিনা স্ভেতায়েভা তার বোনকে নিয়ে এই শহরে বাস করেছেন কিছুদিন এবং এখানে একটি মিউজিয়াম তৈরি করা হয়েছে।

পেরিশ্লাভল শহরের বাইরে প্লেশ্চেভো হ্রদের অন্য তীরে যে পাহাড় আছে। আলেক্সান্দার নেভস্কির নামানুসারে তার নাম দেওয়া হয়েছে আলেক্সান্দার পাহাড়। এই পাহাড়ের পাদদেশে প্রায় ১২ টন ওজনের একটি বিশাল পাথর রয়েছে। নাম তার 'সিন-কামেন'। সিন মানে নীল এবং কামেনের অর্থ পাথর। ধারণা করা হয়, ইতিহাসের জন্মেরও আগে কোনও বরফ প্রবাহে কোনও বিশাল বরফের চাঙর পাথরটি বয়ে এনেছে কোন্ অজানা থেকে। শ্লাভদের আগে এখানে বাস করতো 'মেরিয়ান' জাতি। তারা এই পাথরের পুজো করতো। শ্লাভরাও তাদের পুজো-পার্বনের অনুষ্ঠান করত এই পাথরের কাছে। খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার পরেও দীর্ঘদিন এই ট্র্যাডিশন চলতে থাকে। ১৭ শতাব্দীতে চার্চের নির্দেশে পাথরটি মাটির নীচে পুতে ফেলা হয়। কিন্তু তা ধীরে ধীরে ফের মাটির ওপরে চলে আসে। ১৭৮৮ সালে পাথরটিকে হ্রদের জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯ শতাব্দীর মাঝামাঝি তা আবার জলের ওপরে চলে আসে। সেই থেকে এই পাথরকে পবিত্র বা ভেল্কির পাথর গণ্য করা হয়। আগে নাকি উন্মুক্তই ছিল, এখন ইউনিভার্সাল মুনাফার যুগে একদল 'মজিদ মিয়াঁ' লাল সালুর ব্যবসা ফেঁদেছে।

বেড়া দিয়ে ঢেকে টিকিট কাটার বন্দোবস্ত করেছে। সেখানে আমাদের মত উল্লুক প্রচুর। তাদের ভিড়ে লাইন আর নড়ে না। ফলে আমাদের পাথর দেখার পরিকল্পনা বাদ দিতে হয়।

বেশ রাতে আমাদের হোটেলে নামিয়ে দিয়ে জেমস ও লরা ফিরে যায়।

কম্যুনারকায় এক অপরাহ্ন

প্যাট্রিস লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশি ছাত্র–ছাত্রীদের অতিপ্রিয় মিকলুখা মাকলায়া রাস্তা ধরে ড্রাইভ করে মস্কোর মেট্রো তপ্লি স্তান অতিক্রম করে কয়েক মাইল গেলে একটি নির্জন বন দেখা যায়। তার সামনে সাইনটি এতই ছোট যে, এই বনে ঢোকার সরু নির্জন রাস্তাটি খুব সহজেই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। আমাদেরও হয়েছে তাই।

আমরা মিস করে বহু ঘোরাঘুরি করে অবশেষে পৌঁছেছি।

মস্কোর বন্ধু, সালাম খানকে বলেছিলাম, 'মস্কো আসবো কম্যুনারকায় যাওয়ার জন্য।'

সারা বিশ্বের অন্য সবার মত উনিও প্রশ্ন করেছিলেন, 'কম্যুনারকা কী?'

বলেছিলাম, 'চলুন স্বচক্ষে দেখবেন।'

সালাম ভাইয়ের জ্বর ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি আমাদের নিয়ে গিয়েছেন প্রতিশ্রুত জায়গায়। আমি 'লেনিনগ্রাদ থেকে ককেশিয়া' বইতে কম্যুনারকা নিয়ে দুটো চ্যাপ্টার লিখেছি। বইটি প্রকাশনায় যাওয়ার আগে তথ্যের সত্যতা জানার জন্য নিজে কম্যুনারকা ভ্রমণ করবো। সেই ইচ্ছে নিয়েই আমেরিকা থেকে রাশিয়ায় এসেছি। ভালো স্বামীরা স্ত্রীকে সিনেমা, থিয়েটার বা রেস্টুরেন্টে নিয়ে যায়, 'হরর' ক্ষেত্রে নিয়ে যায় পাগলে। সত্যের সন্ধানে যাদের শুধু ঢিলই জোটে না, স্ত্রীর গালমন্দও জোটে। কিন্তু আজ তার চোখে অশ্রু দেখেছি, এ তো তার দেশ। বলে, 'আমি তো কোনওদিন নামও শুনিনি এই কম্যুনারকার, তুমি জানো কী করে?'

অশ্রু ছিল আমারও চোখে। ৩/৪ শতাব্দী আগে এই বনে একটি ছোট নদী ছিল অর্দিনকা নামে। এখন তার শুকনো গতিপথের স্কেলিটন আছে, নদী নেই। আর ছিল একটি নির্জন ঘর বা 'দাচা', কোনও এক জমিদারের। 'দাচা'টি বিপ্লবের পরে বড়লোক বিতাড়ন পর্বে এন–কে–ভি–ডি'র (রুশ গুপ্ত সংস্থা, কেজিবির পূর্বসুরি) সুপ্রিম কর্মকর্তা গেনরিখ ইয়াগোদার তত্ত্বাবধানে আসে। সেই বিশাল সাম্রাজ্যের 'বরারোহ বারনারীদের' নিয়ে এখানে সময় কাটাতে আসতো। পাখির কূজন, পাতার গুঞ্জন, নদীর কুলুকুলু— নারীসঙ্গের জন্য খুবই উপযুক্ত স্থান। বিশেষ করে সারা সোভিয়েত ইউনিয়নব্যাপি যে সন্ত্রাস তাকে চালাতে হচ্ছিল, সেই মহাকর্মকাণ্ড সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য বিশ্রাম তার প্রাপ্য ছিল। কমরেড স্ট্যালিন ছিলেন তার নিয়োগ–কর্তা, এবং ১৯২৮–১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ইয়াগোদাই ছিল সমাজতন্ত্রের মুখ্য লাঠিয়াল। 'কাজ ফুরালে পাজি' হয়ে যাওয়ার পরে কমরেড স্ট্যালিন তাঁর এই প্রিয়পাত্রটিকে ১৯৩৭ সালে ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠান। নিকোলাই ইঝভকে বসান ইয়াগোদার স্থানে। ইঝভ শুরু করে 'ইঝভসিনা'। ১৯৩৭–১৯৩৮ সাল ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের তীব্রতম নিপীড়ন ও বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সময়। ইঝভ কম্যুনারকাকে বধ্যভূমি হিসাবে ব্যবহার করে। তবে তার চেয়েও বেশি করে অন্যত্র হত্যা করা লাশ এনে গণকবর দেওয়ার স্থান হিসাবে।

যাদের এখানে হত্যা করা হয়, তাদের বেশিরভাগই ছিল মার্কসবাদ ও সমাজতান্ত্রিক ন্যায় সমাজে বিশ্বাসী, মূলত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মঙ্গোলিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। তাদের দেশের শত্রু, বিদেশের চর, ট্রটস্কিপন্থী ইত্যাদি ইত্যাদি কী নয়? এমন বিভিন্ন অভিযোগে হত্যা করা হয় তাদের। সারি সারি বার্চ বৃক্ষের কাণ্ডে লেখা আছে নিহতদের নাম।

তাদের মধ্যে কিছু ১৬–২২ বছর বয়েসের স্কুল বা কলেজ ছাত্রের নামও দেখেছি। এত কচি কচি শিশুরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার ২০ বছর পরে এবং জার বংশের আন্ডাবাচ্চা–সহ প্রতিটি মানুষকে হত্যা করার ১৭–১৮ বছর পরে কী করে দেশের শত্রু হতে পারে, তা আমার হিসেবে মিলে না। হয়তো আমি

মার্কসবাদ শিখতে গিয়ে ফাঁকি দিয়েছি, 'কোর' সত্তায় তাকে অনুধাবন করতে পারিনি।

এক অন্তহীন দেওয়ালে তালিকা রয়েছে অগুনিত 'শত্রুর'। নিকোলাই বুখারিন, আলেক্সেই রীকভ, আইজ্যাক বেবেল, মঙ্গোলিয়ার কয়েকজন প্রেসিডেন্ট এবং কমিউনিস্ট পার্টির মূল নেতা এখানে নিহত বা গণকবরস্থ হন। যারা জানেন না, তাদের জন্য নিকোলাই বুখারিন ছিলেন লেনিনের প্রিয়পাত্র, মার্কসবাদের বড় তাত্ত্বিক জনপ্রিয় বলশেভিক নেতা, আলেক্সেই রীকভ লেনিনের পরে দ্বিতীয় সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট আর আইজ্যাক বেবেল ছিলেন বিখ্যাত লেখক। যারা সোভিয়েত ইউনিয়নে খুনিদের হাতে কোটি কোটি বা লক্ষ লক্ষ গণহত্যার সংখ্যায় আপত্তি প্রকাশ করে কিন্তু কয়েক হাজার হত্যায় বিশেষ কোনও অপরাধ দেখে না তাদের জন্য সুখবর আছে। কম্যুনারকায় আমি জানতাম ১১–১৭ হাজার মানুষের গণকবর রয়েছে, কিন্তু এখানে এসে তথ্যবোর্ড থেকে জানলাম ১১–১৭ হাজার নয়, মাত্র ৬৬০৯। এ তো নস্যি! মানবতা মুক্তির এতবড় স্বপ্ন সফল করার জন্য এই সামান্য জীবনের অপচয়, কোনও হিসাবেই আসা উচিত নয়।

কোটি কোটি হলে কথা ছিল। অবশ্য কী কথা, বলা মুশকিল।

যারা খুন করেছে তারাই দেশ শাসন করেছে ৭০ বছর এবং লাল মলাটের ইতিহাস লিখেছে। কোন কালে, কোন দেশে, কোন ক্ষমতাসীন পার্টি তাদের কৃত অপরাধগুলো স্বীকার করে গেছে? সোভিয়েত ইউনিয়নে এমন কম্যুনারকা ছিল অসংখ্য। কিন্তু তাই বা এমন বেশি কী? শ্রেণিসংগ্রাম কি শত্রুকে হত্যা করতে নিষেধ করে?

শত্রু কে?

যে আমার মত ও পথের সঙ্গে একমত নয়, হোক সে মার্কসের বাপ।

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে বেঞ্চে এসে বসলাম। নির্জন বনের নিহত আত্মাদের পাহারাদার একটি বিড়াল এসে আমার পায়ে পিঠ ঘষতে ঘষতে এক সময় শুয়ে পড়ল পায়ের কাছে। মানুষ মানুষকে হত্যা করে ধর্ম ও আদর্শের নামে, অথচ আমি ধর্ম ও মহান আদর্শবিচ্যুত একজন মানুষ, পথের একটি নোংরা বিড়ালকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিতে পারিনি। যে দুর্বল বিড়ালকেও লাথি মারতে পারে না, সে যে শ্রেণিশত্রুকে হত্যা করতে পারবে না, তা সরল সজারুও বোঝে। তাহলে কী তার উপযোগিতা মহামুক্তির মোহস্বপ্নদ্রষ্টাদের সমাজে?

এমন মানুষকে কলম ধরতে দেওয়া পাপ। তাই সমস্বরে চিৎকার করে বলা দরকার মহান মিখাইল শলোখভের মতো, 'ওর মত উন্মাদকে কলম ধরতে দেওয়া উচিত নয়, ওকে বের করে দেওয়া হোক লেখকসংঘ থেকে।'

১৯৬৭ সালে শলোখভের এই 'উন্মাদটির' নাম ছিল আলেক্সান্দার স্যুলঝিনিৎসিন। ■

জয়তী রায়

অমৃতকন্যা পুতনা

ধর ধর, মার মার ...

শব্দ নয়, যেন বিষাক্ত তির। ছুটছে পুতনা। প্রাণপণে ছুটছে। যমুনার পাড় ধরে ছুটতে ছুটতে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। টেনে হিঁচড়ে নিজেকে তুলে আবার ছুটে চলেছে। চৈত্র দুপুরের বাতাসে উড়ছে চুল, কাচবসানো রঙিন ঘাঘরা, হাতের ঝমঝম চুড়ি... পালাতে হবে। বৃন্দাবন থেকে দূরে...নিরাপদ আশ্রয়ে। কংস রাজার প্রাসাদে।

নিরাপদ? কে যেন হেসে ওঠে খলখল—নিরাপদ তুমি নও পুতনা। কাজে অসফল বিষকন্যার একটাই শাস্তি—মৃত্যু। মথুরায় অপেক্ষা করছে যাতনাময় মৃত্যু।

তাহলে কোথায় যাবে পুতনা? পেছন থেকে ধেয়ে আসছে উন্মত্ত গ্রামবাসী—আক্কুসি রাক্ষসী আক্কুসি—আমাদের গোপালকে হত্যা করতে এসেছে, আক্কুসি।

প্রাণপণে আর্তনাদ করতে চাইল পুতনা। বলতে চাইল, রাক্ষসী নয়, সাধারণ মানুষ মাত্র সে। গোপালকে হত্যা করার পরিকল্পনা তার নয়। আজ্ঞা বহনকারী বিষকন্যা সে। এইটাই তার কাজ। রাষ্ট্র তিলে তিলে প্রস্তুত করে তুলেছে তাকে

শিশুহত্যার জন্য। এর বেশি আর কিছু জানা নেই তার। কিন্তু এই উন্মাদনা এমন যে, আজ পিটিয়ে মেরে ফেলবে বলে দৌড়ে আসছে সবাই... এখন বুঝেছে, ওই শিশু সাধারণ ছিল না। বিষযুক্ত স্তন্যপান করে আজ পর্যন্ত বাঁচেনি কেউ। আর ওই শিশু? তিল মাত্র ক্ষতি হল না? বিষ নয়, যেন অসুত পান করছে এমন মনে হল! খিলখিল হাসিতে চরাচর ভরিয়ে শিশু এমন করে চোখ মেলে দিল যে, ভয় পেয়ে গেল পুতনা। তার মনে হল, ভয়ঙ্কর পাপ করেছে সে। স্বয়ং ভগবানকে হত্যা করার চেষ্টা করছে!

প্রাণপণে ছুটছে সে। পালাতে হবে। কোথায় যাবে? কেউ নেই তার। পিতা-মাতা বেঁচে আছে কী না, জানে না। নিজের গ্রামের নাম ভুলে গেছে। ভুলে গেছে জন্ম পরিচয়। আজ সে বিষকন্যা। মথুরার রাজা কংস পালিত মৃত্যুদূত!

সেই কোন্ ছোট্ট বয়েসে পিতৃগৃহের পরিচিত অঙ্গন থেকে গোপনে অপহৃত হয়েছিল পুতনা, ঠিক মতো মনেও পড়ে না। তারপর থেকে প্রতিদিন সহ্য করেছে অকথ্য যন্ত্রণা। আজ সতেরো বছর বয়সে এসে বুঝতে পারে তাদের মত মেয়েদের ব্যবহার করা হয় রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতিয়ার হিসেবে। শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে পারা যায় এমন এক অব্যর্থ মারণ অস্ত্র। তাদের নাম শুনলে ভয় পায় রাজা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। তারা বিষকন্যা।

শরীরে বহন করছে বিষ।

বন্দী হওয়া ছোট্ট পাখির মত ছটফট করছিল পুতনা। কিচ্ছু বোঝেনি, কিচ্ছু জানেনি, অবোধ চক্ষু মেলে দেখেছিল, তারই মতো আরও কতগুলি ছোট্ট বালিকাও বন্দী রয়েছে। বিশাল কক্ষ জুড়ে হরেক রকমের যন্ত্রপাতির সঙ্গে আছে

গম্ভীর মুখের জনাকতক দীর্ঘদেহী রাজপুরুষ। হাতের লাঠি ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। বালিকাদের হাত-পা টিপে টিপে দেখছিল। ওদের মধ্যে সবচেয়ে রাগি মুখের লোকটি বলে উঠল— নতুন বালিকাটি

স্বাস্থ্যবতী। ওর পিতামাতা কি অরণ্যের আদিবাসী?

নিচু স্বরে উত্তর দিল একজন— হ্যাঁ, মহামতি।

—ছয় বৎসরের বালিকা চাই আমাদের। বিষ প্রয়োগের জন্য এই বয়স সবচেয়ে উপযুক্ত।

ভয়ার্ত স্বরে কর্মচারি বলে— ভদ্র গৃহস্থ আজকাল সতর্ক। তাই, আদিবাসী কন্যা তুলে নিয়ে এলাম।

—ঠিক আছে। আদিবাসী হলেও সুখশ্রী সুন্দর। বিষদান প্রক্রিয়া শুরু করা যাক। তিন-চারজন বালিকা মারা গেছে। আশাকরি, এইটি পারবে লড়াই করতে। বালিকাটির নাম হোক, পুতনা। অর্থাৎ, পতিতা।

অদ্ভুত ঘটনা তাই না? পুতনা রাক্ষসী তো পুরাণের গল্প মাত্র। তার সঙ্গে বিষকন্যার সম্পর্ক কোথায়?

আছে বৈকি। গল্পের মোড়ক খুলে ফেলে দেখতে হবে ভেতরের সত্যে কেমন অদ্ভুতভাবে সুখ লুকিয়ে আছে।

রাজতন্ত্রের বিকাশের পক্ষে সহায় মানবী অস্ত্রের অভিনব আবিষ্কার হয়েছিল অরণ্যের প্রাচীন আদিম বনচর জাতির কাছ থেকে। যাদের বসবাস ছিল গভীর অরণ্যে। খাবার সংগ্রহ থেকে শুরু করে পর্বত গুহায় নিজের বাসস্থান—সব কিছুর জন্য চলত লড়াই। খাদ্য সংগ্রহ করে পরখ করতে হতো, কোনটি আহারের যোগ্য, কোনটি বিষাক্ত। সুস্থ ফল, বিষাক্ত ফল পাশাপাশি। বিষাক্ত সাপ, কীট-পতঙ্গ মানুষের শরীরে ছড়িয়ে দিত বিষ। নিত্যকার বিষাক্ত আক্রমণের

হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আবিষ্কৃত হল উপায়। নিজেদের শরীরে অল্প পরিমাণ বিষ প্রয়োগ করত, তার ফলে বিষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতিষেধক তৈরি হয়ে যেত। শরীরে বিষ ধারণ করার এই উপায়টির নাম—

মিথিডেটিজম (Mithridatisn) । 'কল্কি পুরাণ', 'শুক সপ্ততা' এবং চাণক্য রচিত 'অর্থ শাস্ত্র'—একাধিক বার এসেছে বিষকন্যার কথা। রাজ্য রাজনীতির কাজে লাগানো হতে থাকল এই প্রক্রিয়া। দরিদ্র পরিবারকে ভয় দেখিয়ে অথবা অপহরণ করে সংগ্রহ করা হতে থাকল শিশুকন্যাদের। অভিজ্ঞ বৈদ্য চিকিৎসক জানতেন মারাত্মক বিষ সরাসরি শরীরে প্রবেশ করলে জ্বলে যাবে খাদ্যনালি, শিরা, ধমনী। তৈরি করা হতে থাকল বিষের গুঁড়ো। প্রতিদিনের খাবারের সঙ্গে একটু একটু করে বিষ দেওয়া হতো। সকলে নিতে পারত না। চিৎকার করত। খিঁচুনির পর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে। প্রতি দশজনের মধ্যে তিনজন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠত। ধীরে ধীরে জন্ম নিত বিষকন্যা। বিষ হজম করে বড় হতে থাকা কন্যাগুলি নৃত্য-গীত-বাদ্যে সুনিপুণ, ছলনায়, জাদুবিদ্যায় পটু, লীলাময়ী ভঙ্গিমায়, চতুর বাক্য জালে সম্মোহিত করে তুলে, শরীরে বহন করা মারাত্মক বিষ নিয়ে শত্রু শিবিরে প্রবেশ করে। তাদের কেউ চুম্বন করলে, তাদের সঙ্গে মিলিত হলে, তাদের স্তন্য দুগ্ধপান করলে—প্রাণনাশ নিশ্চিন্ত। এই কাজ বড় ভয়ঙ্কর। ধরা পড়লে বেঁচে থাকার কোনও সম্ভাবনা থাকে না।

ফিরে আসি গল্পে।

মথুরার রাজা কংস। প্রবল প্রতাপ। কিন্তু, এখন তার প্রাণে বড্ড ভয়। মৃত্যু ভয়। দৈববাণী হয়েছে, গোকুলে জন্ম নেওয়া কোনও শিশু, পরবর্তীকালে হয়ে উঠবে তার মৃত্যুর কারণ। কে সেই শিশু? পরিচয় যখন জানা নেই, তখন যতগুলি নবজাতক পুত্র সন্তান আছে, তাদের হত্যা করা হোক। ছলে-বলে-কৌশলে।

বিষকন্যা হিসেবে প্রশিক্ষণের শেষে, রাজসভায় ডাক পড়েছে পুতনার। কাজ করতে হবে হাতে কলমে। হত্যা করতে হবে কাউকে। কে সে? প্রশিক্ষণের সময় দেখানো

হয়েছে, শত্রু রাজার শয্যাসঙ্গিনী হয়ে চুম্বন, আলিঙ্গন, সঙ্গমের মাধ্যমে বিষ ঢুকিয়ে হত্যা করে নিঃশব্দে পালিয়ে আসতে হয়। এখন তো কারাগারে আছে কংসরাজার পিতা উগ্রসেন। আর আছে পরম শত্রু বোন দেবকী, ভগ্নিপতি বসুদেব। দুজনকে তো মেরে ধরে অত্যাচার করে কিছু আর রাখেনি, তাহলে কে? মারতে হবে কাকে? ভেবে কুল পায় না পুতনা! মনের গোপনে ভয় পায় একটু। শিক্ষণ যেমনই হোক, বাস্তবিক হত্যা করতে হবে? অল্প ঘাম হয় শরীরে। দপদপ করে মাথার মধ্যে। যদি ধরা পড়ে যায়?

যদি...! ভাবনার মাঝখানে যেন বজ্রগর্জন ভেসে আসে— পুতনা? প্রস্তুত? সুন্দরী অভিজাত রমণীর সাজ করে নাও। তোমার কাজ তোমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

—আদেশ করুন।

—চারিদিকে শিশুহত্যা চলছে, খবর পেয়েছ নিশ্চয়ই। এই বৎসর যতগুলি শিশু জন্মেছে, নিধন করতে হবে সবাইকে। রাজ আদেশ।

—কেন প্রভু? এমন নৃশংস কাজ কেন?

—আস্পর্ধা কম নয় তোমার! প্রশ্ন করো কোন্ সাহসে? যাই হোক, শুনে রাখো, কোনো একটি শিশু হবে রাজার প্রাণনাশের কারণ। যেহেতু জানতে পারা যাচ্ছে না, তাই...।

—তাই নির্বিচারে হত্যা করা হবে?

—চুপ করো। অনেকগুলি ইতিমধ্যে সমাধা করছে নির্দিষ্ট ঘাতকের দল। কেবল একটি শিশু... সে বিশেষ, তাকে কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না, দিন দিন উদ্বেগ বেড়ে চলেছে রাজা কংসের। রাতে ঘুম হয় না। দিনের বেলা ছায়া দেখলে চমকে ওঠেন। এখন উপায় ভাবা হয়েছে। তুমি যাবে। ধাত্রীমাতার মত স্তন্য দান করবে শিশুকে। বিষদুগ্ধ প্রাণ হরণ করবে শিশুর।

—মহামতি, শিশু হত্যা করতে হবে আমায়?

—তোমার আপত্তি আছে? শাস্তির জন্য প্রস্তুত থেকো তবে? জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ।

—না না না। মহামতি, আমি প্রস্তুত।

— বৃন্দাবনের গোপপল্লী। নন্দঘোষ আর যশোদার পুত্র—কৃষ্ণ। ধনী সুন্দরী রমণী রূপে যাবে। সঙ্গে নেবে প্রচুর উপহার। যেভাবেই হোক, তোমার বিষ শরীরের সংস্পর্শে আনতে হবে কৃষ্ণকে।

পুতনার মনে ঝড় বইছে। এমন কাজ করতে হবে? বেঁচে ফিরে আসবে তো? না এলেই বা কী! ফিরে তো আসতে হবে রাজতন্ত্রের নরকে। যেখানে তার একমাত্র পরিচয় রাক্ষসী ঘাতিনী! তারচেয়ে জনরোষে মৃত্যু হোক বরং! সে শুনতে পেল মহামতি বলছেন— তুমি খেচরি বিদ্যায় পারদর্শী? তাই তো?

নীরবে মাথা নাড়ে সে। খেচরি অর্থাৎ প্রয়োজন হলে আকাশে উড়তে পারে।

মহামতি খুশি হলেন। সব দিক থেকে উপযুক্ত পুতনা। প্রয়োজন হলে আকাশ পথে উড়ে পালিয়ে আসতে পারবে।

গোকুলে নন্দ মহারাজের গৃহ। নিত্য কর্মে ব্যস্ত সবাই, এই সময় অতি রূপবতী রমণী পুতনা এসে উপস্থিত হয়ে চোখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল— কই গো। আমার যশোদা মা কই?

সকলে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। রমণীর শরীরে ঝলমল করছে সোনার গহনা, লম্বা কেশ ফুলের মালায় সজ্জিত । সৃদু হাস্য করে, ভ্রু-র ভঙ্গি করে এমন ভাবে তাকাতে লাগল যে, সমস্ত ব্রজবাসী তার রূপে মুগ্ধ হয়ে গেল। অপরূপ সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। দৌড়ে এলো সকল গোপিকা।

সম্মোহিত দৃষ্টি তাদের। মনে হচ্ছে—পদ্মফুল হাতে স্বয়ং দেবী লক্ষ্মী যেন বৃন্দাবনে উপস্থিত হয়েছেন। এমন মিষ্টি অপরূপ সেই রূপ!

সুন্দরী পুতনা গোকুলে ঢুকে চোখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল— কোথায় গো? যশোদার পুত্রটি কোথায়?

যশোদা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল— কে গো তুমি? আগে দেখেছি বলে মনে হয় না?

—আহ্। তুমি কি করে দেখবে গো? আমি মথুরায় থাকি। তোমার স্বামী নন্দ ঘোষের বন্ধু আমার স্বামী।

এদিক পানে এসেছিলাম, ভাবলাম দেখেই যাই একটু।

যশোদা মুগ্ধ। যেমন মিষ্টি কথা, তেমনি রূপ। এত সোনার গহনা, বেনারসি শাড়ি অথচ দেখো, একটুও দেমাক নেই! তবে, আজকাল সতর্ক সবাই। অচেনা কেউ গ্রামে ঢুকলে চোখ-কান খোলা রাখতে হয়। শিশু হত্যা করা হচ্ছে

নির্বিচারে। তবে, ইনি যুবতী, তায় রূপবতী রমণী। ভয় কীসের?

যশোদা আদর করে তাকে নিয়ে গেল নিজের গৃহে। বাতাসের মত হালকা পায়ে পুতনা এসে দাঁড়ালো কৃষ্ণের সামনে। দুপুরের আমেজ ছড়িয়ে আছে। সকলেই নিভন্ত ঝিমন্ত। আধো অন্ধকার ঘর যেন আলো হয়ে আছে শিশুর বিভায়, মিটমিট করে হাসে কেমন দেখো!

ওমা! গালে হাত দিয়ে বিভোর হয়ে দেখে পুতনা। মরি মরি। এ কী রূপ! কালো অঙ্গে হীরের দ্যুতি, কোঁকড়া

চুল ঝামরে পড়েছে, হাতে-পায়ে শিশু, পুতনা যেন কতকালের চেনা!

বিষকন্যার বুকের মধ্যে উথলে উঠল অবদমিত মাতৃত্ব । প্রাণ নিংড়ে উঠে এলো বেদনা—হত্যা করতে হবে? এই শিশু বেঁচে থাকলে রাজা কংসের মৃত্যু অনিবার্য। পুতনার স্তন্যপান করে মরণের কোলে ঢলে পড়লে আর কোনও ভয় নেই! রাষ্ট্রনীতির কাছে ক্ষমা নেই কারও। শিশু হোক বা বৃদ্ধ—প্রয়োজনে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করবে না রাজা। পুতনা যন্ত্র মাত্র। আদেশ পালন করতে হবেই তাকে। নাহ্। দেরি করে লাভ নেই। ভেবেও লাভ নেই। ওই দিব্যদর্শন শিশুর দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে ভুল হয়ে যাচ্ছে সব। তার চেয়ে... মন শক্ত করে নেওয়াই ভালো। মিষ্টি হেসে দু'হাত বাড়িয়ে দিল পুতনা। কাজ সেরেই পালিয়ে যেতে হবে। সুযোগে আকাশে উড়ে যেতে হবে।

প্রাণপণে দৌড়ে চলেছিল পুতনা। খেচরি বিদ্যার কথা মনে ছিল না। জাদু, তুকতাক কিছুই মনে পড়ছিল না। মৃত্যুভয় গ্রাস করছিল... দিশেহারার মত ছুটছে। হঠাৎ, একেবারে আচমকাই তার মনে পড়ল কৃষ্ণের মুখ। খিলখিল হাসিতে ভরা উজ্জ্বল চাঁদমুখ। চোখে জল এল পুতনার। কেঁদে উঠল সে। আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে চিৎকার করে বলে উঠল— হে কৃষ্ণ, আমি তোমার শরণাগত। রক্ষা করো গোপাল। আমি হত্যাকারী নই। আদেশ পালনকারী অনুচর মাত্র।

ফুঁসে ওঠা নদীর মত হিংস্র জনরোষ হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল। যেন মন্ত্রধ্বনি বেজে উঠল কোথাও।

পুতনা দেখল, কৃষ্ণ কোলে এগিয়ে আসছে যশোদা। আহা! কত সুন্দর স্বর্গীয় দৃশ্য। চোখে জল এলো— হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে—দোষী নয়, রাক্ষসী নয়। বড় অভাগী সে। আজ এক দিব্যশিশুকে বুকে টেনে নিয়ে মনে হয়েছিল, পৃথিবীতে দুঃখ বলে বোধহয় কিছু নেই। মহামতির নির্দেশ পালন করেছিল অক্ষরে অক্ষরে। গ্রামে ঢুকে উপহার দিয়েছিল অনেক। মথুরা থেকে এসেছে, পথশ্রান্ত, বিশ্রাম করবে... সরল গ্রামবাসী সন্দেহ করেনি।

জল খেয়ে প্রশ্ন করেছিল— নবজাতক আছে না কি কেউ? দেবীর থানের ফুল ছুঁইয়ে যেতাম।

কেউ সন্দেহ করেনি, দেখিয়ে দেয় যশোদার ঘর। সেখানে গিয়ে গোলমাল হয়ে গেল সব। কৃষ্ণের মুখ দেখে সব ভুলে গেল পুতনা।

ঝিমন্ত দুপুরে আধো অন্ধকার কুটিরে আলো হয়ে শুয়ে আছে! এ কে? টুলটুল নিটোল শিশুর চারিদিকে আলোর তরঙ্গ—পুতনা ভুলে গেল সে বিষকন্যা। পুতনা ভুলে গেল রাজা কংসের আদেশ। সমস্ত ক্ষোভ, দুঃখ, বিষাদ যেন

লহমায় দূর হয়ে শরীরে ছড়িয়ে পড়লো শান্তির প্রলেপ। হাত বাড়িয়ে বুকে তুলে নেয় শিশুটিকে। চেপে রাখে, শ্বাস ভরে টেনে নেয় চন্দন সুগন্ধ।

জড়িয়ে ধরে থাকে অনেকক্ষণ, কৃষ্ণ খিলখিল হাসে, চুল টানে, হাতের চুড়িগুলি নিয়ে খেলে, দৈব অমৃত স্পর্শে বিষ নামতে থাকে পুতনার শরীর থেকে। প্রবাহিত পুণ্য জলধারায় ভেসে যায়... এমন মনে হতে থাকে তার... অকারণ পুলকে শিহরিত রমণীর স্তন থেকে নির্গত দুধ আপনা হতে ঝরে পড়ে কৃষ্ণের মুখে। পরম আরামে চক্ষু মুদিত

করে শিশু। সেই সময় প্রাঙ্গণ জুড়ে ফিসফিস ভেসে আসে—খবর এসেছে, কংস পাঠিয়েছে গুপ্তঘাতক। আজ। নারীর

ছদ্মবেশে। ওই দেখো, কৃষ্ণ কোলে বসে আছে রাক্ষসী।

কেউ বলে—পরমা সুন্দরী ওই মেয়ে রাক্ষুসী কী করে হবে গো?

—ওমা! ওরা যে মায়াবিদ্যা জানে। আসল চেহারায় পিশাচ।

—তাই নাকি?

—তবে বলছি কী? মুলোর মতো দাঁত, কুলোর মতো কান, গাছের মতো লম্বা, কুচকুচে কালো। উফ্।

জনতা চেঁচিয়ে ওঠে। মারো। মারো। হত্যা করো।

চমকে ওঠে পুতনা। জেনে গেছে? পালাতে হবে এখনই। কোলের শিশু শয্যায় রাখতে গিয়ে চমকে ওঠে সে! কৃষ্ণের নরম হাতের বাঁধন খুলছে না কিছুতেই। এ কেমন জাদু? এ কে? এ কি মায়া? নাকি এই বন্ধনের মধ্যে আছে ঘৃণিত কর্ম থেকে মুক্তি?

বাইরের লোকগুলো এখন ঘরের ভেতর। তাদের চোখে অবিশ্বাস, ঘৃণা, ভয়। কোনও মতে বাঁধন ছাড়িয়ে ছুটে চলে পুতনা। পারল না। ধরা পড়ে গেল। অথবা ধরা পড়তে চেয়েছিল। ক্লান্ত বিষন্ন অবসন্ন শরীর এলিয়ে পড়ে মাটিতে, উদ্যত রাগী জনতার ভিড় দেখেও আর ভয় পায় না। এসে গেছে কৃষ্ণ। আর কোনও ভয় নেই। রাজা কংস নয়, মহামতি নয়, শাসন নয়... কাউকে ভয় নেই আর... অনেকদিন পরে আরাম নেমে আসে শ্রান্ত অপমানিত দুই

চোখে, কানে ভেসে আসে যশোদার কণ্ঠস্বর—স্তব্ধ হও। ছেড়ে দাও। তোমরা জানো না? মাতা সাত প্রকারের? গর্ভধারিনী, গুরুপত্নী, রানি, ব্রাহ্মণপত্নী, গাভী, ধাত্রী এবং ধরিত্রী। পুতনা স্নেহভরে স্তন্যদান করেছে, তাই সে কৃষ্ণের ধাত্রীমাতা। সে পুণ্যবতী রমণী। অমৃতকন্যা।

জনতা গর্জন করে— রাক্ষসী। বিষকন্যা।

যশোদা বলে— কোথায় বিষ? বিষ পান করে বেঁচে আছে কী করে কৃষ্ণ?

কাজে অসফল হলে হত্যা করা হতো যে হতভাগীদের—পুতনা ছিল তাদেরই একজন। সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ পুরুষ কৃষ্ণের জীবনের ঘটনায় জড়িয়ে গিয়ে বিষকন্যা থেকে হয়ে উঠল অমৃতকন্যা। ঘৃণা নয় বরং বহু জায়গায় পূজিত হয় পুতনা।

গোকুলে পুতনা পুজো হয়। মথুরায় আছে পুতনা মন্দির। চন্দননগর নিচুপট্টির রাধাগোবিন্দ বাড়িতে পুতনার কোলে শিশু কৃষ্ণমূর্তির পুজো হয়।

রূপা মজুমদার

মেরি কুরি, দাম্পত্য ও প্রেম

আমি রসায়নের ছাত্রী ছিলাম। ভালোবেসেই রসায়নের রস আস্বাদনে ব্রতী হয়েছিলাম।

দক্ষিণ কলকাতাবাসী ছিলাম। উত্তর কলকাতা বলতে বুঝতাম গড়পার—সত্যজিৎ রায়ের জটায়ুর বাসস্থান, জোড়াসাঁকো, বইপাড়া এবং রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ।

তা সেই সায়েন্স কলেজে রসায়নে স্নাতকোত্তর পড়ব বলে ভর্তি হলাম। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে থাকত প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাস। ঘন্টা তিন বা চারেক চলত। যাঁরা অর্গানিক কেমিস্ট্রির প্র্যাক্টিক্যাল সম্পর্কে জানেন, তাঁরা বুঝবেন—রিফ্লাক্স নামক একটি পদ্ধতি ছিল, যেখানে তাপের ওপর রাসায়নিক বস্তু বসিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হতো। সকলেই সেই সময়ের সদ্ব্যবহার নিজের প্রয়োজন বা পছন্দ মতো করতো। কেউ টিটি খেলত, কেউ ক্যান্টিনে আড্ডা মারত, কেউ প্রেম করত, কেউ লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করত, আবার কেউ কাছেই শিয়ালদহে জগৎ সিনেমা হলে গিয়ে ম্যাটিনি শো দেখে ফিরত। আমি প্রেম করতাম। সায়েন্স কলেজেরই ছাত্র কিন্তু অন্য বিভাগ। আমরা হাঁটতে বেরতাম। কখনও গড়পার হয়ে দেশবন্ধু পার্ক পর্যন্ত। কখনও পেছন দিকে হৃষিকেশ পার্ক দিয়ে আমহার্স্ট স্ট্রিট সিটি কলেজ হয়ে বিবেকানন্দ রোড পর্যন্ত।

সিটি কলেজের পেছনেই ঝামাপুকুর। সেখানে দেব সাহিত্য কুটিরের দপ্তর জানতাম। বইমেলায় বই কিনেছি কতো। বইয়ের পাতায় উল্লেখ থাকে ঝামাপুকুর লেন। কিন্তু কোনও এক অজানা কারণে কোনওদিনই ওদিকে হাঁটতে যাইনি। ভাগ্যদেবতা যে লিখে রেখেছেন বাকিটা জীবন ওই ঝামাপুকুরেই কাটাতে হবে, সেটা তখন জানা ছিল না।

বলা বাহুল্য আমার সেই প্রেম পরিণতি পায়নি।

এখন বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে গেছে। যদিও সুপ্ত ভালোবাসাটা রয়েই গেছে। সায়েন্স কলেজের পাশ দিয়ে দু'বেলা যাতায়াত। গেটের দিকে এক ঝলক তাকানো। মুহূর্তের জন্য কিছু স্মৃতি ভেসে আসা। ভালোলাগার স্মৃতি। সযত্নে আগলে রাখার মতো স্মৃতি। কিছু সম্পর্ক... কিছু মুহূর্ত... ক্ষণিকের জন্য মন ভার হয়ে যাওয়া..। আবার নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া...সব সম্পর্ক তো পরিণতি পায় না। পরিণতি পায় না বলেই হয়তো স্মৃতিগুলোর লালন–পালন রক্ষণ এবং সঙ্গে যাপন। আর তাই তো বারে বারে ফিরে দেখা।

ফিরে আসি রসায়নে। বিজ্ঞানের এই শাখার প্রতি টান থেকে মেরি কুরির প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁকে নিয়ে পড়াশোনা। তাঁর জীবনের কিছু অংশও পড়তে পড়তে মনে হয়, সত্যিই তো সব সম্পর্ক পরিণতি পায় না। কিন্তু

চিরকাল রয়ে যায়।

পোল্যান্ড থেকে ফ্রান্সে পড়তে আসা চব্বিশ বছর বয়সী মেয়ে মারিয়া বা মেরি কুরির সঙ্গে ফরাসি পদার্থবিদ পিয়ের কুরির প্রথম দেখা হয় প্যারিসের সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৮৯৪ সালে। সেই সাক্ষাতের মুখ্য অনুঘটক ছিলেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়েরই পদার্থবিদ কাউন্ট জোসেফ ওয়ারউসজ কোয়ালস্কি। সেদিনের সেই সাক্ষাৎ মেরি পরে বর্ণনা করেছিলেন এইভাবে, 'আমি যখন সেই ঘরটায় ঢুকলাম, পিয়ের দাঁড়িয়ে ছিল ব্যালকনির দিকের একটা জানলার ধারে। ওকে দেখে আমার বেশ কমবয়সী মনে হয়েছিল, যদিও তখন ওর বয়স পঁয়ত্রিশ। ওর মুখের এক্সপ্রেশনটাই আমাকে সবচেয়ে আকর্ষণ করেছিল। আর ওর মধ্যে তখন একটা উদাসীনতাও লক্ষ্য করেছিলাম। কথাবার্তা একটু ধীর গতির। আর পরে আমাকে মুগ্ধ করেছিল ওর সারল্য আর হাসিটা। একই সঙ্গে যা তারুণ্যে ভরপুর এবং আত্মবিশ্বাস উদ্রেককারী।'

বছরখানেক দুজনের মধ্যে চলল প্রেম। এরপর পিয়ের মেরির কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। মেরি প্রথম দিকে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। কারণ তাঁর ফ্রান্সের থাকার কোনও ইচ্ছে ছিল না। ভেবেছিলেন পড়া শেষ হলে ফিরে যাবেন পোল্যান্ডে। কিন্তু সেটা আর হল না শেষ পর্যন্ত। প্রেমের বাঁধন আর কাজের মধ্যে ডুবে যাওয়া, এই দুটি কারণ তাঁদের ধরে রাখল প্যারিস শহরে।

বিয়েটা হয়ে গেল ১৮৯৫–এর ছাব্বিশে জুলাই। সেদিন বিয়ের উপযুক্ত গাউন পরার বদলে মেরি পরেছিলেন গাঢ় নীল একটা ড্রেস। মেরি পরে বলেছিলেন, ওই ড্রেসটা ছাড়া তখন তাঁর পরার মতো আর কোনও পোশাক ছিল না। স্বামীর কাছে তার দাবি ছিল, যদি তিনি মেরিকে পরে কোনও পোশাক উপহার দেন, সেটা যেন গাঢ় রঙের হয়। তাহলে সেটা পরে মেরি ল্যাবে যেতে পারেন। তেজস্ক্রিয় রশ্মি নিয়ে কাজের জন্য গাঢ় রঙের পোশাকই দরকার।

বিয়ে তো হল, এবার হানিমুন যাওয়ার পালা। সেটাও দুজনে পরিকল্পনা করলেন একটু অন্যরকমভাবে। কীরকম?

দুজনে বেছে নিলেন দুটি বাইসাইকেল। আর বেরিয়ে পড়লেন ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলের উদ্দেশে। চুটিয়ে ঘুরে বেড়ালেন দিন কয়েক। ফিরে এসে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন গবেষণায়।

কিন্তু এই সুখের দাম্পত্যে হঠাৎ নেমে এল এক বড় আঘাত। সেটা উনিশে এপ্রিল ১৯০৬ সাল। সন্ধেবেলা। খুব বৃষ্টি হচ্ছিল সেদিন। পিয়ের রাস্তা পার হচ্ছিলেন। ঠিক সেইসময় একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ল তাঁর ওপর। গাড়িটিতে ছিল ৬ টন মিলিটারি ইউনিফর্ম। অত ভারী জিনিসের চাপে পিয়ের আক্ষরিক অর্থেই চ্যাপ্টা হয়ে গেলেন এবং ওখানেই তাঁর মৃত্যু হল। এই ঘটনার পর মেরির মানসিক অবস্থা কেমন হয়েছিল, সহজেই অনুমান করা যায়। তখন মেরি দম্পতির দুটি মেয়ে— বড়টির বয়স আট, ছোটটির দেড় বছর। ওইরকম অবস্থা থেকে নিজেকে শক্ত রেখে মেরি আবার গবেষণায় ফিরলেন, এবং ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনেও।

পিয়েরের মৃত্যুর বছর চারেক পরে তেতাল্লিশ বছর বয়সী মেরির জীবনে আবার প্রেম এল। স্বামীর প্রাক্তন এক ছাত্র, নাম পল ল্যাজাঁভা। বয়সে মেরির চেয়ে বছর পাঁচেকের ছোট, এবং তাঁর স্ত্রী ও চার সন্তান রয়েছে। তবু প্রেম গড়ে উঠতে কোনও সময় লাগল না। কারণ পলও দাম্পত্য জীবনে বিশেষ সুখী ছিলেন না। দুজনে সরবোনে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিলেন, যাতে গোপনে দেখাসাক্ষাৎ চলতে পারে। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। পলের স্ত্রী একদিন হঠাৎ করেই খুঁজে পেলেন তাঁর স্বামীকে মেরির লেখা কিছু চিঠি। তাতে কত সব বিস্ফোরক কথা। মেরি চাইছেন পল যেন তাঁর স্ত্রীকে ডিভোর্স দেন, তাহলে তাঁরা বিয়ে করে নিতে পারেন। কিন্তু খবরটা চাপা রইল না আর। সাংবাদিকেরা এই খবরকে রসিয়ে রসিয়ে পরিবেশন করলেন সংবাদপত্রে। চারদিকে ছিঃ ছিঃ রব উঠল। এমন অবস্থা হল যে মেরিকে বারণ করা হল নোবেল পুরস্কার

প্রদান অনুষ্ঠানে আসতে।

মেরির নিজের কী বক্তব্য ছিল এই ব্যাপারে?

নোবেল কমিটির এক সদস্য পদার্থবিদ স্বান্তে আরহেনিয়াসকে লেখা এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, ‘আমাকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে রেডিয়াম আর পোলোনিয়াম আবিষ্কারের জন্য। আর আমি বিশ্বাস করি যে, আমার বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের কোনও সম্পর্ক নেই। আর এটাও আমি একেবারেই মেনে নিতে পারি না যে কারও বৈজ্ঞানিক কাজের গুরুত্ব তার নামে প্রচারিত অপবাদ বা ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনার ওপর ভিত্তি করে বিচার করা হবে।’

এই সম্পর্ক নিয়ে মেরিকে সহ্য করতে হয়েছিল অনেক কুৎসা। শেষ অবধি পল এবং মেরির প্রেম পরিণতি পায়নি। পল ফিরে যান স্ত্রীর কাছে, মেরি ব্যস্ত হয়ে পড়েন গবেষণা। দেশ–বিদেশে ভ্রমণ আর মেয়েদের মানুষ করার কাজে। তেজস্ক্রিয় রশ্মির অমোঘ বিষক্রিয়া তাঁকে ভেতরে ভেতরে ক্ষয় করতে শুরু করেছিল। ১৯৩৪ সালে মাত্র ছেষট্টি বছর বয়সে মৃত্যু হয় তাঁর।

পল এবং মেরির গল্প কিন্তু এখানে শেষ নয়!

মেরির নাতনির সঙ্গে প্রেমিক পল ল্যাজেভুর নাতির প্রেম ও বিয়ে হয়েছিল। প্রজন্মের ব্যবধানে কী মধুর পরিণতি! ■

প্রথম আলো-কে
শুভেচ্ছা

একজন
শুভানুধ্যায়ী

কামাখ্যা তীর্থে অম্বুবাচী মেলা

আশিস গুহ রায়

থানাপতি স্বামী রঞ্জিতা নন্দ গিরি মহারাজ কামাখ্যার জুনা আখড়ার থানাপতি ও এলাহাবাদ কুম্ভের থানাপতি। তা ছাড়া দুর্গাপুর ত্রিণাথ আশ্রমের এবং ডানকুনির জনাই ভূতদিঘি অঞ্চলের সদানন্দ আশ্রমের মঠাধ্যক্ষ। আমি এবার মহারাজের সঙ্গে কামরূপ কামাখ্যায় যাই অম্বুবাচী মেলা উপলক্ষ্যে। সেখানে গিয়ে মহারাজের মাধ্যমে কামাখ্যা মন্দিরের ইতিহাস জানতে পারি।

সৃষ্টির শুরুতে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু যখন সৃষ্টিকার্যে রত ছিলেন তখন দেবাদিদেব মহাদেব মহাযোগে তন্ময় হয়ে ছিলেন। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু শিবের কার্যে আশ্চর্য হলেন। কারণ সৃষ্টিকার্যে তিনজনের একজন যদি সহযোগে না থাকেন তাহলে সৃষ্টিকার্য অসম্ভব হবে। তখন ব্রহ্মা তাঁর মানসপুত্র দক্ষকে স্মরণ করেন। দক্ষ এসে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হন। ব্রহ্মা দক্ষকে জগৎমাতার আরাধনা করতে বলেন, না হলে জগৎ সৃষ্টিকার্যে ব্যাঘাত ঘটাবে। ব্রহ্মা বললেন যে, জগৎমাতা যদি দক্ষের আরাধনায় সন্তুষ্ট হন, তাহলে তিনি কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করার জন্য বর প্রার্থনা করবেন, সঙ্গে জগৎমাতা যাতে শিবের পত্নী হন তার জন্যও বললেন। ব্রহ্মার আদেশে দক্ষ বহুদিন তপস্যা করার পর দেবী মহামায়া তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে দক্ষের সম্মুখে আবির্ভাব হয়ে বললেন— 'দক্ষ তোমার কী প্রার্থনা বল?' তখন দক্ষ দেবী মহামায়াকে তাঁর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করার এবং শিবের পত্নী হবার কথা বললেন। দক্ষের কথায় সন্তুষ্ট হলেন, যদিও দেবী এও বললেন যে, দেবীর যখন অনাদর হবে তখনই তিনি দেহত্যাগ করবেন। পরে দেবী মহামায়া যথাসময়ে দক্ষ রাজার মহীয়সীর গর্ভে জন্মলাভ করলেন এবং মহাদেবকে আরাধনা করে সন্তুষ্ট করলেন। দক্ষ সতীকে শিবের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে আনন্দ মনে স্বর্গে বাস করতে থাকলেন।

একবার স্বর্গে অনুষ্ঠিত হওয়া দেবতাদের একটি সভায় শিব শ্বশুর দক্ষকে সম্মান না-করার জন্য দক্ষ নিজেকে অপমানিত বোধ করলেন। শিবের এই ব্যবহারে দক্ষ তাঁর ওপর ক্রোধান্বিত হলেন, পরে তিনি শিববিহীন একটি যজ্ঞের আয়োজন করলেন। সেই যজ্ঞে নারদ ত্রিভুবনের সকলকে নিমন্ত্রণ করলেন, কিন্তু দক্ষের কথা মতো নারদ শিবকে নিমন্ত্রণ করলেন না। তবুও নারদ কিন্তু সতীদেবীকে যজ্ঞ সম্পর্কে সমস্ত কথা জানালেন। সতীদেবীর মন ব্যাকুল হয়ে উঠল যজ্ঞে যাবার জন্য। সতীদেবী শিবের কাছে অনুমতি চাইলেন। শিব সতীকে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যেতে বারণ করলেন।

ক্রোধান্বিত হয়ে সতী শেষে শিবকে দশমহাবিদ্যার রূপ দর্শন করালেন।

এই দশমহাবিদ্যাসমূহ হল— (১) সম্মুখে— মহাকালী (২) ঊর্ধ্বদিকে— তারা (৩) দক্ষিণদিকে—উগ্রচণ্ডী (ছিন্নমস্তক) (৪) বামদিকে— ভুবনেশ্বরী (৫) পশ্চাৎদিকে— বগলা (৬) অগ্নিকোণে— ধূমাবতী (৭) নৈঋত কোণে— কমলা (৮) বায়ুকোণে— মাতঙ্গী (৯) ঈশানকোণে— ষোড়শী (১০) শিবের নিজ অঙ্গে— ভৈরবী।

কামাখ্যা মন্দিরের চারিদিকে একটি পুকুরসহ অন্য অনেক মন্দির আছে। এই স্থানসমূহ কামাখ্যা মন্দিরের মতো পবিত্র এবং এখানে বিভিন্ন স্থানের সাধু-সন্ন্যাসী ও ভক্তদের আগমন। যেমন এখানে সৌভাগ্যবস্ত্র, গণেশ দর্শন, কামাখ্যা মন্দিরের ভেতর ভাগ্যদর্শন, মহামুদ্রাপীঠ, চামুণ্ডা দেবী, নাটমন্দির, তা ছাড়া এখানে এসে কুমারী পূজা করলে পুণ্যলাভ করা যায়। আমরাও কুমারী পূজা করেছি এখানে।

আমরা কামেশ্বর মন্দির, ৪৫০ ফুট উঁচুতে দর্শন করেছি। ভুবনেশ্বরী মন্দির ১৪০০ ফুট উঁচুতে। এই পর্বতের নাম ব্রহ্মপর্বত। ভুবনেশ্বরী মন্দিরে দেবী মহাগৌরীর বিগ্রহ বিরাজমান। ভৈরবী মন্দির, বগলামায়ের মন্দির, বশিষ্ঠ মুনির মন্দির এবং বিশ্বামিত্র মুনির মন্দির দর্শন করলাম। এইসব মন্দিরের কী মনোরম দৃশ্য তা না দেখলে বোঝা যায় না।

কামাখ্যা মন্দিরে অম্বুবাচী মেলা উপলক্ষ্যে ২২ জুন থেকে ২৫/২৬ জুন এই উৎসব পালন করা হয়। এই তিনদিন কামাখ্যা মন্দির বন্ধ থাকে। এই সময় দেবীকে দর্শন করা যায় না। চতুর্থ দিন খোলা হয়, যদিও তার আগে দেবীর মণ্ডপ, দেবীর স্নান এবং পূজা করে মন্দিরের সকল স্থান পরিষ্কার করার পর ভক্তদের দর্শন করতে দেওয়া হয়।

অম্বুবাচীর সময় দেবীদর্শনের জন্য দেশ-

বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ ভক্ত ও সাধু–সন্ন্যাসীরা আসেন এবং মন্দিরের আশপাশে বাস করেন। দেবী কামাখ্যার যোনিপীঠ অম্বুবাচীর চারদিন রক্তবস্ত্রে ঢেকে রাখা হয় এবং সেই রক্তবস্ত্র ভক্তগণ নির্মাল্যরূপে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে। এই বস্ত্র অঙ্গরিত বস্ত্র নামে বিখ্যাত। এখানে লক্কর বাবা নামে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরিচয় হল। ইনি মন মন শুকনো লঙ্কা দিয়ে যজ্ঞ করেন এবং ভক্তদের যা বলেন তাই হয়।

কামাখ্যা মন্দিরের পাশে যজ্ঞের বিশাল জায়গা। এখানে দশনামীতে সাধু–সন্ন্যাসীরা এই কদিন যজ্ঞ করে বেল কাঠ ও ঘি দিয়ে। দয়ানন্দ গিরি মহারাজ ছাড়াও আরও হাজার হাজার সাধু এখানে থাকে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, গণেশ গিরি, উমাশঙ্কর গিরি, রজিন্তানন্দ মহারাজ, অসিত মহারাজ, দিগম্বর মহারাজ, ভোলাগিরি, শিবসাগর গিরি। মহন্তযোগানন্দ গিরি মহারাজ, নিত্যানন্দ গিরি মহারাজ, থানাপতি গোবিন্দ গিরি মহারাজ, তপেশ্যানন্দ গিরি মহারাজ। এবার দশমহাবিদ্যায় যজ্ঞ করেন পশ্চিমবঙ্গের মহন্ত রবীন্দ্রানন্দ গিরি মহারাজ, সঙ্গে সমস্ত সাধু-সন্তরা ছিলেন। রঞ্জিতানন্দ গিরি মহারাজ (থানাপতি) এবং উমাশংকর পুরী মহারাজ যজ্ঞ পরিচালনা করেন।

থানাপতি রঞ্জিতানন্দ গিরি মহারাজ সকলকে চকোলেট দেয় এবং চকোলেট খেয়ে কামাখ্যা মায়ের কৃপায় অনেকে ভালো হয়ে সুস্থ হয়ে ওঠেন। সেই জন্য কামাখ্যায় থানাপতি রঞ্জিতানন্দ মহারাজকে চকোলেটবাবা বলে ডাকেন। মহারাজ বাল্য সাধু যাকে যেটা বলে সেটাই হয়। সেই জন্য মহারাজের কাছে চকোলেট নেওয়ার জন্য প্রচুর ভক্তের ভিড় থাকে। এখানে ভূতনাথের শ্মশান আছে। এই শ্মশানের কাছে ব্রহ্মপুত্র নদী। এখান থেকে লঞ্চে করে উমাশঙ্কর আশ্রমে যাওয়া যায়, তাও পাহাড়ের ওপরে।

কামাখ্যা মন্দিরে বলিদানও হয়। তা ছাড়াও শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণ ভোজন, কুমারী পূজা, বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি কার্য পালন করা যায়। কামাখ্যা মন্দির অবস্থিত নীলাচল পাহাড়ের নীচে দক্ষিণ–পশ্চিম দিকে কামাখ্যা জংশন। সেখান থেকে কামাখ্যাধামে যাতায়াতের সুবিধা আছে।

তা ছাড়া গৌহাটি স্টেশনের কাছে কাছারিঘাট থেকে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। ■

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

সহযাত্রী

আমি প্যারিস থেকে জার্মানির কলোন শহরে যাচ্ছিলাম। ভেবেছিলাম সাত ঘণ্টায় যাত্রাটা একটা ডিটেকটিভ নভেল পড়েই কাটিয়ে দেব। পরে দেখলাম নভেলটা মোটেই তারিয়ে তারিয়ে পড়ার জিনিস না। ডিটেকটিভ নভেলের চেয়ে থ্রিলারের উপাদানই এতে বেশি। এদিকে থ্রিলারে আমার চট করে মন বসতে চায় না। শার্লক হোমস বা পোয়ারো–র ফ্যান আমি বুদ্ধির খেলা দেখতেই ভালোবাসি। এই নভেলটা আমাকে বড্ড বেশি ছুটোছুটি করাচ্ছিল। আমি দুম করে বইটা বন্ধ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে বসলাম। আর জানলার বাইরে চোখ মেলে দেখার চেষ্টা করলাম স্যাঁকেতা স্টেশন আসার উপক্রম হল কিনা! আর তখনই আমার নজরে পড়ল সামনে বসা প্রৌঢ় ভদ্রলোকের উৎসুক মুখটি। ট্রেনে ওঠার সময় এই ভদ্রলোকটি আমার সামনে বসে ছিলেন কিনা মনে করতে পারলাম না।

প্যারিস ছাড়ার পর আর কেউ তো এই কামরায় ঢোকেনি! তাহলে ইনি কখন এলেন? আর ওভাবেই বা আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ওরকম অসহায় হাসিই বা হাসছেন কেন? উনি কি আমাকে চেনেন? দুর, তাই–বা কী করে হবে? আমি ভারতীয় ছাত্র, মাত্র সাত মাস আছি প্যারিসে, আমার সঙ্গে এরকম কারও কোনও পরিচয় ঘটেনি এর মধ্যে। দু–চার জন বয়স্ক প্রফেসর ছাড়া আমি এই বয়সের বেশি লোকের ধারপাশেও ঘেঁষিনি এতদিনে। তাহলে?

একটা জিনিস আমাকে ভীষণ আকৃষ্ট করেছে ভদ্রলোকের চেহারার মধ্যে। সেটা কী? আমি অনেকক্ষণ ধরে ওর গোটা চেহারার খুঁটিনাটি নজর করে দেখলাম। কই, না তো চেহারার কোথাও তো কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নেই— না নাকে, না চোখে, না চুলে, না ঠোঁটে! না হাতে, না দেহে, না পোশাকে, না হাবভাবে! পাছে ভদ্রলোক বিরক্ত হন তাই এক ঝটকায় বইটা ফের তুলে নিয়ে তাতে মন দিলাম। কিন্তু না, মন কিছুতেই আর বইতে গিয়ে বসছে না। ভদ্রলোকের দিকে না-তাকিয়েও আমি বুঝতে পারছি যে, ভদ্রলোকও আমাকে নিয়েই কিছু একটা ভাবছেন। হয়তো পূর্বের মতো সেরকম মিটিমিটি হাসছেনও। আমাকে নিয়েও ভদ্রলোকের মনে কিছু কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে। আমার ভয়ানক ইচ্ছে হল আয়নাতে একবার নিজের মুখটা দেখার। আমি বইটা ফের সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালাম কম্পার্টমেন্টের আয়নাটার মুখোমুখি হব বলে। একটা আলতো ঝাঁকানি দিলাম কলারের টাইটায়, আর বেশ সপ্রতিভ ভঙ্গিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম আয়নার মধ্যে। আর চমকে উঠলাম আয়নায় প্রতিফলিত দৃশ্যটি দেখে।

আমার বুঝতে এতটুকু দেরি হল না, কেন আমার সামনে উপবিষ্ট প্রৌঢ় ভদ্রলোক সমানে আমাকে দেখে যাচ্ছিলেন। কারণ ওঁর সুটের রং ও কাপড়, জামার

কাপড় ও রং, টাই–গোঁফ, চশমা ও টুপি হুবহু আমার মতো। আর দু'জনের চেহারা দুটিও এক। শুধু ফরাসি ভদ্রলোকের গায়ের রংটা একটু বেশি ফর্সা, আর বয়সের জন্য চেহারাতেও কিছুটা ঢিলেঢালা ব্যাপার। নতুবা ওঁকে যে-কোনও লোক দেখলে আমার ভবিষ্যৎ চেহারা আঁচ করতে এবং আমাকে দেখলে ওঁর বিগত যৌবন সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে। মুখে একটু রংচং বুলিয়ে আর চোখে একটা কালো চশমা পরে আমি অনায়াসেই ওঁর হয়ে কোথাও হাজিরা দিতে পারি। আর উনিও যদি একটু রংটং মেখে যুবা সাজেন তো... না আর ভাবতে পারলাম না। আমার মাথাটা কীরকম ভেতরে ভেতরে দুলতে লাগল। আমার মনে হল আমার সামনে আমার একটা জীবন্ত ক্যারিকেচার। ভীষণ রাগও হল ওঁর ওপর, আবার কিছুটা মায়াও। আমি স্থির করলাম গোটা জার্নিতে ওঁর দিকে আর তাকাবই না। তাই ফের থ্রিলারটা উঠিয়ে নিয়ে মনঃসংযোগ করার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু এক-একটা সময় থাকে যখন মনঃসংযোগ দিয়ে কিছু করা জেগে জেগে ঘুমোনোর মতো অস্বস্তিকর, অসম্ভব ব্যাপার হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রেও আমার ঠিক তাই হল। আমি বই পড়ার বদলে সামনে বসা মানুষটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে ও তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ করতে লাগলাম। আমি মনে মনে বিভিন্ন পোশাকে ওঁকে সাজিয়ে আমার চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে লাগলাম। হঠাৎ কী ভেবে ওঁকে ধুতি–পাঞ্জাবিতেও কল্পনা করলাম। কিন্তু প্রতিবারই আমার গায়ে কাঁটা দিল, যখন খেয়াল হল যে লোকটার সঙ্গে আমার প্রৌঢ় চেহারার কোনওই ফারাক নেই। ওই অত শীতেও আমার শরীরটা ক্রমশ উষ্ণ হয়ে উঠতে লাগল। আমার একটা অকারণ ভয়ও হল সহসা। লোকটা আসলে আমিই নই তো?

শেষের কথাটা মনে উদ্রেক হতেই আমার ধৈর্য চুলোয় গেল। আমি ফিরে আর একবার ভদ্রলোকের দিকে না তাকিয়ে পারলাম না। কিন্তু যতক্ষণে মুখ তুলে ফের তাঁর দিকে তাকিয়েছি, ততক্ষণে দেখি তিনি নির্বিকার আমার সুটকেসটাই র‍্যাক থেকে নামিয়ে নিয়ে কামরার বাইরে হন্টন লাগিয়েছেন। কারণ ট্রেন তখন এসে দাঁড়িয়েছে স্যাঁকেতা স্টেশনে।

প্রচণ্ড আতঙ্ক হল ভেতরে ভেতরে। এ কি! আমার সুটকেস নিয়ে লোকটা চম্পট দিল বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে। আমি ছুট লাগালাম ওঁর পিছনে। কিন্তু করিডরে পা ফেলে লোকটা যে কোথায় উধাও হল তা এতটুকু হদিশ মিলল না। ভয়ের চোটে কোটের ভেতরের পকেটে হাত চালিয়ে দিলাম। না পাসপোর্ট, টিকিট, টাকার ওয়ালেট আর অন্যান্য পরিচিতিপত্র সব ঠিক আছে। সুটকেসটার মধ্যে রাখা জামাকাপড়, বইপত্র আর শেভিং সেটটা উধাও হল।

স্যাঁকেতা স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে, কিন্তু আমার প্ল্যাটফর্মে নামার সাহস হচ্ছে না। যদি ট্রেন ছাড়ে তাহলে ওঠার আর বিন্দুমাত্র সুযোগ থাকবে না। এই পাগল করা শীতের মধ্যে এই স্টেশনে পায়চারি করতে হলে নিউমোনিয়াকে সঙ্গী করে কলোন পৌঁছোতে হবে আগামীকাল। আমি মানে মানে নিজের কামরায় ফিরে নিজের জায়গাটিতেই বসে পড়লাম। আর তখনই চোখে পড়ল সামনের র‍্যাকে ঠিক আমার মতো একটা সুটকেস যেটা নির্ঘাৎ ওই ভদ্রলোকের ফেলে যাওয়া লাগেজ। তৎক্ষণাৎ ঠিক করলাম ওই সুটকেসটাই হস্তগত করে আমি কলোন স্টেশনে নামব।

ট্রেন এখন ফ্লান্সের বর্ডার ক্রস করে জার্মানিতে ঢুকল। আমি বুকে আঙুল টিপে দেখে নিলাম পাসপোর্ট, টিকিট সব ঠিক আছে কিনা। ভীষণ বাসনা হল সামনের র‍্যাকের সুটকেসটা খুলে দেখি ওতে কী আছে। আমার কাজে লাগে কিনা। কিন্তু ভয় হল। আমার চাবিতে যদি সুটকেসটা না খোলে তাহলে পাশের লোকজনের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। ঠিক করলাম সুটকেসটা নিয়ে একেবারে হোটেলে গিয়েই খুলব।

একটু পরে আখেন স্টেশনে জার্মান পুলিশ এসে পাসপোর্ট চেক করতে লাগল। আমার কাছে আসতেই আমি পাসপোর্টটা কোর্টের ভেতরের পকেট থেকে বার করে দিলাম। পুলিশটা কোনও ছাপ না মেরেই আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, ডাঙ্কেসন। অর্থাৎ থ্যাঙ্ক ইউ।

আমি পাসপোর্টটা হাতে নিয়ে বোকার মতো বসে রইলাম খানিকক্ষণ। তারপর সেটাকে পকেটে গলিয়ে দেওয়ার বদলে খুলে ফেললাম। আসলে একটা গুপ্ত ভয়

তখন আমার বুকের মধ্যে লাফালাফি করছে। লোকটা আমার পাসপোর্টে ছাপ মারল না কেন?

ইউরোপের কোনও নাগরিক হলে ট্রেনে অন্তত ওই ছাপটাপ মারার রেওয়াজ আর নেই। কারণ ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ভিসার চল উঠে গেছে অনেক দিন যাবৎ। কিন্তু আমি তো ভারতীয়, আমার বইতে তো ছাপ মারতেই হবে। আমি ভয়ে ভয়ে চোখ চালালাম পাসপোর্টের পরিচয়পত্রের অংশের দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গেই আমার ভেতরের রক্ত প্রায় হিম হয়ে বসল। আমি দেখলাম আমার পাসপোর্টে নাম লেখা আছে মঁসিয়ুর মার্সেল রেমঁ এবং ছবির জায়গায় সাঁটা আছেও কিছুক্ষণ পূর্বেও আমার সামনে বসে থাকা সেই ভদ্রলোকটির ফোটো। যে চেহারা আমার আশঙ্কা, আমারই হয়ে উঠবে আরও বছর ত্রিশেক বাদে। আমি দড়াম করে পাসপোর্টটা বন্ধ করে বুকপকেটে গুঁজে দিলাম। আমার সমস্ত শরীর ঘেমে উঠেছে। আমার ভেতরে মৃত্যুভয়ের সমতুল্য একটা ভয় জেগে উঠেছে।

এর পর কখন কোন স্টেশন পার হলাম, কখন কাকে টিকিট দেখালাম, কখন রাত দুটো বাজল, কীভাবে কলোন স্টেশনে নেমে ট্যাক্সি ডেকে পূর্বনির্ধারিত এক হোটেলে এসে মার্সেল রের্মর নামে ঘর বুক করে এই ঘরে এসে উঠলাম— আমার আর সঠিক মনে পড়ছে না। এইমাত্র আমি আমার চাবি ঘুরিয়ে রের্মর সুটকেস খুলে দেখলাম আমারই জামাকাপড়, বইপত্র ও সেভিং সেটে ওঁর সুটকেস বোঝাই। বুঝতে পারছি না কিছুতেই, সুটকেসটা ওঁর না আমার!

কিন্তু এখন আর কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছি ওতে আমার নয়, মার্সেল রের্মর প্রতিবিম্ব পড়েছে। কিংবা বলা চলে আমি সাত ঘণ্টার মধ্যে ত্রিশ বছরের বেশি বয়সের একটা মানুষ হয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছি। আমার চুলে ইতস্তত পাক ধরেছে, চামড়া কিছুটা আলগা হয়ে গেছে, চোখের পাওয়ার কিছুটা বেড়েছে এবং গায়ের রং কিছুটা ফর্সা হয়ে গেছে। আমি রাজীব মিত্র, একজন বয়স্ক সাহেব বলে কলোনের এক নামি হোটেলের কক্ষে প্রশস্ত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

আমার ভয়ানক ক্লান্তিবোধ হচ্ছিল। আমি জামাকাপড় খুলে উলঙ্গ হয়ে বিছানায় টান হয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে পড়তে পড়তেও আমার মনে হল এই ঘুম থেকে আমি হয়তো আর জাগব না।

কিন্তু জাগলাম। প্রতিদিনের মতোই জাগলাম। ঠিক সাতটায়। শুয়ে শুয়ে বিছানায় বেড–টি খেলাম। আর একটু পরে ব্রেকফাস্টের সঙ্গে সকালের কাগজ এল। ওমলেট আর চা খেতে খেতে জার্মান কাগজের পাতা ওলটাতে লাগলাম। পড়তে তো পারছি না। হঠাৎ একটা ছবি ও খবরে এসে দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। এ কী! এ তো আমারই মুখ ছাপা হয়েছে কাগজে! কেন ছাপল? কোথায় পেল আমার ছবি?

আমি বেল টিপে ওয়েটারকে ডাকলাম। বললাম এই খবরটা পড়ে আমায় ইংরেজিতে মানে করে দাও। ছেলেটি ওর ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে মানে করতে গিয়ে বলল, প্যারিসের সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ছাত্র ভারতের রাজীব মিত্র গতকাল রাত্রে স্যাঁকেত স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে নিজের নেকটাই দিয়ে একটি ফরাসি মেয়েকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে এবং পরে ওই নেকটাই নিজের গলায় বেঁধে ওয়েটিং রুমের সিলিংয়ে ঝুলে পড়ে। জানা যাচ্ছে ফরাসি মেয়েটির সঙ্গে রাজীবের প্রেম ছিল। ওদের দেখা করারও কথা ছিল স্যাঁকোয়, রাত সাড়ে ন'টায়।

ওয়েটার চলে গেছে। আমি আমার ব্রেকফাস্ট ও সকালের কাগজ হাতে নিয়ে খাটে বসে আছি। আমি জানি না আমি এর পর কোথায়, কেন যাব? আমার ভীষণ দুঃখ হচ্ছে নিজের জন্য। আমার চোখে জলও ভেসে উঠছে। কেন আমি অকারণ অন্য লোকের বাকি জীবনটা অতিবাহিত করতে যাব? আমি তো তাঁর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়বর্গ, পারিপার্শ্বিক কিছুই চিনি না। এটা কি কোনও জীবন হতে পারে?

হঠাৎ আমার নজরে পড়ল আমার গলায় নেকটাইটা। বাঁচালে এই খুদে জিনিসটাই আমাকে বাঁচাতে পারে। আমি হঠাৎ উৎসুক হয়ে সিলিংয়ে একটা আংটা খুঁজছি। আছে কী? না থাকলে? ■

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

কাছে আসার গল্প

হপ্তার প্রায় প্রতিদিনই বিভীষিকার একটা সকাল শুরু হয় আদিবার জন্য। যার এক প্রান্তে থাকে মধ্যবাড্ডা, অন্য প্রান্তে মতিঝিল। মতিঝিলের এক বহুতল দালানের সাত তলায় পৌঁছোতে পৌঁছোতে অবশ্য সকালটা অনেকটাই বদলে যায়, কাজে ডুবে গেলে অনেক কিছুই ভুলে থাকা যায়। আদিবার জন্য বিভীষিকার শুরু এক দীর্ঘ বাসযাত্রায়। প্রায়শই ঠায় দাঁড়িয়ে, মাঝে মধ্যে পুরুষ হাতের অশ্লীল স্পর্শে ক্লিষ্ট হয়ে, নিজেকে আর নিয়তিকে ধিক্কার দিতে দিতে সে বাস থেকে নামে। কিন্তু বহুতল দালানের অপরিসর লিফটে উঠে অভিজ্ঞতাটা তার কখনও কখনও ফিরে আসে। তাকে ঘিরে থাকা পুরুষগুলির কেউ কেউ তার গায়ে হাত রাখতে পারলে যেন বিমলানন্দ পায়। সেই সুযোগটা না থাকলেও ইচ্ছেটা যে থাকে, তা বোঝা আদিবার জন্য কঠিন হয় না।

এই যদি হয় তার দৈনন্দিনতার প্রথম অঙ্ক, শেষ অঙ্কটাও অনেকটা তাই। যেহেতু অফিস ছুটির পর উঠতে হয় ফেরার বাসে। বাসের পুরুষারণ্যে। তবে একটা পার্থক্য আছে। অনেকদিনই গন্তব্যের আগেই সে নেমে পড়ে। তারপর হাঁটে। এবং ভাবে, অন্তত চোদ্দটি ঘণ্টা তার চারদিকে নিজের একটা ভূগোল রেখা টেনে সেখানেই থাকা যাবে।

সেই ভূগোলটাও অবশ্য মাঝে মাঝে ভেঙে পড়ে। একটা অসুখী পরিবারে যেমনটা হয়। বাবা ও মায়ের মধ্যে গৃহবিবাদ গৃহযুদ্ধে রূপ নিলে যেমনটা হয়। তবে আদিবাকে বাঁচিয়ে রেখেছে কলেজ পড়ুয়া মামাতো ভাই আরমান। হয়তো সে আদিবার বিভীষিকা-যাত্রা শুধু নয়, অল্পবয়সে তার বিয়ে হওয়া আর এগারো মাসের মাথায় সংসার ভাঙা, টিকে থাকার জন্য একটা চাকরির নিগড়ে বন্দি হওয়া আর বাবা-মার চোখে সংসার ভাঙার জন্য তার দায়ী থাকার কষ্ট আর বেদনাটাও বোঝে। কতটা ভালো হলে একটা মানুষ আরেকটা মানুষের সমব্যথী হতে পারে?

অফিস-দালানে ঢুকে আদিবা দেখল লিফটটা বন্ধ হচ্ছে। যদিও খোলা থাকলেও ভেতরে জায়গা পাওয়া সম্ভব হতো কিনা সে জানে না। তার মনটা খারাপ হল। একটু জোরে পা চালালে লিফটটা ধরা যেত। এখন দশ-বারো মিনিট অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কিন্তু তাকে অবাক করে লিফটের দরজাটা আবার ফাঁক হল এবং সেই ফাঁক গলিয়ে লিফটম্যান মনা মুখ বাড়িয়ে বলল—আপা, আসেন।

লিফটে ঢুকতে ঢুকতে অবাক হল আদিবা। মনা তো কখনও এরকম দয়া দেখায় না। নিশ্চয়ই আজ

তাকে দেখে ছেলেটার করুণা হয়েছে। লিফটের দমবন্ধ পরিসরে সারাদিন চাকরি করা মানুষটারও তাহলে সে করুণার পাত্র!

দিনের শুরুটা তাহলে হল বিষাদের।

তিনতলা পর্যন্ত লিফটটা উঠতে উঠতে সে টের পেল, কারো হাত তার কোমরে একটা ঠিকানা খুঁজে নিচ্ছে। বেশ কিছুদিন পর ঘটনাটা ঘটল এবং তার ভিত্তিমূল ধরে টান দিল। আইটির আঁখি আপা বলেছেন, কিছু পুরুষ মেয়েদের কোমরে হাত দেয় লাভ হ্যান্ডেলের খোঁজে। লাভ হ্যান্ডল? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছে আদিবা। হ্যাঁ, হেসে বলেছেন আঁখি, কোমরের দুই দিকে চর্বি জমে গেলে হাত দিয়ে ধরার মতো বেশ একটা আকার নেয়। তাকে বলে লাভ হ্যান্ডল। দু'হাত দিয়ে তা ধরাটা পুরুষের পছন্দ। নিজের স্ত্রীদের হলে তা হয় সোহাগ, অন্য মেয়েদের বেলায় তা নিখাদ নোংরামি। তবে তোমার সেই সম্ভাবনা শিগগির দেখছি না। কিন্তু আমার দিকে তাকাও! ভারি কাপড়ে জড়িয়ে রাখলেও রেহাই মেলে না।

লোকটার হাতের ছোঁয়া লাগাতেই আদিবার শরীর জুড়ে একটা ঘিনঘিনে ভাব এল। তার নিঃশ্বাস বন্ধ হল। একটু যে ডানে-বাঁয়ে যাবে, সেই জায়গাটুকুও নেই। হাতটা একটুখানি স্বাধীনতা নিতে শুরু করলেই ক্ষিপ্ত হল আদিবা। কঠিন গলায় বলল, হাতটা সামলে রাখুন। কাকে বলল, সে জানে না। যেহেতু লোকটা দাঁড়িয়েছে তার পেছনে। কিন্তু একটা কদর্য হাসি তার কান স্পর্শ করে গেল। হাতটাও সরে গেল। আদিবার স্বস্তিটা ফিরে আসতে আসতে সে টের পেল, পাঁচতলায় লিফটটা থামলে দরজাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে কেউ একজন যেন হুমড়ি খেয়ে বাইরে পড়ল, নাকি একজনকে লিফটের ভেতর থেকে ছুঁড়ে ফেলা হল। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাই সত্য হল, যখন সে শুনল, ভরাট গলায় একজন বলছে, আর কোনওদিন এই লিফটে উঠবি না এবং মনাকে আদেশ দিল, এই বদমাশটাকে লিফটে তুললে তোর খবর আছে। লিফটটা সাততলা আসতে আসতে আদিবা একটা প্রার্থনা করল, ভরাট গলাটা থেকে কোনও আশ্বাস অথবা করুণার বাণী যেন তার দিকে উড়ে না আসে। তার প্রার্থনাটা ফলল। সাততলায় লিফট থামল, দরজা খুলল। আদিবার সঙ্গে তিন-চারজন আরও নামল। কিন্তু তার সাহস হল না তাদের দিকে, অথবা লিফটের ভেতরে থাকা ভরাট গলাটার দিকে তাকাতে। তাকে মোকাবিলা করতে আদিবার ভয় হচ্ছে।

একটুখানি হেঁটে যেতে হয় করিডোর ধরে। অর্ধেকটুকু যাওয়ার পর একাউন্টসের নিরঞ্জন বলল, আপা, জীবন বিমার আলমাস সাহেবের একটা ভালোই শাস্তি হল। তার অফিসটা ন'তলায়।

ভদ্র আর বিনয়ী ছেলে নিরঞ্জন। তার সঙ্গটাও নিরাপদ আনন্দের। কিন্তু তার ভদ্র কণ্ঠটাও আজ যেন আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। দ্রুত পা চালিয়ে অফিসে ঢুকল আদিবা। সোজা গেল বাথরুমে। হাতে-মুখে-চোখে ভালো করে জল ঢালতে হবে। যতটা পরিষ্কার হওয়া যায়, হতে হবে।

প্রতিটা দিন তার যুদ্ধের দিন। এই যুদ্ধ কি তাকে শেষ করে দেবে?

দিনের কাজে সকালের কথাটা সে ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু অফিস শেষে লিফটে উঠতেই তার মনে পড়ল। বলা যায় তাকে মনে করিয়ে দিল লিফটম্যান মনা। সে তাকে দেখে একটা বিনীত সালাম দিল। তার পাশে একটুখানি স্বস্তিকর জায়গা করে দিল। মনাকে এতটা মনোযোগী সে কোনওদিন দেখেনি। বস্তুত, কেউই দেখেনি। কেন এই বিনয়? আদিবার হঠাৎ কারণটা মনে পড়ল। নেহাল ভাই। নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ এই নেহাল ভাই লোকটি। অথবা ভীতি জাগানিয়া। তার ইচ্ছা হল, মনার থেকে জেনে নেয় কে এই নেহাল? কী এমন তার ক্যারিশমা যে, তার একটা কথায় মনার চরিত্রটাই বদলে গেল?

কিন্তু মনাকে জিজ্ঞেস করবে কী, নেহালের কথা মনে হতেই তার ভেতরটা ভয়ে শুকিয়ে গেল। ভাগ্য নেহালকে সে দেখেনি।

২

হপ্তাটা তার নির্বিঘ্নে কাটল, পরের হপ্তাটাও। মনা তাকে সম্মান করেই চলছে, তার জন্য একটুখানি জায়গা করেই দিচ্ছে। কিন্তু যার কারণে এই পরিবর্তন, সেই নেহাল ভাই? তাকে আর দেখা যায়নি। তার কথাও শোনা হয়নি। মনা নিশ্চুপ। আর জীবন বিমার আলমাস সাহেব নিশ্চয়ই জীবন বাঁচানোর শিল্পটা জানেন। ন'তলা নিশ্চয়ই সিঁড়ি ভেঙে উঠছেন। আর কিছু না হোক শরীরে চর্বি জমা থেকে কিছুটা রেহাই তো তিনি পাবেন।

কিন্তু একদিন জোরে সোরেই ফিল্ডে এল নেহাল। আদিবার অফিস-দালানের তিন থেকে পাঁচ তলা পর্যন্ত যে একটা আধা সরকারি কর্পোরেশন আছে, তাতে একটা নির্বাচন হতে যাচ্ছে। দালানটা স্লোগানে মুখর। ভেতরে বাইরে মানুষের ঢল। বেশির ভাগই আসছে বাইরে থেকে। দালানের লবিতে দড়ি লাগিয়ে ফেস্টুন-ব্যানার ঝোলানো হয়েছে। বদ্ধ জায়গাটাতে বাতাসের অভাব দেখা দিচ্ছে।

অফিসে পৌঁছোতে একটু দেরিই হয়ে গিয়েছিল। সেই জন্য যাতে লিফটটাতে তাড়াতাড়ি ওঠা যায় সেই আশা নিয়ে সে লবিতে ঢুকেছিল। কিন্তু লিফটের গোড়ায় গিজগিজ মানুষ। একটা দম নিয়ে সে সিঁড়ির দিকে এগোল। তার মনে পড়ল তার দু'তিনজন সহকর্মী কাল তাকে লিফটে উঠতে না পেরে সিঁড়ি বেয়ে ওঠার বিষয়টা বলেছে। সাত তলা তো। আলমাস সাহেব তার থেকেও দু'ধাপ বেশি সিঁড়ি বাইতে পারলে সে কেন নয়?

কোন কুক্ষণে যে সে আলমাসের নামটা মনে এনেছিল। কারণ আলমাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে নামটি, নেহাল ভাই, সে হঠাৎ হাজির হল। শুনুন, সে পাশ থেকে বলল, লিফটে করে যান। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ব্যবস্থা আমিই করছি, নেহাল ভাই, কেউ আরেকজন বলল। নেহাল ভাই এবার আদিবার সামনে দাঁড়িয়ে। একটা আতঙ্কের মতো। চোখটা ভয়ে ভয়ে সেদিকে মেলল আদিবা। কিন্তু যাকে দেখল, তাকে আর যাই হোক আতঙ্ক বলা যাবে না। ঘাড়ে মাথায় উঁচু একটা মানুষ, চোখ দু'টি দূরে মেলা। সেই চোখে ভীতি জাগানোর মতো কিছু নেই। যা আছে, তাকে কি উদাসীনতা বলা যায়? সিঁড়ি বেয়ে কেন সাত তলায় উঠবেন? বেশ উঁচু থেকে সে বলল। যান, হামিম ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। তারপর তার দিকে পেছন ফিরে সামনের ভিড়টার দিকে এগিয়ে গেল।

এবার তাকে পথ দেখাচ্ছে হামিম। নেহাল যদি বাঁশ হয়, হামিম নিশ্চয়ই কঞ্চি। নিজেকে নেহালের থেকেও বড় প্রমাণ করতে সে হম্বিতম্বি শুরু করল। লিফটের সামনাটা ফাঁকা হল। হামিম তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। লিফটা খুললে, নিচে আসা যাত্রীরা বেরিয়ে গেলে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে সে আদিবাকে বলল, আপা, আসেন।

বাকিটা দেখল মনা।

এবার অফিসে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে বেসিনের ঝাপসা আয়নাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল আদিবা। তার বুক কাঁপছে। না ঠিক আতঙ্কে নয়, বরং সারা দালান জুড়ে তার একটা যে পরিচিতি ছড়িয়ে পড়বে, এই বিষয়ে সে নিশ্চিত। তাই পরিচিতিটা মহা অস্বস্তির, লজ্জারও।

লাঞ্চের সময় বিনয়ী নিরঞ্জন আবার ত্রাস ছড়ালো। বেশ উত্তেজনা নিয়ে সে বলল, আপা, আজ বুঝেছি আমাদের মাহমুদ স্যার নেহাল ভাইকে অনেক ভয় পান।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালো আদিবা। প্রশ্নটা এই: আমাকে এ কথাটা কেন বলা?

আমতা আমতা করে নিরঞ্জন বলল, আজ মাহমুদ স্যার লিফটের সামনে ছিলেন। আপনাকে জায়গা দেওয়ার জন্য তাকে সরে যেতে হয়েছে। তারপর তাকে ডেকে নেহাল ভাই স্যরি বলেছে। নেহাল ভাই যে তাকে স্যরি বলেছে, কথাটা তিনি জনে জনে বলে বেড়াচ্ছেন। এমন ভাব করছেন, যেন তিনি নেহাল ভাইয়ের বড় ভাই, অথবা এরকম কেউ।

একটুখানি হেসে বলল নিরঞ্জন, বুঝলেন তো আপা,

সূর্যের আলো পড়ে বালি গরম হলে তার উত্তাপ বেশি হয়।

কথাটা কি মাহমুদ সাহেব সম্পর্কে বলল নিরঞ্জন, নাকি তার সম্পর্কে? ভাবল আদিবা। নেহাল ভাই যে মাহমুদ স্যারকে স্যরি বলেছে, সে তো তার কারণে। তাহলে বালিটা কে?

নাহ্। এ সমীকরণটা তাকে শেষ করে দেওয়ার মতো যথেষ্ট। অফিসে তাকে সাবধানে থাকতে হবে। নিরঞ্জন আর মাহমুদ স্যার থেকে দূরে থাকতে হবে। বিশেষ করে মাহমুদ স্যারের থেকে। আঁখি আপা বলেন, এই লোকটাকে বিশ্বাস করা কঠিন। কখন কী যে করে বসে, কে জানে।

মাহমুদ স্যারের থেকে দূরে থাকার চিন্তাটা করা যায় বটে, কিন্তু চিন্তা মতো কাজ করাটা মোটামুটি অসম্ভব। ক্ষমতার সিঁড়িতে তার ওপর যদিও আরোও তিনজন আছেন, আদিবার সেকশনটা আছে তারই জিম্মায়। তিনদিনে একদিন সেকশনের সবার সঙ্গে বসেন। কিছু কাজের কথা সারেন, কিন্তু এক দেড় ঘন্টা একটা চিকন চিরুণী চালিয়ে প্রত্যেকের যত গাফিলতি সব খুঁজে বের করেন। যেমন, আদিবার যে কোনও কম্যুনিকেশন স্কিল নেই, প্রতিবার তা প্রমাণসহ তুলে ধরেন। প্রমাণ অবশ্য থাকে মাহমুদ সাহেবের খাতাতে। আদিবার বা অন্য কারো তা জানা হয় না।

নেহালকান্ডের পর প্রথম মিটিং-এ আদিবার যোগাযোগ, ব্যর্থতা সম্পর্কে একটি কথাও মাহমুদ স্যার তুললেন না। একবারও বললেন না, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ ডিগ্রি নেন না কেন, কর্পোরেট কম্যুনিকেশন কী জিনিস, ম্যানেজমেন্ট বলতে কী বোঝায়, সেসব কিছু তো জানা যেত। এভাবে ক'দিন চালাবেন? না, আজ শুধু আদিবা না, প্রায় সবাইকে ছাড় দিয়েছেন মাহমুদ স্যার। সেজন্য মিটিংটাও হল সংক্ষিপ্ত। মাহমুদ স্যার ফাইলপত্র গুছিয়ে চলে যেতে সবগুলি চোখ আদিবার দিকে ঘুরল। আদিবা বুঝল, এবার তার অফিসের ভেতরই বিভীষিকা ঢুকে পড়ল, যদিও কেউ কোনও মন্তব্য করছে না, হাসছেও না। কারও আচরণেও কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু মাহমুদ স্যারের আচরণ কেন হঠাৎ পাল্টে গেল, তা বুঝতে না পারার তো কোনও কারণ নেই। নিরঞ্জনের মতো নিরীহ লোকও যদি কারণটা এত সহজে ধরতে পারে, হাসানুজ্জামান অথবা লায়লা আকতারের জন্য তা তো দু'য়ে দু'য়ে চার করার মতো ব্যাপার। এই দুই সহকর্মীর সুনাম আছে মানুষকে নিয়ে কিচ্ছা বলার।

দিন পাঁচেক পর মাহমুদ স্যার ডেকে পাঠালেন আদিবাকে, জরুরি একটা বিষয়ে কথা আছে। কী সেই কথা, আদিবা ভেবে পেল না। একটু উদ্বেগ নিয়েই তার অফিসে গেল সে। উদ্বেগটা গাঢ় হল যখন মুখে একটা কোমল হাসি ধরে মাহমুদ বললেন, বসো আদিবা, বসো। চা-টা কিছু খাবে?

আদিবার মনে পড়ল, যে ক'দিন সে মাহমুদ স্যারের ঘরে এসেছে, দাঁড়িয়েই থাকতে হয়েছে। চা পানর আমন্ত্রণ তো কল্পনার ব্যাপার।

শুকিয়ে যাওয়া গলায় আদিবা বলল, না স্যার। চা একটু আগেই খেয়েছি।

মাহমুদ সাহেব খুশি হলেন। চা খাওয়ার কথা তিনি নেহাল সাহেবের কারণেই বলেছেন। খেতে চাইলে তাকে বরং বিপদেই ফেলত আদিবা। তার যে পিয়নটা চা নিয়ে আসবে, তার গালগপ্পের একটা খোরাক সে নিশ্চয়ই পেয়ে যেত।

নেহাল হুমায়ুন তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন, মাহমুদ বললেন।

নেহাল হুমায়ুনটা কে স্যার? আদিবা জিজ্ঞেস করল। যদিও প্রশ্নটা করতে করতেই সে বুঝে নিয়েছে, ওই নেহাল ভাই ওরফে ভরাট গলাই নেহাল হুমায়ুন।

বিরাট নেতা। পাওয়ারফুল ম্যান। তুমি চেনো না?

না স্যার, আদিবা বলল, কিন্তু তিনি কেন আমার কথা জিজ্ঞেস করলেন?

আই থিংক হি লাইকস ইউ, একটু হেসে বললেন মাহমুদ। তোমাকে এই অফিসে দেখেছেন। একসময় শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ছিলেন। এই দালানে যে কর্পোরেশনটা আছে, তার জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। এখন অনেক ওপরে মুভ করেছেন, কিন্তু মাঝে মধ্যে আসেন।

আদিবা চুপ করে রইল। তার ভেতরটা ভয়ে কাঁপছে। অনেক কষ্টে সামলে রাখছে সে নিজেকে।

নেহাল হুমায়ুন দু'দিন আগে আমাকে ফোন করেছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছেন আমাদের স্টাফ বাসে তোমাকে একোমোডেট করা যায় কিনা, মাহমুদ বললেন। তারপর একটু থেমে, একটা কৈফিয়ত শোনানোর মত করে যোগ করলেন, তুমি তো জানো, এই জানতে চাওয়ার একটাই অর্থ, তোমাকে যেন ট্রান্সপোর্ট ফ্যাসিলিটি দেওয়া হয়। স্টাফ বাস মানে একটা মাইক্রোবাস, সেটা চলে মতিঝিল–উত্তরা রুটে। আর তুমি থাকো বাড্ডায়...। বাড্ডাতেই তো, তাই না?

মাহমুদ সাহেবের কথায় আদিবা সন্ত্রস্ত্র হল। সে জানে, নেহাল ভাইয়ের আদেশক্রমে অফিসের বাসে তার জায়গা পাওয়াটা, তার বাসা যদি মধ্য বাড্ডায় না হয়ে উত্তরাতেও হতো, তাহলেও বিপদসঙ্কুল পাবলিক বাসে চড়া থেকে অনেক বেশি ভীতিকর। মাহমুদ সাহেবকে থামিয়ে সে বলল, স্যার, অফিসের বাসে যাওয়ার আমার প্রশ্নই ওঠে না, এ নিয়ে ভাববেন না।

মাহমুদ সাহেব স্বস্তি পেলেন। স্বস্তির আনন্দে তিনি একটু হাসলেন। আমি ভাবছি অন্য কথা। তিনি বললেন, নেহাল সাহেব, যাকে পুলিশও ভয় পায়, এমনই দুর্ধর্ষ এক মানুষ। তিনি যখন ফোনে আমার সঙ্গে কথা বললেন, তার গলা যেন চেনাই গেল না। এমনি ভদ্র আর বিনয়ী। কী জন্য এই পরিবর্তন বলো তো? মাহমুদ স্যারের প্রশ্নটা বিরক্তিকর। বিরক্তির ভাবটা মনে আসতেই তার ভীতিটা কেটে গেল। সে কেন এর উত্তর দেবে? স্যরি স্যার। সে বলল, এ প্রশ্নের উত্তরটা নেহাল সাহেবকেই জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমি কী করে বলি?

না মানে, ব্যাপারটা যেহেতু তোমাকে নিয়েই...। ঠিক আছে, অন্য প্রসঙ্গে যাই। মাহমুদ বললেন, কিন্তু নেহাল প্রসঙ্গেই আটকে থাকলেন। দুর্ধর্ষ হলেও মানুষটা গুণী। আমার থেকে অন্তত পনেরো বছরের ছোট। আই অ্যাম রানিং ফিফটি, ইউ নো, কিন্তু একটা টাকার পাহাড়ের মালিক। মন্ত্রীরা তাকে পাশে বসান, ছাত্র আর যুব নেতারা ভাই ভাই করে। দেখেছ তো, হাও হ্যান্ডসাম, টল অ্যান্ড মাথাভর্তি চুল। ভালো কাজে থাকলে দেশের জন্য কত কিছুই না করতে পারত।

মাহমুদ স্যারের কথা শুনতে শুনতে নেহাল হুমায়ুনের একটা ছবিও আদিবা দেখছিল, টল অ্যান্ড হ্যান্ডসাম। একদিন যেটুকু দেখেছে, স্যারের বর্ণনার সঙ্গে খুব অমিল নেই। কিন্তু যত টলই হোক আর মাথাভর্তি চুলই থাকুক অথবা টাক— আদিবা এই মানুষটি থেকে এক মেরু দূরেই থাকতে চায়।

লোকটাকে নিয়ে তোমার কোনও আগ্রহ নেই? অবাক! কোনও প্রশ্নও করছ না কেন?

স্যার, আপনিই তো বললেন লোকটা দুর্ধর্ষ, তারপর কী করে আগ্রহ থাকে, বলুন স্যর?

না না, দুর্ধর্ষ তার পেশাগত জীবনে। মানে প্রফেশনটা যাই হোক, রাজনীতিই ধরে নিচ্ছি। রাজনীতিটা এখন আর জনসেবা নয়, তাই না? একটা লাভজনক পেশা হয়ে গেছে। তা যাই হোক, লোকটা খারাপ নয়। পড়াশোনা করেছে। এই কর্পোরেশনে অফিসারের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল। তাকে অফিসার না করে কেরানির পোস্ট দিয়েছে। লোকটা নিয়েওছে, খুব দরকার ছিল একটা চাকরির। চাকরিটা সে নিয়েছে এবং তিন বছরের মাথায় সব অফিসারকে, বলতে পার, সুতোয় বেঁধে পুতুলের মতো নাচিয়েছে।

আদিবা হাসল।

আদিবার হাসি একটা সংকেত পাঠালো মাহমুদ স্যারকে। তিনি একটু কাশলেন। বললেন— ঠিক আছে,

আদিবা। নেহাল সাহেব ফোন করলে তোমার উত্তরটা রিলে করে দেব।

স্কুলে, খুব মন খারাপের দিনে, ছুটির ঘণ্টা তাকে যে উদ্ধার দিত, মাহমুদ স্যারের 'তুমি এখন আসতে পার' ইঙ্গিতটা তাকে তাই দিল। তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে তার দু'টি কথা মনে এল। মাহমুদ স্যারের নেহাল-গল্পটা যেন লোকটার ক্রমশ দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠার একটা রেখাচিত্র। কিন্তু তার থেকেও বেশি যে কথা তাকে ভয় দেখিয়ে সারা দুপুর, বিকাল অধিকার করে রাখল তা হচ্ছে, তার প্রতি লোকটার নজর পড়া। নজর শুধু পড়েইনি, এর সূত্র ধরে সে মাহমুদ স্যারকে একটা ফোনও করে বসেছে। সে যে বাড্ডায় থাকে, তাও সে জেনেছে।

কেন?

বাড়িতে ফিরতে ফিরতে একবার ভেবেছিল, আরমানের সঙ্গে কথা বললে তার উদ্বেগটা হয়তো হাল্কা হবে। কিন্তু দ্বিতীয় চিন্তায় তা খারিজ করে দিল। ছেলেটা ভয় পেয়ে যেতে পারে।

একটা সপ্তাহ পার হল, মাহমুদ স্যারের সঙ্গে একটা ঘটনাবিরল মিটিংও হল। মিটিং-এর আগে পরে আদিবার সঙ্গে কোনও আলাদা কথাও তিনি বললেন না। তাতে তার মনে হল, ফাঁড়াটা নিশ্চয়ই কেটেছে। সে অফিসের বাসে যেতে রাজি না হওয়ায় নেহাল নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়েছে। হয়তো তাকে রেহাই দিয়েছে, তাতে তার স্বস্তিটা ফিরল, কিন্তু শুক্র-শনির উদ্বেগহীন সময়টা মিলিয়ে গেল রবিবার দুপুরে।

আঁখি আপার সঙ্গে একটা বাজিতে জিতে আদিবার দুই অফিস বন্ধু একটা লাঞ্চ আদায় করে নিয়েছিল। রোববার তারা গেল জনতা ব্যাংকের পেছনে নতুন একটা রেস্টোরেন্টে, যার পাক্কি বিরিয়ানি দু'টোর মধ্যে সাবাড় হয়ে যায়। অথচ আদিবার হাত ভর্তি কাজ। প্রথমে সে যেতে চায়নি, যেহেতু বাড়ি থেকে নুডলস নিয়ে এসেছে, কিন্তু বন্ধু ইসরাতের পীড়াপীড়িতে রাজি হয়েছে। তাকে বলেছে, ওরা আগে গিয়ে টেবিল জুড়ে বসুক, অর্ডার দিক, মিনিট পনেরোর মধ্যে সে এসে যোগ দেবে।

কোন কুক্ষণে যে এই বাড়তি সময়টা চেয়ে নিয়েছিল আদিবা। কারণ দালানের সিঁড়ি থেকে নামতেই সে দেখল, একটা ছোটখাটো ভিড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নেহাল হুমায়ুন। সিঁড়ির দিকেই আসছে। আদিবা দ্রুত ভিড়টাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল, কিন্তু নেহালের সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়েছে। নেহাল যে দৃষ্টিতে তাকে দেখল, ওই কয়েক সেকেন্ডের মত, তাতে সে বুঝল এই দৃষ্টির একটা অর্থ আছে, ইতিহাস আছে। এ দৃষ্টি হঠাৎ চোখে আসে না, চলেও যায় না।

রাস্তায় বেরিয়ে সে পা চালাল। একটু জোরে হাঁটলে সাত-আট মিনিটের মধ্যে যাওয়া যাবে।

পায়ের গতি যত তার দ্রুত হল, মনের মধ্যে অস্বস্তির একটা ভাবও তত বাড়ল। আদিবা বুঝল, মাহমুদ স্যার ঠিকমতই পড়েছেন নেহালকে।

প্রমাণটা সে পেল হোটেলের নিচে পৌঁছোতে পৌঁছোতেই। ভরাট গলায় নেহাল তাকে ডাকল, আদিবা ম্যাডাম, একটু শুনবেন?

আদিবা চমকে ঘুরে তাকালো। তার কয়েক হাত পেছনে দাঁড়িয়ে নেহাল। তার একটু পেছনে একটা কালো পাজেরো, নিশ্চয়ই তাকে নামিয়ে দিয়েছে, এখন আড়ালে যাচ্ছে।

চারদিকে ভিড় নেই, সঙ্গীসাথী নেই, একা দাঁড়িয়ে। দুপুরের রোদ তার মুখটাতে আলো ছড়াচ্ছে। ভয়ে ভয়ে তাকালো আদিবা, ভয়টা উৎপাদিত একটা অমোঘতা থেকে। নেহাল হুমায়ুন তার তালুবন্দি আদিবার নিয়তিকে তার সামনে খুলে ধরবে এবং বলবে, এই নিয়তির মালিক এখন আমি। আসুন, গাড়িতে উঠুন।

অথবা এরকম কোনও যাবজ্জীবন দণ্ডের রায়।

নিয়তিটা ছিনতাই হয়ে যাচ্ছে— এটা ভেবে আদিবার ভেতর দীর্ঘদিন গুঁটিসুটি মেরে, একটা ভ্রূণের মতো হাঁটু গুটিয়ে শুয়ে থাকা, ভুলে যাওয়া, আদিবা জাগল। সে সোজা নেহাল হুমায়ুনের দিকে তাকালো। একটু অবাকই

হল। দুপুরের আলোয় মুখটা যেন দ্যুতি ছড়াচ্ছে। কোনও দুর্ধর্ষতার ইঙ্গিত তাতে নেই। বরং যা আছে, তা অনেক আগে, সেই কলেজে পড়ার যুগে, কামালুদ্দিন নামের এক সহপাঠীর চোখে মুখে সে দেখেছিল। বেশ কষ্টে চেপে রাখা মুগ্ধতা। কামালুদ্দিন দেখাতে চায়নি একজন উঠতি আবৃত্তিশিল্পী আদিবার রূপে ধরাশায়ী হয়েছে। নেহাল হুমায়ুনও দেখাতে চাইছে না আদিবার ব্যক্তিত্বের কাছে তার দুর্ধর্ষতা পিছু হটেছে। কিন্তু মুগ্ধতা যে তার চোখে আছে, আদিবা সহজেই তা পড়ল।

বলুন। আদিবা স্পষ্ট করে বলল এবং কব্জিতে বাঁধা ঘড়ি দেখল। অর্থাৎ যা বলার, সময় মেপে বলুন।

স্পষ্টতার জবাবটা আরও স্পষ্ট করে দিল নেহাল। আপনি লাঞ্চে যাচ্ছেন, সময় নেব না, সে বলল। সোজাসুজিই বলি, আপনাকে প্রথম দিন দেখেই আমার ভালো লেগেছিল। সেই ভালো লাগাটা কখন যে ভালোবাসায় দাঁড়িয়ে গেছে, বলতে পারি না। ব্যস, এইটুকুই। ধন্যবাদ, আমার কথাগুলি শোনার জন্য।

নেহালের কথাগুলি যতটা অবিশ্বাস্য মনে হল আদিবার কাছে, তার থেকে বেশি মনে হল পুরো বিষয়টাকে। এটিও তাহলে ঘটছে!

ঢাকা শহরের ত্রাস, ইতিহাস কাঁপানো বর্গিদের মতো মূর্তিমান দুঃসংবাদ নেহাল হুমায়ুন তাকে থামিয়ে, কোনও ত্রাস না ছড়িয়ে, কামালুদ্দিনের থেকেও আরও বেশি আবৃত্তিক্ষম গলায় তাকে বলছে, সে তাকে ভালোবাসে। এবং কথাটা জানিয়ে সে বিদায়ও হচ্ছে। যেখানে কামালুদ্দিন একটা কাঁঠাল-মাছির মতো উৎপাত করে গেছে টানা তিনটি মাস।

যত সাহস আর শক্তি নিয়েই পুরনো আদিবাটা জাগুক তার ভেতরে, এই মুহূর্তে সে কথা হারিয়েছে। একটুখানি শুধু হাসল পুরনো-নতুন দুই আদিবা। কিন্তু নড়ল না।

নেহালও না। শুধু গলাটা কিছুটা কম স্পষ্ট করে বলল, আমার সম্পর্কে যা শুনেছেন, তাতে 'যান, রাস্তা মাপেন' ধরণের উত্তর ছাড়া আর কিছু বলবেন, তা আশা করি না। তারপর একটুখানি থেমে, যেন একটা কৈফিয়ত দিচ্ছে, সেরকম করে বলল, মানুষটা আমি এরকম ছিলাম না। মোটেও না। কিন্তু সে আরেক গল্প। আপনাকে শোনানোর মানে হয় না। আপনি শুনবেনও না।

আমি আপনার সম্পর্কে প্রায় কিছুই শুনিনি, যেটুকু মাহমুদ স্যার বলেছেন, তার বাইরে।

নেহাল হাসল। মাহমুদ সাহেব লোকটা আর যাই হোক, সৎ মানুষ। এই একটা কারণে তাকে আমি পছন্দ করি। তিনি নিশ্চয়ই খুব খারাপ কিছু বলেননি। কিন্তু লোকে জানে আমি একটা মস্তান। বিগ টাইম মস্তান। এজন্য আপনার সঙ্গে আর কথা বলব না। মতিঝিলের ধুলোবালিরও কান আছে। কর্পোরেট কান।

আদিবা হেসে দিল। কর্পোরেট কান! মনে মনে বলল।

আপনাকে এই প্রথম হাসতে দেখলাম। একটা ছবি তুলতে পারলে বেশ হতো। সামনে হয়তো অন্তত দু'বছর জেলে কাটাতে হবে। তখন প্রতিদিন দেখতাম। যা হোক, এখন যাই।

জেলে কাটাতে হবে? অবাক হয়ে প্রশ্নটা করল আদিবা, এবং আরও অবাক হয়ে দেখল, তার ভেতরের পুরনো আদিবাই যেন নেহালের জন্য একটা উদ্বেগ থেকে তাকে দিয়ে প্রশ্নটা করালো।

আদিবার উদ্বেগটা নেহাল ধরতে পারল। একটু হাসল সে। পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে বলল, এটা রাখুন। যদি কখনও মনে হয় আমাকে একটা ফোন করে একটা-দুটো কথা বলা যায়, তাহলে করবেন। না হলে না। এবার যাই।

নেহাল তার পাজেরোতে পৌঁছালো লম্বা লম্বা পা ফেলে। এক মিনিটও তার লাগল না। কিন্তু সে পর্যন্ত পুরনো আদিবা দাঁড়িয়ে থেকে চোখ মেলে রাখতে বাধ্য করল আদিবাকে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে রেস্টোরেন্টের পথ ধরতে ধরতে তার মনে হল, নেহালের হাসিমুখ ছবিটা তুলে রাখতে পারলে কেমন হতো? ত্রাসের উল্টোপিঠে কী থাকে, মাঝে মাঝে তা জানার জন্য?

৩

পরদিন থেকে আদিবার সকাল বেলার বিভীষিকা উধাও হল, বিরক্তিটা যদিও থাকল। বাসে যে প্রতিদিন তার অপ্রীতির অভিজ্ঞতা হয়, তা নয়। মাঝে মাঝে উল্টোটিও ঘটে। ভালো মানুষ নেই, এমন পৃথিবী বাড্ডা গড়তে পারেনি, মতিঝিলও না, যদিও চেষ্টাটা প্রকট।

নেহালের শেষ হাসিটা পুরনো আদিবাকে জাগিয়েছে। বাসে কেউ লাল রেখা টপকে এসে দাঁড়ালে সে হুঙ্কার দেয়। কানের পাশে কেউ অশ্লীল একটা শব্দ করলে ঘুরে দাঁড়িয়ে তার মোকাবেলা করে। এক ছুটির দিনে আরমানকে নিয়ে সে উত্তরা যাচ্ছিল হাজেরা খালাকে দেখতে। তার জীবনে আরমানের পর সবচেয়ে বড় স্বস্তির নামটি যে খালা। একটি লোক তার গায়ে হাত রেখেছিল। হাতটা ধরে এমন একটা মোচড় দিয়েছিল যে, লোকটা ব্যথায় উফ্, বলে মেঝেতেই বসে পড়েছিল। আদিবা চায়নি একটা কিছু ঘটুক, তার ভাষায় একটা 'সিন ক্রিয়েট' হোক। আরমানকে নিয়ে বাস থেকে তাই সে নেমে পড়েছিল। প্রায় আধ মাইল তাদের হাঁটতে হয়েছে। কিন্তু আদিবার কাছে সেই হাঁটার সঙ্গে পাখিদের উড়ে বেড়াবার তফাৎ ছিল না।

আরমানকে সে নেহালের বিষয়টা বলেছে। তবে সবটা না। তবে আরমান বুঝেছে, নেহাল লোকটার চোখ পড়েছে আদিবার ওপর। তার কলেজটাও মতিঝিলের পাশেই। কলেজের উল্টোদিকে একটা রেস্টোরেন্টে মাঝেমধ্যে সে বন্ধুদের সঙ্গে চা খায়। রেস্টোরেন্টের মালিক আলাপী মানুষ, হাসিখুশি। তাকে সে একদিন জিজ্ঞেস করল, নেহাল হুমায়ুনকে তিনি চেনেন কিনা। প্রশ্নটা শুনে তিনি অবাক হলেন। প্রথমে বললেন, মতিঝিলের ইট পাথরগুলিও নেহাল ভাইকে চেনে। তারপর একটু কৌতুহল নিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, 'তো নেহাল ভাইয়ের খবর নিতাছ ক্যান?' আরমান চটপট উত্তর দিল, আমার এক মামা পত্রিকায় তার খবর পড়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি ভদ্রলোককে চিনি কিনা। আমি বলেছি, পরে জানাবো। আপনি তো চাচা জ্ঞানী মানুষ, দুনিয়াটা চেনেন, সেজন্য আপনারে জিগাইলাম।

রেস্টোরেন্টের মালিকের নাম মোয়াজ্জেম হোসেন। তাকে জ্ঞানী বলায় তিনি খুশি হলেন। বললেন, পত্রিকাগুলা সব আজাইরা জিনিস লেখে। নেহাল ভাইরে নিয়া শুধু কিচ্ছা ছাপায়।

তারপর দু'দিন তার পাশে বসে নেহাল হুমায়ুনের জীবনী শুনেছে আরমান। সত্য-মিথ্যা মেশানো। কল্পনায় রাঙানো। মোয়াজ্জেম হোসেনের কল্পনায় নেহাল আছেন বাদশাহ হুমায়ুনের মর্যাদায়।

আদিবাকে সেই হুমায়ুননামা শোনালো আরমান। আদিবা বুঝল, নেহাল, ঠিক তার মতই, দুই মানুষ। নতুন নেহালের জন্ম হয়েছিল নিশ্চয়ই সেই কর্পোরেশনে কাজ করতে এসে। মানুষের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, তাকে ছোট করে দেখা এবং তার প্রাপ্য জায়গাটা থেকে তাকে বঞ্চিত করার কষ্ট এবং অপমান থেকে। হয়তো আরও কারণ ছিল, মোয়াজ্জেম হোসেন আর মাহমুদ স্যার যা জানেন না। হয়তো বাবা মারা যাওয়ার পর তার জীবনের নিশ্চিতিটা হারিয়ে সে তার খোঁজে নেমেছিল। হয়তো চারদিকে একটা দেয়াল তুলে সে নিজেকে সুরক্ষা দিয়েছে। যেখানে কেউ পা ফেললে একসময় অনায়াসে তাকে সে বাইরে ছুঁড়ে ফেলেছে, লিফটের ভেতর থেকে আলমাস সাহেবকে সে যেরকম ছুঁড়ে ফেলেছিল। একটা মানুষ দুর্ধর্ষ তো জন্ম থেকে হয় না। তাকে দুর্ধর্ষ করা হয়।

যারা তা করেছিল, নিশ্চয়ই ভাবেনি, দুর্ধর্ষতায় তাদেরও একদিন সে ছাড়িয়ে যাবে।

তবে নেহালের সঙ্গে মিলটা একটা জায়গায় এসে অমিল হয়ে গেছে। নতুন আদিবার মধ্যে পুরনো আদিবার সাহসটা নেই। নেহাল যেখানে ক্রমাগত অপ্রতিরোধ্য হয়েছে, আদিবা সেখানে গুটিয়ে গেছে। নিজের ভূগোলের বাইরে এতটাই অরক্ষিত সে, যে একটা লোভী হাত তার সারা সকালটাকে কালো করে দিতে পারে।

নেহালের সঙ্গে মিনিট চারেকের কথাবার্তায় পুরনো আদিবা জেগে ওঠায় একটা লাভ তার হয়েছে। তার ভূগোলটাকে সে আরেকটু বড় করতে পারছে। লোভী একটা হাতকে মোচড় দিয়ে সে তার মালিকের ভেতর আতঙ্ক ছড়িয়েছে। কাজটা সে হয়তো সহজে আর করবে না। কিন্তু সেটি করার শক্তি যে তার আছে, সেই জ্ঞানটাই তো যথেষ্ট।

৪

আদিবা দেখল, তার সামনে দু'টি পথ আছে। হয় চুপচাপ থাকা। বলটা নেহালের কোর্টে ফেলে হাত গুটিয়ে বসে থাকা। না হয় সরাসরি কথা বলে নেহালকে জানিয়ে দেওয়া, তার আর নেহালের জীবন যে শুধু দুই রুটের বাসই নয়, তাদের যাত্রাও বিপরীত। সে থাকুক তার দুর্ধর্ষ জীবন নিয়ে। আদিবা থাকুক তার সকাল-বিকেলের উদ্বেগ, আর দিনরাতের নিশ্চিন্তি নিয়ে।

কিন্তু পুরনো আদিবা তার ভ্রূণ-অবস্থা থেকে বেরিয়ে এই ক'সপ্তাহেই যে এক দাপুটে মেয়েতে পরিণত হয়েছে, এবং তার সব হিসাব পাল্টে দিতে চাইছে, তার কী হবে? তাকে বলছে, ভয় নেই, একটা জীবন আমি দেখতে পাচ্ছি, যা মোটেও কষ্টের না। জীবনটা সহজ হবে না, কিন্তু দিন শেষে তোমাকে আঁচলে চোখ মুছতে হবে না।

আদিবা চমকে উঠল। এই ভাষা কবে সে রপ্ত করল? এই কবিতার মতো ভাষা? তার জীবনটাতে, আর যাই হোক, কবিতার কোনও জায়গা ছিল না, আবৃত্তিকার কামালুদ্দিন একটা কাঁঠাল-মাছি হয়ে যাওয়ার পর থেকে।

পুরনো আদিবা তাকে এক রাতে বলল, একটা ফোন কর। হয়তো এরপর ফোন করার সুযোগও পাবে না।

অনেক দ্বিধা নিয়েই ফোনটি সে করল। রাত দশটায়।

হ্যালো, ভরাট গলা জানতে চাইল, আদিবা খোন্দকার বলছেন?

জি। কিন্তু এটি যে আমার নাম্বার, তা কীভাবে জানলেন?

যেভাবে অনেক জিনিস আমাকে জানতে হয়। তথ্যের পৃথিবীতে যত বেশি তথ্য জানবেন, তত আপনি টিকে থাকবেন। তবে আপনার ব্যাপরটা আলাদা, আপনি তথ্যের ক্যাটাগরিতে পড়েন না। তারপর একটু হেসে বলল, না, আমার ফোনে একটা অ্যাপ ফিট করা আছে, তাতে কলার আইডির একটা ভাণ্ডার আছে। যাক সে কথা, এখন বলুন, কেমন আছেন?

ভালো। আপনি?

আমি সবসময় ভালোই থাকি। খারাপ থাকার বিলাসিতা স্কুলে পড়ার সময় পর্যন্ত ছিল। তারপর থেকে নেই।

নতুন আদিবা এবার ফোনটা হাতে নিয়ে কিছুটা দ্বিধা নিয়ে বলল, আপনাকে একটা কথা জানাতে আমি ফোনটা করেছি।

জানি, নেহাল বলল। কিন্তু এর প্রয়োজন ছিল না। আমি সেদিন আপনাকে বলে দিয়েছি, আপনাকে আমার ভালো লাগে। আপনাকে ভালোবাসি। ব্যস। এটুকুই। এই ভালোবাসাটা আপোষযোগ্য না, ফেরতযোগ্যও না। আপনাকে আরও বলেছি, যতদিন আপনার থেকে সাড়া না পাব, আমি নিজ থেকে একটা পা-ও আপনার দিকে ফেলব না। কথাটা বলতে বলতে অবশ্য নেহাল হেসে দিল। না, এ কথাটা অবশ্য আপনাকে সেদিন বলিনি। আপনার সময় ছিল না বলে। আজ বললাম।

দ্বিধাটা গলায় রেখেই আদিবা বলল, ঠিক সে কারণে নয়, আমি ফোন করেছি একটা কথা জানতে, যদি জানাতে রাজি হন।

নেহাল চুপ করে রইল।

আদিবা বলল, শুনেছি আপনার নামে একটা মামলা আবার সচল হয়েছে। এবং এ মামলায় আপনি হারবেন। অথচ আপনি চাইলে কেয়ামত পর্যন্ত এটি ঝুলিয়ে রাখতে পারতেন।

কথাটা নারিন্দা ক্যাফে এন্ড টি হাউসের মালিক মোয়াজ্জেম হোসেনের। মতিঝিল থানার এসআই চন্দ্রগোপাল পোদ্দারের থেকে এটি তিনি শুনেছেন।

আপনি ভুল শোনেননি। কিন্তু মামলাটা না ঝুলিয়ে এর মোকাবেলা করার, যাকে বলে মিউজিক ফেইস করার ইচ্ছাটা আমার হয়েছে আপনাকে দেখার পর। বলতে পারি সরকারি উকিলের কাজটা আপনি সহজ করে দিয়েছেন।

নেহাল হাসল। কিন্তু তার হাসি আদিবাকে আবার ভয় দেখিয়ে দিল। পুরনো আদিবা ভয়টার গন্ধে রেগে গেল। সে বলল, আমাকে টানছেন কেন এর মধ্যে?

নেহালের হাসিটা থেমে গেল। রাগ করেছেন? সে জিজ্ঞেস করল।

নতুন আদিবা ফোনটা নিয়ে বলল, রাগ কেন করব? আমার খারাপ লাগছে আপনার মামলা মেনে জেলে যাবার কথা শুনে, সেজন্য বললাম।

জেলে যাবার কথা তো বলিনি?

সেদিন বলেছিলেন।

আবার হাসল নেহাল। আপনার মনে আছে দেখছি। তবে খারাপ লাগার কিছু নেই। একটা দুর্ধর্ষ ক্রিমিনাল টাইপের মানুষ কিছুদিন সভ্য সমাজে ঘুরে বেড়াবে না, জেলের ঘানি টানবে, এটা তো সুখবর।

জেলে কি এখনো ঘানি টানাটা আছে? কথাবার্তার সুর পাল্টাতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল আদিবা। কেন জানি ফোন রেখে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে আরও কিছুক্ষণ কথা হোক।

এবার শব্দ করেই হাসল নেহাল। নিশ্চয়ই আছে, সে বলল। এটা অর্গানিকের যুগ না? ঘানি টানা থেকে যে সর্ষের তেল হয়, তা বিক্রি করে ভালো আয় হতে পারে।

আদিবার কথা ফুরিয়ে গেছে। সে চুপ করে রইল।

মামলাটার ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু নিশ্চয়ই জানেন, আমার ফোনটাতে লোকজন আড়ি পেতে থাকে। ইচ্ছাটা তাই মুলতবি রাখতে হচ্ছে।

আদিবার কথা যে ফুরিয়ে গেছে, কোন আদিবার? কারণ ফোনটা হাতে নিয়ে পুরনো আদিবা বলল, কেন? কোনও টোকাইয়ের নামে একটা সিম তো বের করে নিতে পারেন, যে সিম আড়ি পাতা যন্ত্রের গোচরে নেই?

সে রকম ফোন আমার নেই যে তা নয়। আছে। কিন্তু ইচ্ছা হচ্ছে ফোনে নয়, মুখোমুখি বসে কথাগুলি বলি। সেটা অবশ্য আপনার পছন্দ হবে না। মুলতবি রাখার কথাটা সেজন্যই বলেছি।

মামলাটা আদালতে তোলার, তারপর সওয়াল-জবাব শেষে ঘানি টানা পর্যন্ত পৌঁছোতে কতদিন লাগবে? একটু যেন কৌতুক করে বলল পুরনো আদিবা।

নেহাল হাসল। স্বস্তির হাসি। মামলাটা তোলাই আছে, তবে নিষ্ক্রিয়। একবার সক্রিয় হলে হয়তো আমাকে আদালতে সারেন্ডার করতে হবে। অথবা এরকম কিছু। আইনের ব্যাপারটা আমার ছোটবেলার বন্ধু দেখে। নাম শুনেছেন হয়তো। ব্যারিস্টার দুর্নিবার সোম। দুর্নিবারই বটে। মোট কথা, সময় বেশি নেই।

আদিবা চুপ করে থাকে।

এয়ারপোর্ট রোডে হোটেল মেরিডিয়ানের পেছনে একটা চমৎকার ক্যাফে আছে, 'কফি শপ' নামে। মালিক আমার প্রিয় এক মানুষ। নামটাও মালিকের সঙ্গে মিলে যায়, মানিক। ক্যাফের পেছনে একটা ছোট্ট বাগান আছে। বাগান ঘেঁষে এক ফালি বারান্দা। কোনও কোনও বিকেলে গিয়ে বসি। একা। কেউ বিরক্ত করে না। মানিক এ দিকটা দেখে। আপনি যদি আসেন একটা বিকেলে, কফি খেতে পারেন।

আদিবা হাসল। 'কফি খেতে পারেন' দিয়ে কী সুন্দর কথাটা শেষ করল নেহাল। কোনও জোর খাটানো নেই। যেন কফি খেতে পারাটাই আসল। বাকি সব ওই কফি খাওয়ার আয়োজন। সে সিদ্ধান্ত নিল, যাবে। কিন্তু ছুটির দিনে নয়, ঠিক বিকালেও নয়। উটকো ভিড় তার অপছন্দের।

যাব, সে বলল। একটু থেমে আবার বলল, সামনের

মঙ্গলবার, সাড়ে তিনটেয়। ঠিক আছে?

একটা কিছু হিসাব করল নেহাল। তারপর শান্ত গলায় বলল, নিশ্চয়ই।

ফোন রেখে দিয়ে পুরনো আদিবা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে গেল। আর আদিবা জেগে থাকল। তার শুধু ভাবতে ইচ্ছা করছে 'নিশ্চয়ই' বলার আগে কী হিসাব করছিল নেহাল, তা নিয়ে। তার মনে বিশ্বাস জন্মালো, হিসেবটা যদি দশ–বিশ কোটি টাকা ক্ষতি হওয়ার অথবা তার থেকেও বড় একটা মেগা ডিল ফসকে যাওয়ারও হয়, তা নিয়ে সে ভাবেনি।

ভাবনাটা তাকে দুশ্চিন্তার হাত থেকে বাঁচিয়ে ঘুমোতে পাঠাল।

৫

বেলা সাড়ে তিনটেয় 'কফি শপ'–এ কোনও ভিড় নেই। জনা সাতেক কফিপ্রেমী তরুণ–তরুণী ছাড়া। আদিবা ভেতরে পা রাখতেই এগিয়ে এল মানিক। তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল বারান্দায়, যার কোল জুড়ে ছোট্ট উঠান।

বারান্দায় মুখোমুখি দুটি বেতের চেয়ার। দেখে মনে হল গা এলিয়ে আরামে বাসা যাবে। কিন্তু আদিবা জানে, একটা উদ্বেগ আর অনিশ্চিয়তা নিয়ে চেয়ারের কিনারায় বসে থাকতে হবে আজ। গা এলানোর সুযোগ নেই। টিভিতে টানটান উত্তেজনার কোনও সিনেমা বা নাটক দেখার সময় যা হয়।

নেহাল বসে ছিল একটা চেয়ারে। তাকে দেখে উঠে দাঁড়াল। মুখটাতে একটা প্রসন্ন হাসি। আজ একটু ভিন্ন দেখাচ্ছে তাকে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি নেই। শার্টের বদলে একটা পাঞ্জাবি পরেছে, ঘন নীল রঙের। অবাধ্য চুলে চিরুনি চালিয়েছে।

আদিবার সংকোচ হল। অফিস থেকে বাসে এসেছে। চুল আঁচড়ানো দূরের কথা, পরিপাটি হওয়ার সময়ও পায়নি। কিন্তু সেই তার দিকেই নেহাল তাকিয়েছে এমন মুগ্ধতায়, যে মুগ্ধতা আবৃত্তিকার কামালুদ্দিনের চোখে জীবনেও আবিষ্কার করতে পারত কিনা সন্দেহ।

একদম ঘড়ির কাঁটা মেপে? সে হেসে বলল।

বাসটা ঠিক সময় পেয়েছিলাম বলে। আদিবা বলল।

আমি আপনাকে আমার গাড়িতে করে নিয়ে আসতে পারতাম, কিন্তু কাজটা অনুচিত হতো, আপনার দিক থেকে। নেহাল বলল।

আদিবা হাসল।

উল্টোদিকের চেয়ারটার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো নেহাল। তাকে বলল, বসুন।

আদিবা বুঝল, দুর্ধর্ষ হলেও লোকটার এটিকেট সব জানা। নেহাল কফির কথা বলল।

কফি আসতে আসতে কিছু কথা হল তাদের। টুকটাক। মাহমুদ স্যারকে আজ একটু আগে অফিস ছাড়ার অনুমতি চাইবে বলে লাঞ্চের আগেই সব কাজ করে রেখেছে, সে কথাও বলল। তাতে ছুটি পেতে সমস্যা হয়নি ইত্যাদি। নেহাল বলল, তারও একটা ব্যাঙ্কে কাজ ছিল ইত্যাদি।

আদিবা বুঝল, নেহালের মধ্যে পরিবর্তনের একটা ইচ্ছে জেগেছে। সে বুঝল, বরফ গলছে। তারপর সে ঘড়ি দেখল।

আর এক ঘণ্টায় ফিরতি বাসে উঠতে পারবেন, নেহাল যেন একটু আশাহত হয়েই বললো।

বরফ গলতে শুরু করলে ছেলেবেলার গল্পে যাওয়া হয়, নানান খুঁটিনাটির বর্ণনায়, জীবনের নানা অপ্রীতি আর প্রীতির বিষয়গুলিতে যাওয়া হয়। তারাও গেল। একসময় আদিবা বলল, একটা কথা আপনাকে জানানো উচিত। নেহাল উৎসুক চোখে তাকাতে আদিবা মেঝের দিকে চোখ রেখে বলল, আমার জীবনে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল।

নেহালের চোখে ঔৎসুক্যের ছায়া গাঢ় হল।

আমাকে আমার বাবা, সেই কলেজে পড়তে পড়তেই, জোর করে বিয়ে দিয়েছিলেন। কথাটা বলতে

গিয়ে তার ভেতরটা কাঁপল। জমে থাকা অনেক কষ্ট আর কান্না কয়েক ফোঁটা অশ্রু হয়ে চোখ দুটো ঝাপসা করে দিল। সামনের টেবিলে রাখা টিস্যুর বাক্স থেকে দু–তিনটা টিস্যু তুলে আদিবার দিকে এগিয়ে দিল নেহাল। বলল, জানি।

আদিবা ভেজা চোখেই অবাক দৃষ্টি মেলে তাকালো।

লোকটার নাম মজিদ মুন্সি। কন্ট্রাক্টর। ওর কাছে আপনার বাবার দেনা ছিল। আপনার এই তাড়াহুড়োর বিয়ের পেছনে এই দেনাটাই বড় ছিল, কামালুদ্দিন নামের সংস্কৃতিকর্মীর বাড়াবাড়িটা না।

আদিবার অবাক হওয়ার শক্তি যেন হারিয়ে গেল।

এগারোটা মাস আপনার কেটেছে একটা নরকে। তাই না? এই এগারো মাসের গল্পটা আমার জানার দরকার নেই। নেহাল বলল। কিন্তু তাকে থামিয়ে দিল আদিবা। কীভাবে এসব জানলেন?

জানাটাই আমার কাজ, সে আস্তে করে বলল। তবে আপনার সম্পর্কে জানতে আমার বেশ পরিশ্রম হয়েছে। আপনার স্কুল জীবনের বন্ধু জ্যোৎস্নার কথা নিশ্চয়ই মনে আছে?

আদিবা হাসল। জ্যোৎস্না আর আমি ছিলাম হরিহর আত্মা। বিয়ের পর ওকেও হারিয়েছি।

হারামনি, পাবেন। জ্যোৎস্না এখন আছেন সাতক্ষীরায়। ওর হাজবেন্ড অনেক চিংড়ি ঘেরের মালিক। তাকে আমি চিনতাম, সেই সুবাদে সাতক্ষীরায় হাজির হয়েছি। জোৎস্নার অনেক অভিমান আপনার ওপর। নেহাল বলল।

জ্যোৎস্নাকে দোষ দিই না। কিন্তু আমার নরকে জ্যোৎস্না কীভাবে ফোটে, বলুন? ভেবেছি জ্যোৎস্না জ্যোৎস্নাই থাকুক। আমি থাকি পাতালের অন্ধকারে।

নেহাল তার কথাগুলি বলল। টুকরো টুকরো ছবিতে একটা জীবনকে যতটুকু পারল, তুলে ধরল। কফি খেতে খেতে আদিবা শুনল, নেহাল কেন একটা মৃতপ্রায় মামলাকে চাঙ্গা করেছে। মামলা আমার নামে অনেক আছে, সে বলল, সেগুলি আদালতে প্রমাণ করা অসম্ভব। সেগুলি এখন যমুনার ওপর খুঁটিতে বাঁধা একটা ভেলাতে তোলা আছে। একটু বান ডাকলে কোথায় যে ভেসে যাবে! আমি আবার ভাসিয়ে নেওয়ার ভালো কারিগর কিনা, নেহাল বলল।

মনে মনে একমত হল আদিবা, তাকেও যে লোকটা ভাসিয়ে নিচ্ছে!

নেহাল জানালো, এই একটা মামলায় কিছু প্রমাণ আছে। সেগুলি জোগাড় করার সময় সে বাধা দেয়নি। কারণ ঘটনাটি যখন ঘটে, সে জানত না, তাতে এক বয়স্ক দম্পতি ঘরছাড়া হয়েছিলেন। তাদের ঘর সে ফিরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু ভদ্রলোক ঠিক করেছেন, মামলায় তিনি সাক্ষী হবেনই। ভদ্রলোককে সে সম্মান করে, তিনি সাক্ষী দিলে মামলাটা টিকবে, তবে দু'বছরের বেশি শাস্তি তাকে নিশ্চয়ই পেতে হবে না। তাছাড়া, নেহাল জানালো, দু–তিন বছর সে একটু আড়ালে থাকতে চায়।

আদিবা বুঝেছে, নেহাল চাইছে, কিছু সময় নিজের সঙ্গে কাটাতে। নিজেকে নিয়ে একটা ফয়সালায় পৌঁছোতে। আদিবার চিন্তাটাই যেন নেহাল তাকে ফিরিয়ে দিল। তাকে বলল, আপনাকে দেখার পর আমার মনে হয়েছে, এ জীবনটা আমার নয়। যে জীবনটা হারিয়েছি, সেটাতেই ফিরতে হবে।

কবে আদিবাকে প্রথম দেখেছে নেহাল, তাও জানাল। লিফট কাণ্ডের অন্তত ছ'মাস আগে। আশ্চর্য!

আকাশটা হঠাৎ মেঘলা হল। ছোট্ট উঠোনে ছায়া জমলো। আদিবার মনে হল, বৃষ্টি নামলে সে উঠোনে গিয়ে ভিজবে। যে যাই ভাবুক। এই বৃষ্টিতে তার জমে থাকা সব কষ্ট,অভিমান ধুয়ে মুছে যাবে।

নেহালকে কথাটা সে বলল। এবং এই বলার মুহূর্তটা তৈরি করে নিল যাদুময় সেই 'তুমি মুহূর্ত', যার অপেক্ষায় অনেক দিন কাটিয়ে দেওয়া যায়। মুহূর্তটা যখন আসে, সম্পর্কের সুতোয় তখন গভীরের একটা টান পড়ে। আদিবা দেখল, নেহাল তাকে 'তুমি' বলেছে ঠিক চারটে

বত্রিশ মিনিটে। ঘড়িতে বাসের সময় দেখছিল সে।

নেহাল বলল, বৃষ্টি নামলে আমি মানিককে বলবো বারান্দার দরজা বন্ধ করে পর্দা টেনে দিতে। আশেপাশে দালান থেকে কেউ দেখলে দেখুক, আপনি যখন বৃষ্টিতে ভিজবেন, আমিও ভিজব। তারপর একটু থেমে হঠাৎ করেই বলল, আর আপনি আপনি করব না, এখন তোমাকে তুমি বলব। রাজি হও আর নাই হও। হ্যাঁ তুমি যখন বৃষ্টিতে...। বলতে বলতে জোরে হেসে ফেলল নেহাল। অনেক ছেলেমানুষি হচ্ছে। সে বলল।

টেবিলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে নেহাল একটা হাল্কা চাপ দিল আদিবার হাতে। স্পর্শটা একটা পাখির পালক ছোঁয়ানোর মত। কিন্তু সেই স্পর্শে আদিবার ভেতরে বর্ষা জেগে উঠল। সেই বর্ষার বৃষ্টিতে আদিবা ভিজল। নেহালও।

৬

মামলা চলার সময় আরমানকে নিয়ে দু'দিন আদালতে গিয়েছিল আদিবা। তাকে দূর থেকে দেখে হেসেছে নেহাল। প্রথম দিন আদিবা সেই বৃদ্ধের কথা শুনছে। তিনি তার কথা শেষ করেছেন এই বলে, একটা সময় ভাবতাম, এই লোকটা যেন আজীবন আমার মতো কষ্ট পায়। কিন্তু এখন আর তা ভাবি না। এরকম ভাবনাটাই কষ্টের।

নেহাল মাথা নীচু করে বসেছিল। তার উকিল দলকে সে আগেই বলেছিল, ভদ্রলোককে যেন অকারণে জেরা না করে।

শেষদিনে সে শুনেছে, নেহালের আঠারো মাসের সাজা হয়েছে। ব্যারিস্টার দুর্নিবার নিশ্চয়ই একশ ভাগ সফল। বিচারক দুঃখ করে বললেন, প্রমাণ যা আশা করেছিলাম, নেই।

এমনটাই হয়, আদিবা জানে।

আদালত থেকে একটা প্রিজন ভ্যানে তোলা হল নেহালকে। সেখানে যাওয়ার আগে চোখাচোখি হল আদিবার সঙ্গে। 'কফি শপ'–এর হাসিটা সে দিল। হাসিটা আদিবাকে জানিয়ে দিল, আঠারো মাস কেন, আঠারো বছর সে অপেক্ষায় থাকতে পারবে।

নিশ্চয়ই। আদিবার হাসিটাও তাই জানাল।

নেহালকে ঘিরে মিডিয়ার ক্যামেরা, মাইক্রোফোন। কিন্তু কোনও কিছুই যেন তার দৃষ্টিতে পড়ছে না। আদিবার হঠাৎ মনে হল, আঠারো মাস পর যে মানুষটা ফিরবে, সে কেমন মানুষ হবে? তাকে নিয়ে কি সে নির্ভর হতে পারবে?

দেখা যাক। আদিবা বলল এবং আরমানের হাত ধরে হাঁটা দিল।

সৌমিত্র বিশ্বাস

দশাননের দশা

সীতাকে বাল্মিকীর আশ্রমে ছেড়ে আসার পর প্রায় বছর কুড়ি অতিক্রান্ত। একদিন বিকেলের দিকে রাম রাজপ্রাসাদ শীর্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বসন্তকাল। কদিন পরেই বাসন্তীপুজো। সারাদিন রাজকার্যের পর আজকাল বেশ ক্লান্ত বোধ হয়। খুবই স্বাভাবিক। মেঘে মেঘে তো আর কম বেলা হয়নি। সেই কবে রাবণকে বধ করে রাজ্যের দায় ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন। তারপর কাজ আর কাজ। কোথায় সর্বার্থসিদ্ধি নামে কোন ব্রাহ্মণ মাঝরাস্তায় কুকুর ঠেঙিয়েছে, কোন জঙ্গলে উল্লুকের কোটরে গৃধ্র ঢুকে পড়েছে, কোথায় লবণাসুর চ্যবন ঋষির আশ্রমে উৎপাত করছে, কোথায় শম্বুক বাড়াবাড়ি করছে— একা হাতে সবই সামলাতে গিয়ে নিজের দিকে নজর দেওয়ার সময় পাননি। সীতা থাকলেও না হয় একটু যত্নআত্তি পেতেন। কিন্তু সেখানেও তো কতগুলো কুচুটে পরছিদ্রান্বেষী অলস লোকের কথায় নেচে নিজেই নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছেন। এখন আর কর্তিত চরণের জন্যে শোক করে কী হবে! আজকাল আর কিছুই ভাল লাগে না।

খানিক দূরে তাঁর দুই দেহরক্ষী নাকানি আর চোবানি দাঁড়িয়ে চাপা গলায় আলোচনা করছিল বাসন্তীপুজোর ছুটি পাবে কি না তাই নিয়ে। ওই সময়ে ছুটি পাওয়া এমনিতেই মুশকিল তার ওপরে নবমী তিথিতে আবার রামের জন্মদিন। আড়ম্বর না হলেও কিছু উৎসব তো হবেই। ওদের আলোচনা কানে আসতে রাম মৃদু হাসলেন। আর জন্মদিন! যাকে একাদশ সহস্র বর্ষ রাজ্যশাসন এবং বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে হবে, সামান্য চল্লিশ পঞ্চাশটা জন্মদিনে তার কী–ই বা আসে যায়। রাম ঠিক করলেন পুজোর সময়ে নাকানি চোবানিকে ছেড়ে দেবেন। আর সেই সময়েই হুটোপাটির শব্দটা কানে এল।

দেখলেন অদূরে সার দিয়ে যে আম্রতরুরাশি রয়েছে, তারই একটাতে কোত্থেকে গোটা পাঁচেক বাঁদর উঠে পড়েছে। তরু ভর্তি সদ্য প্রস্ফুটিত আম্রমুকুলের গন্ধে এতক্ষণ চারপাশ ম ম করছিল। কিন্তু বাঁদরগুলো এসেই হামলে পড়ে সেসব খেয়ে, ছিঁড়ে, ছড়িয়ে নাশ করল। তবুও রামের কোনও ভাবান্তর নেই। তাঁর ততক্ষণে মনে পড়ে গিয়েছে পঞ্চবটির কথা। সেই যে মারীচকে বধ করে হন্তদন্ত হয়ে আশ্রমে ফেরার পথে লক্ষ্মণ বেশ কিছু অপক্ক চ্যুতফল পেড়ে নিয়েছিল, তালেগোলে সেগুলোর কী হয়েছিল কে জানে। এদ্দিন পরে সেই অপক্ক আমের জন্যে শোক উথলে উঠল। আহা, দগ্ধ চ্যুতফল আর ইক্ষাকু রস সহযোগে সীতা বড় সুন্দর একটা পানীয় প্রস্তুত করত।

রাম স্মৃতিকাতর হতে পারেন, কিন্তু নাকানি চোবানি নিতান্তই ছাপোষা লোক। বোতাম আঁটা জানার নিচে

প্রাণটুকু শান্তিতে শুয়ে আছে। তাদের প্রাণে কবিত্বও নেই, পত্নীর জন্যে হাহাকারও নেই। পত্নী দূরে থাকলেই বরং তারা মুক্তপুরুষ হয়ে বাঁচে। কাজেই বাঁদর এসে সব আমের বোল খেয়ে গেল দেখে ঘোর বাস্তববাদী নাকানি আর চোবানি যষ্ঠী উত্তোলন করে হ্যাট হ্যাট শব্দে দৌড়ে এল।

বাঁদরগুলো অলসভাবে ওদের পর্যবেক্ষণ করল। তারপর নাকানি চোবানির যষ্ঠী আস্ফালনকে পাত্তা না দিয়ে আবার মুকুল ধ্বংসে মন দিল। এক কোণায় একটা প্রস্তরখন্ড পড়েছিল, সেটা তুলে নাকানি যখন নিক্ষেপ করতে যাবে, রাম হাত তুলে ওদের নিরস্ত করে অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'আহা, ছেড়ে দাও। আমারই তো জীব।'

রাম অতশত ভেবে কথাটা বলেননি। কিন্তু মুখ দিয়ে দুম করে 'কেষ্টর জীব'–এর বদলে 'আমার জীব'–এর মতো গূঢ়তম সত্য নির্গত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভ্রম বুঝতে পারলেন। মানসিক বৈকল্যের ফলে নিজের দিব্যস্বরূপ কিছুটা বেরিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বোতল–খোলা সোডার মত ভসভস করে গোটাটাই ঠেলে বেরোতে চাইছে। মনে হচ্ছে বজ্রনির্ঘোষে বলেন, 'শোনো, অনুতের পুত্র যত দেবগণ দিব্যধামবাসী, আমিই সেই বিষ্ণুলোকের—।' কিন্তু আর কোনও শব্দ নির্গত হতে না দিয়ে ইচ্ছেটাকে কপ করে গিলে ফেলে রাম মনে মনে বললেন, 'হতভাগা ভৃগুর অভিশাপের ঠেলায় আজ আমার এই খোয়ার'। তারপর উদাস চোখে তাকিয়ে রইলেন আম্রমুকুল ধ্বংসরত কপিকুলের দিকে। কিন্তু অনবধানে ওই যে ক্ষণিক বাণীটুকু নির্গত হয়েছিল, সেটুকু শুনেই নাকানি আর চোবানি যষ্ঠী, প্রস্তর ফেলে এমনভাবে করজোড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল যে রাম বুঝতে পারলেন এরা দুটোতে মুনিঋষিসুরাসুরকাঙ্খিত তাঁর বিষ্ণুরূপের স্বাদ পেয়েছে। যদিও তা পরিপাক করার ক্ষমতা এদের নেই। দেবদুর্লভ বিশ্বরূপকে নাকানি–চোবানির মত দুই অপগন্ডের সামনে উদ্ঘাটিত হতে দেখে রাম যারপরনাই বিমর্ষ হলেন।

তখন পিতামহ ব্রহ্মা এসে বললেন, 'রাম মানবদেহ ধারণ করলে ভূল হবেই। তোমারও হয়েছে। জ্ঞানী ব্যক্তি এই নিয়ে শোক করেন না।' রাম বললেন, 'ব্রহ্মা, তোমার বাক্য তাত্ত্বিক উপদেশ হিসেবে চমৎকার। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা কোনও কাজে লাগে না। বিশ্বরূপ দর্শনের তেজকে তুমি খাটো করে দেখো না। এই দর্শন পাওয়ার সময় এদের এখনও হয়নি। তাই এদের অবস্থা হবে ভবন হাজাম নামে পুরাকালের সেই ক্ষৌরকারের মত। যার প্রভুর মাথায় দুটি শিং ছিল। এদের মুখ থেকে গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি যাবে ক্রমে যে রাম বিশ্বরূপ দেখিয়েছে। পিলপিল করে লোক এসে জুটবে। তোমরা সবাই মিলে আমাকে প্রজারঞ্জক বানিয়েছো। কাজেই সকলের আবদারই রক্ষা করতে হবে। হায়, কাল কী ক্ষুদ্র! অথচ মানবের চাহিদা কি বিপুল! বিধাতারও সাধ্যি নেই তা পূরণ করে।'

ব্রহ্মা বললেন, 'তুমি এই ছোঁড়াদুটোকে ভুজুং ভাজুং দিয়ে বলো, আমার জীব বলতে তুমি কিস্কিন্ধ্যায় তোমার সেই পোষা বাঁদরগুলোর কথা বলেছিলে। আমি ওদের বুদ্ধি নাশ করে দিচ্ছি। ওরা কিছু বুঝতে পারবে না।'

রাম কিছুটা বিরক্ত হয়েই বললেন, 'বোকার মত কথা বলো না। বিশ্বসুদ্ধ সকলেই জানে যে কিস্কিন্ধ্যাবাসীরা আমার পরম বন্ধু। তাদের পোষা বাঁদর না বলাই উচিৎ। আর, তোমার ওই 'ভুজুং ভাজুং' শব্দদুটোও কেমন যেন ঠেকছে। বুড়োমানুষ হয়ে বকাটে ছোকরাদের মত কথা বলছ কেন? আমি পিতৃসত্য রক্ষার জন্যে বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়ালুম, আর দুটো দারোয়ানের কাছে নিজ সত্য রক্ষা করতে পারব না?'

ব্রহ্মা বললেন, 'যখন তুমি বিষ্ণুরূপে থাকো, তখন তো অপাত্রে দান করেই থাকো। উলুবনে মুক্তো না ছড়ালে লোকে তোমার কাজকম্মকে অহৈতুকী কৃপা বলে কেন? কাজেই এখানেও ধরে নাও অহেতুক কৃপা করেই এদের বিশ্বরূপ দেখিয়েছ।'

রাম বললেন, 'তুমি তো লোক সুবিধের নও। এতক্ষণ দারোয়ানদের কাছে মিথ্যে বলতে শেখাচ্ছিলে, এবার নিজের কাছেই মিথ্যে বলতে শেখাচ্ছো। আমি মোটেই অহৈতুকি কৃপা করিনি। মুখ ফসকে বলে ফেলেছি। তুমি

নেহাৎ প্রণম্য, নইলে তোমার দেওয়া ব্রহ্মাস্ত্র তোমার ওপরেই সন্ধান করতাম।'

ব্রহ্মা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এইজন্যে জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলে থাকেন কারও ভাল করতে নেই।'

রাম সহাস্যে বললেন, 'জ্ঞানী ব্যক্তিরা আরও বলে থাকেন, নিজের চরকাতেই তৈলসিঞ্চন বিধেয়। তুমি বরং কাল একবার সভায় এসে একটি ভাল স্বর্ণনির্মিত চরকা উপহার নিয়ে যেও।'

'যা খুশি করোগে যাও। তুমি তোম্বামুখে বসে থাকলে আমার কী? আমি চললান। তোমার শুভ হোক।'

সেই সময়ে রাবণের বিদেহী আত্মা সেখান দিয়ে নতুন অপ্সরার খোঁজে যাচ্ছিল। সে গোটা ঘটনা দেখে ভাবল, 'অহো, নিদারুণ আত্মগ্লানিতে রাম এখন নিজের শক্তি বিস্মৃত হয়েছে। তাছাড়া এ পিতামহ ব্রহ্মার সঙ্গেও সুব্যবহার করেনি। কাজেই এ এখন দুর্বল। শাস্ত্রে বলে পরাক্রান্ত ব্যক্তিকে যখনই দুর্বল দেখবে বৃথা কালক্ষেপ না করে তখনই তাকে ভূপতিত করবে। অতএব আমি এখনই এর বুদ্ধিনাশ করে অযোধ্যায় সুখভোগ করব।'

রাবণের আত্মা সুট করে রামের দেহে ঢুকে গেল এবং রাম মুখ তুলে নাকানি আর চোবানিকে দেখতে পেয়ে সিংহের ন্যায় গর্জন করে বললেন, 'আমের কচি কচি মুকুলগুলো বাঁদরে খেয়ে নিলে আর তোরা দুই হতভাগা করছিস কী? ও গুলোকে তাড়াতে পারছিস না? যা সবকটা বাঁদরকে ধরে নিয়ে আয়। কাল সকালে হয় আমি বাঁদরগুলো পুড়িয়ে খাব, নইলে তোদের দুটোকেই পুড়িয়ে খাব।'

'আহা বউয়ের শোকে অমন ভাল মানুষটা একেবারে পাগল হয়ে গেছে গো' বলতে বলতে বিশ্বরূপ ভুলে নাকানি আর চোবানি বাঁদর ধরতে ছুটল। পরদিন কী হয়েছিল জানা না গেলেও অল্পদিনের মধ্যেই রাজপ্রাসাদ জুড়ে জানা গেল যে রামের ক্ষুধা অকস্মাৎ শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যে রাম তাঁর সাত্ত্বিক গুণের জন্যে মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষিদেরও ঈর্ষার পাত্র ছিলেন, তিনি ঘোর রাজসিক হয়ে উঠেছেন। এখন প্রতিদিন একটি আস্ত ময়ূর, আস্ত হরিণ এবং কলস কলস মাঘী ছাড়া তাঁর আহার রোচে না। সভায় বসে রাজকার্য করার চেয়ে অন্দরমহলে নর্তকীদের নৃত্যগীতই তাঁর বেশি প্রিয় হয়ে উঠছে। অলমিতি বিস্তরেণ। সর্বত্র আলোচনা শুরু হল যে বউয়ের শোকে অমন ভাল মানুষটা একেবারে পেগলে গেছে। বোঁটকা গন্ধে কাছে দাঁড়ানো যায় না।

কেবল ভরত আর লক্ষ্মণের মনে হল ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। সীতাকে ত্যাগ করার পরেও কেবলমাত্র সংস্কৃত না কী যেন নরকে পতিত হওয়ার ভয়ে যে রাম রাজকার্যে ক্ষান্ত দেননি, সেই তিনি এই দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে হঠাৎ সীতার শোকে পেগলে যাবেন, এটা প্রত্যয়যোগ্য নয়। এর পেছনে দুইভাই তখন হনুমান, বশিষ্ঠ ঋষি এবং মার্কণ্ডেয়, কাশ্যপ, নারদাদির সঙ্গে ঘোর রাত্তিরে গোপন কক্ষে আলোচনায় বসলেন। রামের নিশ্চয়ই কোনও গূঢ় কারণ আছে। শত্রুঘ্ন এখানে নেই, রাম তাকে মধুপুরী রাজ্যে অভিষিক্ত করেছেন, কিন্তু সে শুনলেই বা কী বলবে!

অকারণ উন্মত্ততার কারণ জিজ্ঞাসা করলে কেউই কোনও সদুত্তর দিতে পারলেন না।

মার্কন্ডেয় বললেন, 'আমার মনে হয় চোদ্দ বছর বনবাসের সময়ে রামের মনে বহু ভোগেচ্ছা চাপা পড়েছিল। সেগুলোই এখন ফুটে বেরোচ্ছে।' লক্ষ্মণ বললেন, 'কিন্তু বনবাসকালে দাদা একদিনের জন্যেও মাংসাদির প্রতি লোভ করেননি।'

মার্কন্ডেয় বললেন, 'আহা, সেসব অবচেতন মনের গহনে ছিল। অবচেতন মন অতি রহস্যময় বস্তু। মনস্তত্ত্বের জ্ঞান না থাকলে বোঝা যাবে না।'

নারদ বললেন, 'মেলা বিদ্যে ফলিও না। অবচেতনে জমা ইচ্ছের ফলে না হয় খাদ্য পানীয়তে লোভ জন্মেছে। কিন্তু উদর তো আর অবচেতন চেতন বোঝে না। রোজ একটা গোটা হরিণ এবং গোটা ময়ূর সেই বা পুষছে কী করে? তার তো বিগড়ে যাবার কথা!'

মার্কণ্ডেয় মস্তক নেড়ে বললেন, 'সেও সম্ভব। সে সব অতি জটিল রহস্য।'

কাশ্যপ বললেন, 'জটিল রহস্য আবার কি? রহস্যমাত্রেই জটিল। নইলে সে রহস্য হত না। তোমার

বাক্য পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট।'

তখন মার্কণ্ডেয় বললেন, 'যা বোঝো না তাই নিয়ে কথা বলো না। মানুষের মনে তিনটে স্তর আছে। তোমাদের সুবিধের জন্যে সংক্ষেপে বলছি।'

বশিষ্ঠ থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই সব হিং টিং ছট পরেও আলোচনা করা যাবে। আপাতত আলোচনা রামের স্বাস্থ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেই মঙ্গল'। কিন্তু কোথাও কোনও আলো দেখা গেল না। তখন পিতামহ ব্রহ্মা এসে বললেন, 'তোমরা নিশ্চিন্ত হও, রাম উন্মাদ হননি বা তাঁর বায়ু-পিত্ত-কফ কিছুই কুপিত হয়নি। একটি সীতা কেন, শত সহস্র সীতার শোকও তাঁকে কাবু করতে পারে না। সপ্ত দিবস পূর্বে কোনও এক কারণে তাঁর মন প্রমাদগ্রস্ত হয়েছিল সেই ফাঁকে দুর্বুদ্ধি পাপাত্মা রাবণ ওঁর শরীরে ঢুকে পড়েছে। যা কিছু রাম করছে বলে ভাবছ, সবই আসলে সেই দুষ্ট রাবণের কারসাজি।'

লক্ষ্মণ অবাক হয়ে বললেন, 'ভগবন, প্রণাম নেবেন। কিন্তু আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। রাবণকে তো আমি নিজের চোখে নিহত হতে দেখেছি। আপনার দেওয়া ব্রহ্মাস্ত্র ছুড়েই তো রাম ওকে মেরেছিলেন। তাহলে কি ব্রহ্মাস্ত্র নিষ্ফল হয়েছিল? রাবণ আদৌ মরেনি? এই কুড়ি বছর ধরে কেবল ঘুমিয়েই ছিল?'

ভরত বললেন, 'শুনেছি দূর কলিযুগে নাকি রিপ ভ্যান নারী কোনও এক ব্যক্তি বহুবছর ঘুমিয়ে থাকবেন। রাবণেরও কি তাই হয়েছিল?'

'শুধু ওই উইঙ্কল কেন?' লক্ষ্মণ বললেন, 'রাবণের নিজের ভাই-ই বা কী করেছে? আমাদের শিবির থেকেও তার নাকডাকার শব্দ শোনা যেত। আমি তো প্রথমদিন ভেবেছি ভূমিকম্পই হল বুঝি! হা-হা-হা।'

ব্রহ্মা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এত বেশি কথা বলো কেন? সবটা না শুনে ব্রহ্মাস্ত্রের দোষ ধর না। রাবণ বলতে আমি ওর বিদেহী আত্মার কথা বলতে চেয়েছি।'

'বিদেহী আত্মা?' হৃদয়ঙ্গম করতে একটু সময় লাগল, তারপরেই চোখ কপালে তুলে ভরত বললেন, 'তার মানে রাবণের ভূ... ভূ... ভূ...।' শেষ হওয়ার আগেই শরীরে এক প্রবল আলোড়ন এসে তাঁর কথা বন্ধ করে দিল।

কাশ্যপমুনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কী সব দিনকাল পড়ল! গায়ত্রীটাও পুরো বলতে পারে না। ভূ-এর পরে ভূবঃ তারপরে স্বঃ বলবে, তা না 'ভূ' বলেই তেতলে তুতলে হেঁচকি তুলে বিষম খেয়ে একাক্কার। চলো হে নারদ, বসে বসে এদের আদিখ্যেতা দেখে লাভ নেই। মিছিনমিছি তপস্যা কামাই হল।'

লক্ষ্মণ এতক্ষণ ভাইয়ের মুখে জলসিঞ্চন করছিলেন। কাশ্যপ ঋষিকে রুষ্ট হতে দেখে বললেন, 'ভগবন প্রসন্ন হোন, অপরাধ নেবেন না। গায়ত্রী নয়, ভরত জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিল যে বিদেহী আত্মা মানে কি রাবণের ভূত? শ্রদ্ধেয় দাদাকে কি রাবণের ভূতে ধরেছে? কিন্তু ভয়ের চোটে সবটা বলে উঠতে পারেনি।'

কাশ্যপ আরও বিরক্ত হয়ে বললেন, আ মোলো যা। এই ছোকরার মাথায় কি গোবর পোরা নাকি? যত চাইছি গায়ত্রীর আলোচনা করে কথাটাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতে তা না, রাতবিরেতে যত ভূত আর প্রেত। ওহে নারদ, আজ আর তপোবনে ফিরে লাভ নেই। রাস্তাটা বড্ড অন্ধকার। বরং বশিষ্ঠকে বলো ঋষিদের অতিথিশালায় আমার একটা জায়গা রাখতে।'

বশিষ্ঠ বললেন, 'তপোধন, চিন্তা করবেন না। সব ব্যবস্থাই হয়ে যাবে। তারপর ব্রহ্মার দিকে ফিরে বললেন, 'ভগবন, আমরা যাতে এই ঘোর বিপদ থেকে উদ্ধার হতে পারি এবং দুর্মতি রাবণ যাতে রামকে ছেড়ে চলে যায় তার উপায় বলুন। আনাড়ি ওঝা ডাকতে আমাদের ভরসা হয় না। কাজের কাজ কিছুই হবে না, মাঝখান থেকে সর্বত্র গুজগুজ আর ফুসফুস।'

চতুরানন ব্রহ্মা তাঁর তৃতীয় মাথার চাঁদিটা চুলকে বললেন, 'এই ওজগুজের ভয়েই তোমরা মরলে। ছিদ্রান্বেষী নিয়ে এত ভাবতে গেলে চলে না। কলিযুগের এক সামান্য কবি পর্যন্ত বলতে পারে যে, নিন্দা পরব ভূষণ করে কাঁটার কণ্ঠহার/ মাথায় করে তুলে লব অপমানের ভার—অথচ তোমাদের দ্যাখো সবই উল্টো। কে এসে বলল চিলে কান নিয়ে গিয়েছে, দৌড়োলে চিলের

পেছনে। কে কোথায় সীতার নামে দু–কথা বললে, অমনি দিলে সীতাকে তাড়িয়ে।'

বশিষ্ঠ লক্ষ্মণ আর ভরতকে দেখিয়ে বললেন, 'প্রভু আপনি ত্রিকালদর্শী। এরা নিতান্তই ছেলেমানুষ। ত্রেতাযুগেরই সব কবিতা পড়ে উঠতে পারল না, তো কোথায় দূর কলিযুগের কবি। ওদের কথা ছাড়ুন। আপনি বরং রাবণকে তাড়ানোর ব্যবস্থা বলুন।'

ব্রহ্মা ধমক দিয়ে বললেন, 'ন্যাকামি করো না। ত্রেতাযুগেরই সব কবিতা মানে? ত্রেতাযুগে বাল্মীকি ছাড়া আবার কবি কোথায়? তোমার এই ছেলেমানুষদেরই কীর্তিকলাপ নিয়ে সে যে কাব্য লিখেছে, সেটাও যদি এরা না পড়ে থাকে তাহলে এরা গোমুর্খ হয়েই থাকুক, আমার কী? যাই হোক বেশি কথায় কাজ নেই। যদি পারো সীতাকে আনার ব্যবস্থা করো।'

'সীতা?' লক্ষ্মণ আঁতকে উঠতেই বশিষ্ঠ আড়ালে চিমটি কেটে তাকে থামিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'হে চতুরামন, আপনি যখন বলছেন তখন সীতাকে নিয়ে এলেই হল। এ আর এমন কী? কিন্তু আপনি সিদ্ধান্তটি আরেকবার বিবেচনা করুন। এই সব ভূতপ্রেতের মধ্যে, বিশেষ করে দুর্নীতি রাবণের ভূতের সামনে দুর্বল মেয়েমানুষকে আনার দরকার আছে? সীতা মা তো তাকে দেখলেই অজ্ঞান হয়ে যাবেন। সেও সীতাকে ছেড়ে কথা বলবে না। বিকল্প ব্যবস্থা কিছু নেই?'

'বাহারচালি মেরো না তো।' প্রবল বিরক্তিতে চার গোছা পাকা দাড়ি নেড়ে ব্রহ্মা ভেংচি কেটে বললেন, 'সীতাকে নিয়ে এলেই হল, এ আর এমন কী? একবার চেষ্টা করেই দ্যাখ না, ধুন্ধুড়ি নেড়ে দেবে। ফলমূল খেয়ে, তপস্যা করে আর গোটা তপোবন পরিচালনা করে করে ওর তেজ এখন আরও বেড়েছে। সামনে দাঁড়ানো যায় না। সীতাকে দেখলে রাবণ পালানোর পথ পাবে না।'

বশিষ্ঠ বললেন, 'সাধু সাধু। সীতার হাতে তপোবনের ভার শুনে আমি পরম আহ্লাদিত হলাম। তা ঋষি বাল্মিকী?'

ব্রহ্মা বললেন, সে আর কী করবে? সে এখন নিজেই যজ্ঞকুণ্ড হয়ে উঠেছে।

নারদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার মানে?'

ব্রহ্মা বললেন, 'মুখে একটা কাঠির মত কী গুঁজে রাখে আর অনবরত মুখ দিয়ে যজ্ঞধূম বের হয়। কী আহুতি দেয় কে জানে, অত্যন্ত কটুগন্ধ সেই ধূমের। আমি একদিন যজ্ঞের ভাগ নিতে গিয়ে সেই ধূম আঘ্রাণ করে কেশে কেশে মরি। সেই থেকে আমি বাল্মীকির আশ্রমে যজ্ঞ হলেও যাই না। অবশ্য যজ্ঞের পাটও মনে হয় উঠে গিয়েছে।'

মার্কণ্ডেয় হাত উল্টে বললেন, 'কার অবচেতনে যে কী থাকে!' কাশ্যপ কটমট করে তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'যজ্ঞ না করলে বাল্মীকি সারাদিন কী করেন?'

'সকাল থেকে ঘুরে বেড়ায় আর জেলেদের ছোঁড়াগুলোকে গুলতি হাতে দেখলেই 'মা–নিষাদ মা–নিষাদ' করে চেঁচায়। বলা তো যায় না ছোঁড়াগুলো বক–ফক মেরে দিলে আবার একটা মহাকাব্য লিখতে হবে।'

মার্কন্ডেয় বললেন, 'আনন্দে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। আরও বলুন। বাল্মিকীর কথা শুনতে আরও ইচ্ছে করছে। শুনেছি সীতার নাকি দুটো ছেলে হয়েছে। তা তারা বাপের কথা–টথা বলে?'

ব্রহ্মা ধমক দিয়ে বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে বসে পরচর্চা করার সময় আর ইচ্ছে কোনওটাই আমার নেই। তবে রাবণকে যদি তাড়াতে চাও তাহলে পতিব্রতা সীতাকে ফেরৎ আনার ব্যবস্থা দেখো। সেই মহিয়সী নারীর তেজঃপুঞ্জের সামনে রাবণ টিকতে পারবে না। ল্যাজ গুটিয়ে পালাবে। এছাড়া আর কোনও বিকল্প ব্যবস্থা নেই।'

'ওঝায় কাজ হবে না বলছেন?' বশিষ্ঠ চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

'চেষ্টা করে দেখতে পারো। কিন্তু সেই ওঝাকে যদি রাবণ কপাৎ করে গিলে ফেলে, সামলাতে পারবে তো? সবাই কিন্তু রামই নিমিত্তের ভাগী হবেন, বলে ব্রহ্মা তাঁর ঢেঁকিতে উঠে বসলেন।

পুণ্য ভাগিরথীর তীরে একটি ক্ষুদ্র পর্বতের ওপরে বাল্মীকির তপোবন।

প্রাতঃকালে সীতা সম্মার্জনী হাতে আশ্রম প্রাঙ্গন ঝাঁট দিচ্ছিলেন। চারপাশে অসংখ্য অর্ধদক্ষ, পাকানো কেন্দুপত্র। এই উৎপাতটি মৎসজীবীদের কাছ থেকে হালে বাল্মিকী আমদানি করেছেন। এই কেন্দুপত্র পাকিয়ে তার মুখে আগুন লাগিয়ে উল্টোদিক দিয়ে সেই অগ্নিচুম্বিত কেন্দুপত্রকে আকর্ষণ করে মুখ দিয়ে কটুগন্ধযুক্ত ধূম নির্গত করে বাল্মিকী সীতা এবং লবকুশকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

অগ্নিসংক্রান্ত এইসব খেলাটেলা এক–আধদিন ভাল লাগে। কিন্তু সারাক্ষণ যদি আপন মনে অগ্নি আকর্ষণ এবং ধূম মোচন করেন আর দক্ষ টুকরোগুলো ইতস্তত ছুড়ে ফেলে ঘরদোর প্রাঙ্গণ সব নোংরা করেন, তাহলে কার ভাল লাগে? সেই সঙ্গে নতুন উপসর্গ, রাত হলেই বৃদ্ধের খকখক কাশি। তাছাড়া দাদুর দেখাদেখি লবকুশও যদি কেন্দুপত্র থেকে ধূম বের করতে চায়, কী হবে?

কিছু দূরে কুশ ধনুকে শরসন্ধান করে দূর বৃক্ষশীর্ষে উপবিষ্ট একটা পাখিকে লক্ষ্য করে সবে জ্যা যুক্ত করতে যাবে, মা নিষাদ মা নিষাদ বলে হুঙ্কার দিতে দিতে বাল্মিকী এসে পড়লেন। ওঁকে আসতে দেখেই তির ধনুক ফেলে দুইভাই গাছের আড়ালে মিলিয়ে গেল। বাল্মীকি উগ্রভাবে সীতাকে কিছু বলতে যাবেন, একটা রথ এসে থামল।

রথ থেকে যিনি নেমে এলেন, তাকে যদিও সীতা কুড়ি বছর পরে দেখছেন, তবু চিনতে অসুবিধে হল না। বাৎসল্য স্রোত উথলে এল। সীতা বললেন, 'লক্ষ্মণ, ভাল আছ? উর্মিলা ভাল আছে?'

লক্ষ্মণ পাদবন্দনা করে বললেন, 'দেবী, আমরা সকলেই ভাল আছি। আপনি কুশলে তো? লবকুশ ভাল আছে? দাদা বাসন্তীপুজোয় আপনাদের অতি অবশ্যই যেতে বলেছেন আর আপনার জন্যে এই দুই মঞ্জুষা গয়না এবং চীনাংশুক পাঠিয়েছেন। লবকুশের গায়ের মাপ জানা নেই বলে কিছু পাঠাতে পারেননি। কিন্তু অযোধ্যায় তন্তুবায়রা অপেক্ষা করে আছে, মাপ নিয়ে পোশাক তৈরি করে দেব বলে। আপনি শীঘ্র রথে আরোহণ করুন।'

শুনেই সীতার ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি বললেন, 'দাঁড়াও দাঁড়াও। আজ প্রায় কুড়ি বছর হয়ে গেল তোমরা আমাকে বেড়াল পার করার মত করে এখানে ফেলে পালিয়েছ। এরমধ্যে একবারের জন্যেও খোঁজ নাওনি। সেই কবে যেন একবার শত্রুঘ্ন এসে ঘুরে গিয়েছিল, শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সেই যা যোগাযোগ। আর এদ্দিন পরে হঠাৎ তোমার দাদার প্রেম জেগে উঠল? ব্যাপারটা কী ঝেড়ে কাশো তো!'

লক্ষ্মণ জিহ্বাদংশন করে বললেন, এরকম বলবেন না দেবী। কদিন ধরেই দাদা বলছেন আমাদের গেছে যে দিন একেবারেই কি গেছে, কিছুই কি নেই বাকি? আমরা সবাই বললুম, তা কেন? রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।

সীতা গম্ভীর গলায় বললেন, 'বানিয়ে বলছে। যাই হোক, তুমি দূর থেকে এসেছ, বোসো, জলটল খাও। তারপর মুনিকে প্রণাম করে এবেলা এখানেই দুটি ডালভাত খেয়ে বেলাবেলি রওনা দাও। বেশি দেরি করলে আজ আর অযোধ্যা ফিরতে পারবে না। পথে শুধু ডাকাত নয় বাঘেরও ভয় আছে কিন্তু।'

লক্ষ্মণ মৃদু হেসে তিরধনুক দেখিয়ে সবিনয়ে বললেন, 'দেবী ক্ষত্রিয়ের হাতে অস্ত্র থাকতে কেউই কিছু করতে পারবে না।'

'আহা কী আমার বীরপুরুষ রে!' সীতা লক্ষ্মণের চিবুক নেড়ে দিলেন, 'সামান্য একটা সোনার হরিণ ধরতে গিয়ে ল্যাজে গোবরে হয় সে মারবে বাঘ!'

লক্ষ্মণ বললেন, 'দেবী আপনি সব কথা জানেন না।'

সীতা বললেন, 'জানতে চাইও না। শুধু জানি যে যদি সোনার হরিণটা ধরে আনতে পারতে, তাহলে আমাকে আর এই তপোবনে পড়ে থাকতে হতো না। যাক গে, কথা না বাড়িয়ে ওই ঘটিতে জল আছে, হাতমুখ ধুয়ে নাও। আমি রান্নাটা চাপিয়ে দিই।'

'আর আপনিও খেয়ে প্রস্তুত হয়ে নিন দেবী। লব কুশকে ডাকুন।'

'আমি?' সীতা আঁতকে উঠলেন, 'তুমি কি উন্মাদ না উদরাময়ের রোগী যে আমাকে অযোধ্যা যেতে বলছ? আমি কোথাও যাব না।'|

বহু অনুনয় বিনয়তেও কর্মসিদ্ধি হল না। ব্যর্থ মনোরথে লক্ষ্মণ ফিরে এলেন। আবার মন্ত্রণা সভা বসল। এবার ভরতের পালা। কিন্তু সীতা ভরতকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি তো চোদ্দ বছর পাদুকা দিয়েই কাজ চালিয়েছ, তাহলে আর কী অসুবিধে? আমার একপাটি নূপুর নিয়ে যাও বরং।'

মোটমাট কোনও কিছুতেই কাজ হল না। সীতার ধনুর্ভাঙা পণ যে তিনি যাবেন না। আর তাঁকে আসল ঘটনা জানাতে বশিষ্ঠ বারণ করেছিলেন। বলা তো যায় না, অনুনয় বিনয়তে যদিই বা রাজি হন, রাবণের ভূতের কথা শুনলে যে রাজি হবেন না বলাই বাহুল্য।

রামের ক্ষুধা দিন কে দিন বাড়তে থাকল। এখন রোজ দুবেলা দুটো মোষ না হলে পেট ভরে না। বৈদ্যরা আশঙ্কা করছেন যে, এরকম চলতে থাকলে আর কদিন পরেই অযোধ্যা হস্তিশূন্য হয়ে যাবে। তখন সিদ্ধান্ত হল যে হনুমান যাবে সীতার কাছে।

হনুমানকে দেখে সীতা যারপরনাই আনন্দ পেলেন। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ রে, এত গাছে গাছে ঘুরে বেড়াস। একবারও ইচ্ছে হয় না, মাকে দেখে আসি? মোটে তো আড়াই হাজার গাছ টপকাতে হবে।'

হনুমান করুণ গলায় বলল, 'আজকাল আর শরীরে তত জোর পাই না মা। বয়স হচ্ছে তো!!'

সীতা স্নেহার্দ্র গলায় বললেন, 'হ্যাঁ রে, এত রোগা হয়ে গেছিস কেন? বউ যত্ন করে না?'

হনুমান ব্রীড়া প্রদর্শন করে বলল, 'সেটা এখনও হয়ে ওঠেনি মা।'

'সে কী রে! কেন? আর কবে ঘর-সংসার করবি? রাজি থাকিস তো বল ঋষিকন্যা-টন্যা দেখি।'

আরও ব্রীড়াবনত হয়ে হনুমান বলল, 'কী যে বলো মা!'

'হ্যাঁ রে, এখনও হাজার যোজন লাফাতে পারিস?'

হনুমানের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'পারি না! দেখবে? আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে পিঠে চেপে বোসো। এক্ষুণি তোমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসছি।' হনুমান ভেবেছিল সীতা পিঠে উঠলেই একলাফে তাকে অযোধ্যায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে। কিন্তু সীতা বললেন, 'না রে বাবা। অভ্যেস নেই। মাথা ঘুরে পড়ে যাব। তা হ্যাঁ রে, এই যে এলি, দুদিন থাকবি তো আমার কাছে?'

হনুমান বুঝতে পারছিল এভাবে হবে না। অন্য উপায় বের করতে হবে। ছলে বলে যে করেই হোক সীতাকে নিয়ে যেতে হবে। নইলে রাবণের ভূত রামকে ছাড়বে না। সীতার প্রশ্নের উত্তরে বলল, 'হ্যাঁ মা, তোমার চরণে থাকব বলেই তো এসেছি।'

সীতা বললেন, 'পিঠে চেপে ঘোরানোর কথা বলে লবকুশকে যেন নাচাসনি আবার!'

হনুমান থেকে গেল তপোবনে। লবকুশের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল। প্রথম প্রথম ঋষিকন্যারা, যদি আঁচড়ে দেয় ভেবে, ওকে দেখলেই পালাচ্ছিল। তারপর ওর আসল পরিচয় জেনে কটাক্ষপাতে ঘায়েল করার চেষ্টা করল। কিন্তু হনুমানের সেসব দিকে নজর নেই। মাথায় একটাই চিন্তা।

দিন দুয়েক পরে ওর মাথায় একটা বুদ্ধি জাগল। যদিও তাতে খুব একটা ভরসা স্থাপন করতে পারছিল না। বড্ড বেশি ঝুঁকি হয়ে যাবে না তো? অনেকদিন অভ্যেস নেই, যদি গন্ডগোল হয়ে যায়! তাছাড়া ধরা পড়লে একদম খাঁচায় পুরে রেখে দেবে। বাল্মীকি বুড়োর মায়াদয়া আছে বলে তো মনে হয় না। যেভাবে সারাক্ষণ লগুড় হস্তে ঘুরে বেড়ায়, কোনওদিন না পিঠে এক ঘা বসিয়ে দেয়। কোনও পাকা মাথার সঙ্গে আলোচনা করতে পারলে ভাল হতো!

দু-দিন পরে রাত্তিরে লবকুশ ঘুমিয়ে পড়তে হনুমান নেত্র পিটটি করল। ঘরে ঘৃত প্রদীপ। অন্যদিন মায়ের কাছে ঘুমোলেও ইদানিং হনুদাদাকে জড়িয়ে ধরে না শুলে দুই ভাইয়ের নিদ্রাকর্ষণ হয় না।

গলার ওপর থেকে লবের হাত আর কোমর থেকে কুশের পা সরিয়ে উঠে বসল। গতকাল এক ফাঁকে তপোবন ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে বশিষ্ঠ আর লক্ষ্মণের সঙ্গে কথা বলে এসেছে। তখনই শুনেছে রাম নাকি ইতিমধ্যে দুটো বাঁদর ধরে কাঁচাই ভক্ষণ করেছেন। একাদশ সহস্র বৎসর এইভাবে চললে অযোধ্যাভূমির দশাও লঙ্কার মতই হবে। রাবণ কি এইভাবে প্রতিশোধ নিতে চায়?

এখানে কদিন থাকতে থাকতে লবকুশের ওপরে মায়া পড়ে গিয়েছে। আবার কবে দেখা হবে তার ঠিক নেই। কিন্তু মায়া ছিন্ন করে উঠে লবেরকুশের নাথায় শেষবারের মত হস্তলেপন করে হনুমান বাইরে বেরিয়ে এল। গোটা আশ্রম অন্ধকার। এর মধ্যে কোন কক্ষে সীতামা নিদ্রিতা কে জানে? ভুলক্রমে অন্য কোনও ঋষিকন্যার ঘরে ঢুকে পড়লেই সর্বনাশ। উদভ্রান্তের মত দ্বার হতে দ্বারে ফিরিল হনুমান। সীতার সন্ধান পেল না। তাহলে কি কুলে এসে তরী নিমজ্জিত হবে? হনুমান মনস্থির করে নিল। তারপর 'শ্রীরাম, জয় রাম, জয় জয় রাম।'

লক্ষ্মণের আদেশে গোটা প্রাসাদ আজ তমিস্রাময়। কেবল আকাশ থেকে শশাঙ্ক তার জ্যোৎস্নাধারা ঢেলে দিয়েছেন নিচের উদ্যানে। প্রাসাদের ভেতরে কেবল রামের শয়নকক্ষে একটি বৈদুর্যভূষিত পর্যঙ্কের চারপাশে চারটি কাঞ্চনদীপ জ্বলছে। সুগন্ধী পুষ্পসুবাসে বাতাস ভারাক্রান্ত। আর সেই পর্যঙ্কে মহার্ঘ আস্তরণের ওপরে পানপ্রমোদে বিরত হয়ে রাম নিদ্রা যাচ্ছেন এবং মাতঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছেন। মাথার কাছে খোলা গবাক্ষ। সেখান দিয়ে ওই চারটি কাঞ্চনদীপের শিখা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এই জ্যোৎস্নালোকিত নিশীথে ওই শিখাই আজ হনুমানের সংকেত। পর্যঙ্কের একপাশে অন্ধকারে নিঃশব্দে লক্ষ্মণ ভরত আর বশিষ্ঠ বসেছিলেন। বশিষ্ঠের ঠোঁটদুটো শুধু কাঁপছে। খুব সম্ভব রামনাম জপ করছেন।

লক্ষ্মণ বললেন, 'আহা, কুঞ্জবন থেকে ভারি সুন্দর গন্ধ আসছে তো!' জপ থামিয়ে বশিষ্ট বললেন, 'নারদ বলেছেন এই সময়ে ফুলের গন্ধ খুব উপকারী।'

ভাবালু কণ্ঠে ভরত বললেন, 'সেদিন শুনলাম কলিযুগের কোন ছোকরা নাকি লিখবে, 'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে/ উথলে পড়ে আলো।' সত্যিই তো, আহা কী শোভা!ও 'রজনীগন্ধা তোমার গন্ধসুধা ঢালো।' যাই বলো, ছোকরার এলেম আছে। কী চমৎকারই না লিখেছে। কই আমাদের মাথায় তো এসব আসে না!'

বশিষ্ঠ একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কাব্য আলোচনা করার অনেক সময় পাবে। এখন দয়া করে বকবকানি থামাও। ভরত সলজ্জে জিহ্বা দংশন করে চুপ করে গেলেন। কিন্তু আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে? হনুমান গেল কোথার? ভরত আবার মুখ নিয়ে এলেন লক্ষ্মণের কানের কাছে। চাপা গলায় বললেন, 'হনুমান কি পারবে?'

লক্ষ্মণও চাপা গলায় বললেন, 'পারবে। তুমি ওর শক্তিকে হেয় কোরো না।'

ভরত আবার কিছু একটা বলতে যেতেই লক্ষ্মণ ওষ্ঠপ্রান্তে অঙ্গুলি সংকেতে চুপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'বাজে না বকে এক মনে রামনাম করো। দেখবে সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গিয়েছে।'

অযাচিত উপদেশ শুনে ভরত মুখ বিকৃত করলেন, অন্ধকারে দেখা গেল না। বাইরে কীসের শব্দ হল। মনে হল বহুদূর থেকে প্রবল ঝঞ্ঝা ধেয়ে আসছে। বশিষ্ঠ ধ্যান থেকে উত্থিত হয়ে একাগ্রে সেই শব্দ শুনলেন। তারপর অলক্ষ্যে কাউকে প্রণাম জানিয়ে কপালে করস্পর্শ করলেন। লক্ষ্মণ ভরতের হাত টিপে জানালেন যে সব ঠিক আছে। ঝড়ের শব্দ নিকটবর্তী হল। গবাক্ষের ঠিক পাশে একটা ঝুপ করে শব্দ।

তারপরেই হনুমানের চাপা গলা শোনা গেল, 'সীতামাকে নিয়ে এসেছি। তাড়াতাড়ি করুন।'

ভরত আর বশিষ্ঠ দৌড়ে গবাক্ষের কাছে গেলেন। গবাক্ষের বাইরে অন্ধকারে মনে হল ঘন অরণ্যের আড়ালে জ্যোৎস্নাধারা লুপ্ত হয়েছে। ভরত নিজের মনেই বললেন, 'এ হে, বাগানটা একেবারে জঙ্গলে ভরে গিয়েছে। সবকটা মালি হয়েছে ফাঁকিবাজ।'

বশিষ্ঠ ওষ্ঠপ্রান্তে অঙ্গুলি রেখে শেষনাগের শীৎকারের মত শা ধ্বনি করে ভরতকে স্তব্ধ করিয়ে দিয়ে হনুমানকে বললেন, 'কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না। শিগগিরি ওপরে নিয়ে এসো।'

হনুমান বলল, 'ওপরে আনা যাবে না। অন্ধকারে বুঝতেই পারিনি যে সীতা মা কোন ঘরে ঘুমোচ্ছেন। শেষে খুঁজে না...। কথা শেষ হল না, একটা দিব্যগন্ধী হাওয়া ভেসে এল গবাক্ষপথে। ভরত আর লক্ষ্মণ বুঝলেন সীতাদেবীর শরীরের আঘ্রাণ। আর সেই ঘ্রাণ

নাসিকাপথে প্রবেশ করতেই রাম গোঁ গোঁ করতে করতে পর্যঙ্গে উঠে বসলেন। তারপর টলায়মান অবস্থায় দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই লক্ষ্মণ সবলে ধাক্কা দিয়ে তাঁকে আবার শয্যায় ফেলে দিলেন। আর অমনি রামের শরীর থেকে একটা দুর্গন্ধময় কালো ধোঁয়া বেরিয়ে চারটে কাঞ্চনদীপের একটিকে নিভিয়ে দিয়ে খোলা গবাক্ষপথে উর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে গেল।

ভরত বললেন, ‘ প্রদীপটা নিভে গেল! ছি ছি রাম রাম!’

রাম ততক্ষণে আবার শয্যায় উঠে বসলেন, দীপ্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘লক্ষ্মণ, এখানে কী করছ তুমি?’

গবাক্ষের বাইরে মুখ বাড়িয়ে বশিষ্ঠ চাপা কণ্ঠে বললেন, ‘হনুমান এক্ষুনি পালাও। রাম জেগে উঠেছেন।’

হনুমান বলল, ‘তিনি কি সুস্থ?’

‘হ্যাঁ, সুস্থ বলেই তো মনে হচ্ছে। একটা কালো ধোঁয়া বেরিয়ে গেল দেখতে পেলে না? রামের গায়ের বোঁটকা গন্ধটাও আর নেই। মনে হচ্ছে রাবণ পালিয়েছে।’

‘কিন্তু ভাল করে দেখে নিলে হতো না? যদি কাজ না হয়ে থাকে? বার বার তো আনা যায় না।’

রাম বললেন, ‘জানলার বাইরে কে? হনুমানের গলা মনে হচ্ছে! এত রাত্তিরে সবাই এখানে কেন? গুরুদেবও রয়েছেন দেখছি। গুরুতর কিছু নাকি?’

হনুমান জিহ্বা দংশন করল। তারপরেই আবার শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম। একটা ঝড়ের শব্দ আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে গেল। রাম ততক্ষণে আবার শয্যার দেহভার ছেড়ে দিলেন। উদ্যানপথে চন্দ্রদেব তাঁর দেহকান্তি আবার বিছিয়ে দিলেন। বশিষ্ঠ পর্যঙ্কের পাশে এসে রামকে দেখে বললেন, ‘ঘুমিয়ে পড়েছে আবার? ঘুমোক। এখন যত ঘুমোবে তত বল ফিরে পাবে। চলো আমরা যাই।’

কক্ষের বাইরে এসে ভরত নিজের মনেই বললেন, ‘হনুমানটার কান্ড দেখো একবার। বলা হল কেবল শয্যাসমেত সীতাদেবীকে নিয়ে এসে আবার রেখে আসবি, তা না গোটা তপোবনটাই উপড়ে তুলে এনেছে। ঠিকঠাক রেখে আসতে পারবে তো? ভুল করে ভাগিরথীর জলে না চুবিয়ে ফেলে!!’

লক্ষ্মণ হেসে উঠলেন, ‘না না, কী যে বলো তুমি! সে সব ব্যাপারে জ্ঞান টনটনে।’

‘কে জানে ভাই!’ ভরত দীর্ঘ জুঞ্জন পরিত্যাগ করলেন, বাঁদুরে বুদ্ধি কি আর সাথে বলে!

লক্ষ্মণ বললেন, ‘সেবারেও ঠিক এরকম করেছিল, শক্তিশেল লেগে আমি যেবার অজ্ঞান হয়ে যাই।’

কৌতুহল ভরা কণ্ঠে ভরত বললেন, ‘তাই নাকি? আমি বরাবর বলে আসছি হনুমানের বুদ্ধিসুদ্ধি একটু কম। তা কি হয়েছিল সেবার?’ বহুশ্রুত কাহিনি তবুও আরেকবার শুনতে ভরতের আপত্তি নেই। বিশেষত এই উত্তেজনার পরে নিদ্রা আসা কঠিন। শুধু রামের শরীর থেকেই তো নয়, দুই ভাই এবং বশিষ্ঠাদি ঋষিদের মন থেকেও এতদিনে রাবণের ভূত অপসারিত হয়েছে। কাজেই সহস্রবার শোনা গল্পের পুনরুক্তিতে দোষ কোথায়?

বহুদূরে শয্যাপরে লব আর কুশ দুই ভাই এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল তারা যেন হনুমানের পিঠে চেপে উড়ে চলেছে। ঘুমের ঘোরেই তারা হাত বাড়িয়ে হনুমানকে খুঁজল। কাউকে না পেয়ে কুশ একবার নিদ্রাজড়িত চোখ খুলে পার্শ্বশায়িত ভ্রাতাকে দেখল, তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

একমাত্র বাল্মীকির চক্ষে নিদ্রা ছিল না। তিনি সবই দেখেছেন সবই বুঝেছেন। কিন্তু মুখ দিয়ে টু শব্দটিও করেননি। একবার ভাবলেন এই অভিনব ঘটনাটি তাঁর কাব্যে যুক্ত করেন। তারপর মনে হল অহেতুক খাটনি করে কী হবে? পরিধানের মৃগচর্মের অন্তরাল থেকে একটি পাকানো কেন্দুপত্র টেনে নিলেন। কাষ্ঠঘর্ষণে তাতে অগ্নিসংযোগ করলেন। তারপর ধুম্রজালে আকাশ ভরে গেল। ■

প্রবীর ঘোষ রায়

ছাতার মাথার গল্প

টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে সুকেশ এসে ঢুকেছে মমতাবালা ঔষধালয়ে। তারপর ওষুধের অর্ডার দিতে দিতে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। ওষুধ মানে গ্যাস, অম্বল, মাথাব্যথার মামুলি ওষুধ। ডাক্তার দেখান হয়ে ওঠে না। যা সব ভিজিট। সুকেশের মনে হয়, সব ডাক্তারদের পূর্বপুরুষরা আসলে ডাকাত ছিল। ডাকাত থেকে ডাক্তার—শব্দের মিলটুকু বের করতে পেরে সুকেশ খুশি হয়েছিল। সুকেশকে দোকানের লোকেরা চেনে। দোকানটা পুরনো। সুকেশও পুরনো। বছরখানেক হল ষ্টেশনের কাছে দুটো নতুন ওষুধের দোকান হয়েছে। একটাতে এক ডাক্তারবাবুও বসে। ডক্টর ঢালি, এম বি বি এস (কলি)। কী ঢালে কে জানে! খুব একটা পসার নেই। ঢালিকলি। শব্দ নিয়ে খেলতে ভালোই লাগে। চেষ্টা করলে সুকেশ হয়তো লেখক-টেখক হতে পারত। কিন্তু চেষ্টা করাটা হয়ে ওঠে না। যা ভাবনা আসে মাথাতেই থাকে। উচ্চ মাধ্যমিকের পর থেকে খাতা-কলমের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। বেচাকেনা ছাড়া। একসময় গল্প-উপন্যাস পড়তে ভালো লাগত। কিন্তু এখন কিছু পড়তে নিলেই ঘুম পায়। শুধু রাত্তিরে দোকান থেকে ফেরার সময় নিতাইদার দোকানে বসে দিনের কাগজটা উল্টেপাল্টে দেখে। অনেকদিনের অভ্যেস। চাওয়ালা হিসেবে নিতাই বেশ বনেদি। টিনের দেওয়াল, ছাদ, ঝাঁপ। মাটির উনুন, টাউস কেটলি। কাচের গেলাস বা মাটির ভাঁড়। কাঠের চার পায়ের ওপর বাঁশের ছাউনি দেওয়া বেঞ্চ। তাতে বসে যত খুশি গুলতানি মারো। দিনের কাগজ ফ্রি। সকালের দিকে ভাগাভাগি কাড়াকাড়ি হয়। সুকেশ যখন আসে তখন সব খবর পুরনো, বাসি। সুকেশ এক গেলাস কড়া দুধচায়ের সঙ্গে কাগজের সব হেড লাইনে ধীরে সুস্থে চোখ বোলায়। দু-একটা খবরের ভেতরটা পড়ে। যেমন চুরি বা ডাকাতির খবর থাকলে সে খুঁটিয়ে পড়ে ফেলে। কী চুরি হয়েছে, চোর বা ডাকাত ধরা পড়েছে কিনা— এই সব।

নতুন দোকান যতই হোক, মমতাবালা ঔষধালয়ে সারাদিন ভিড় লেগেই থাকে। এখানকার লোক পুরনোর কদর করতে জানে। এই দোকানে ডিসকাউন্ট কম। কিন্তু সবাই এখানেই আসবে। ষ্টেশনের কাছের নতুন মাথা তোলা ফ্ল্যাট বাড়ির বাসিন্দারা বাদে। এরা নতুন। অনেক সকালে হাঁটা পথে স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরে বাবুরা সব কলকাতায় চলে যায়। ফিরতে ফিরতে রাত নটা-দশটা।

সাহেবগঞ্জের এই স্টেশন বছর দশেক হল হয়েছে। পুরনো মানুষেরা বাস রাস্তার দিকে থাকে। তারাই আন্দোলন করেছিল রেল স্টেশনের জন্য। শেয়ালদায়

গিয়ে ৬নম্বর প্লাটফর্মে লাল পতাকা নিয়ে অনশনেও বসেছিল জনা কুড়ি ছেলেবুড়ো। আরপিএফ মৃদু লাঠি চালিয়ে সবাইকে তুলে দেয়। কোন ফাঁকে এক ছোকরা ফটোগ্রাফার সেই ছবি তুলে কাগজে ছাপিয়ে দেয়। শোনা যায় এখানকার এমপি নাকি পার্লামেন্টে ব্যাপারটা তুলতে পেরেছিল। তারপর পাওয়া গেল স্টেশন। কিন্তু একটু দূর হয়ে গেল। ভূতপেত্নীর ঝিলের ধারে। ঝিলের অমন অদ্ভুত নাম কেন কেউ বলতে পারে না। হয়ত কোনওকালে তেনারা থাকতেন। কিন্তু আজকাল বাচ্চারাও ভুতে ভয় পায় না। হাসে। 'ভূত আমার পুত পেত্নী আমার ঝি' ইত্যাদি ছড়া তো বড়রাও ভুলে যাচ্ছে। কেউ রাম নাম করলে বরং ভয় বাড়ে। আজব ব্যাপার।

ঝিলের মাঝখান দিয়ে পঞ্চায়েত স্টেশনে যাওয়ার রাস্তা বানাল। একশো দিনের কাজের কিছুটা কাজে লাগল। পুরনো বসতি থেকে স্টেশন একটু দূর হল বটে, কিন্তু ঝিলপাড়ে নতুন বসতি গড়ে উঠল। অনেকে এই অঞ্চলটাকে নিউ সাহেবগঞ্জ বলে থাকে। ওল্ড সাহেবগঞ্জের দু-একজন যাদের হাতে দু-চার পয়সা আছে তারা খোঁজ নিতে গিয়ে দেখল ঝিলের কাছের সব জমিই লোকাল এমপি-র আত্মীয়-স্বজনদের হাতে চলে গেছে। এমএলএ সাহেবও ছিটেফোঁটা পেয়েছেন। তখন পুরনো জনপদ থেকে স্টেশনের দূরত্বের আসল রহস্য জানা গেল। যারা নতুন জায়গায় জমি কেনার তালে ছিল, সব বোকা বনে গিয়ে এমপি, এমএলএ-র নামে আপত্তিজনক শব্দ, বাক্য উচ্চারণ করতে করতে হেদিয়ে গেল। সুকেশ অবশ্য এতে অস্বাভাবিক কিছু খুঁজে পায় না। এক-একটা ইলেকশন জেতা কি চাট্টিখানি কথা? দেখলে হবে? খরচা আছে। তারপর জনগণের মন পেতে রোদ নেই, জল নেই হাতজোড় করে দোরে দোরে ঘোরা! কম কষ্ট? শরীরপাত হয় হয়। ফলে সুকেশ নীরব দর্শক ও শ্রোতা। তাছাড়া বেল পাকলে কাকের কী? তার এক ছটাক জমি কেনার পয়সাও নেই। দরকারও নেই। বাবার রেখে যাওয়া দশকাঠা জমির একছত্র মালিকানা তার। সে জমির দাম কত তা জানার আগ্রহও তার নেই। পড়শি টেকো মুকুন্দ বলতে এসছিল দশকাঠা থেকে তাকে তিন কাঠা মতো ছেড়ে দিতে। তার বদলে স্টেশনের সবচেয়ে কাছের ফ্ল্যাটবাড়িতে একটা দু-কামরার ঝাঁ চকচকে ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা সে করে দেবে। এমপি-র ভাগ্নে প্রোমোটার। মুকুন্দের ছেলেবেলার বন্ধু। এই প্রস্তাবের উত্তরে সুকেশ রবি ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করায় টেকো মুকুন্দ ঘাবড়ে গিয়ে কথা বাড়ায়নি। 'দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া!' একসময় 'দুই বিঘা জমি' পুরোটা মুখস্থ ছিল। আজকাল সবটা মনে পড়ে না। মনে মনে বলতে গেলে পংক্তি আগে-পরে হয়ে যায়। লেখাপড়ায় খারাপ ছিল না সুকেশ। কিন্তু কলেজে পড়তে হলে শহরে যেতে হবে। বাবাও মরে গেল বিনা নোটিশে। মা তো চলে গেছে সেই কবে। বসার ঘরের দেয়ালে ঝোলান ফটোর মুখটুকুই মনে আছে শুধু। পাশে এখন বাবাও ফটো হয়ে আছে। তাও এক দশক হতে চলল।

বাবার স্টেশনারি দোকানকেই চালু রাখল সুকেশ। সঙ্গে মোবাইল সিম আর রিচার্জের কারবার যোগ করে মোটামুটি খাওয়া-পরার ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। বাস রাস্তার ওপর দোকান। রানিং কাস্টমারই বেশি। সাহেবগঞ্জ বয়েজ হাই আর স্বর্ণময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও তার বড় খদ্দের। স্বর্ণময়ীর ক্লাস ইলেভেনের সুকন্যাকে পেনের দাম দিতে হবে না বলে কী ঝামেলায় যে পড়া গেছিল, কহতব্য নয়। কেন নেবেন না? আমরা কি ভিখারি? কী মতলব বলুন তো? আমাকে সস্তা পেয়েছেন? বাপরে, কী তেজ সেই মেয়ের! ক্ষমা-টমা চেয়ে বহু কষ্টে কাটান ছাড়ান তো দেওয়া গেল, কিন্তু মন রইল এলিয়ে পড়ে। ব্যবসা, বাড়ি, ক্লাব, নিতাইদার চা কিছুই ভালো লাগে না।

সুকন্যারা সত্যিই গরিব। হয়তো তাই পেনের দাম নিতে না চাওয়ায় তার বেশি কষ্ট হয়ে থাকবে। বারের ঠাকুরকে এগারো টাকার পুজো দিয়ে সুকেশ জয় মা বলে রওনা হয়েছিল। শনিবাবার পাশে মা কালীও ছিলেন।

যেমন থাকেন। হরেন কাকা, মানে সুকন্যার বাবা বললেন, 'তুমি তো সুবোধের ছেলে। ভালো ছেলে। কিন্তু ফুচুর ইচ্ছে ছিল আরও পড়ার।' কথার কথা। গরিবের মেয়ে। বাড়ি বয়ে আসা সম্বন্ধ। মফস্‌সল হলেও দশ কাঠা জমির ওপর পাকা বাড়ি। চালু দোকান। এ ছেলে হাতছাড়া করার মানেই হয় না। সুকন্যার আপত্তি ছিল বিয়েতে। সেই আপত্তির জের বিয়ের পরেও মাস ছয়েক ছিল। সে বড্ড একরোখা মেয়ে। হ্যাঁ তো হ্যাঁ, না তো না। সুকেশের জন্য বরাদ্দ ছিল ওই 'না'। বিয়ের পরেও দীর্ঘদিন তার কৌমার্য ঘোচেনি। লাইফটা জাস্ট হেল হয়ে গেছিল। তারপর হঠাৎ এক চাঁদনী রাতে অনঙ্গদেব দয়া করে তার পুষ্পধনু থেকে শরবর্ষণ করলেন। বাঘ-বাঘিনী রক্তের স্বাদ পেল। সুকেশের দোকানে সন্ধে হতেই ঝাঁপ পড়তে লাগল। নিত্যদিন ফিরতি পথে নিতাইদার দোকানে খবরের কাগজে চুরিচামারির গল্পও না-পড়া রয়ে গেল আর ফুচুর রাজ্যের ঘরের কাজ বকেয়া পড়ে থাকল না। যৌবনের ধর্ম সোৎসাহে পালিত হতে লাগল।

কিন্তু বউয়ের একরোখা ভাবটা গেল না। বিশেষ করে গরিব মানুষের মধ্যে সততাই শ্রেষ্ঠ পন্থা জাতীয় যে আদর্শবাদী ব্যাপারটা দেখা যায়, তা ফুচুর মগজে ষোলর ওপর আঠারো আনা বর্তমান। তার চোখকানও বেশ খোলা, সংসারের কোনও খুঁটিনাটিও তার নজর এড়াতে পারে না। ফলে সুকেশের সামান্য গোপন কথাটাও একদিন বউয়ের কাছে খোলসা হয়ে গেল। সুকেশ পরে ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখেছে, মেয়েমানুষের প্রেমে পড়াটা পুরুষের পক্ষে না হোক বোকামির কাজ।

তবে সুকেশের বদ অভ্যাসটা ভয়ানক কিছু একটা ব্যাপার যে তাও নয়। সে তো আর জোর করে চুরি-ছিনতাই- ডাকাতি করে না। কিন্তু মানুষের অন্যমনস্কতার বোকামিকে শাস্তি দিতে মাঝে মধ্যে ব্যাপারটা সে ঘটিয়ে ফেলে। খুব যে সচেতনভাবে করে তাও নয়। কেউ যেন তাকে দিয়ে করিয়ে নেয়। সে মোটে লোভীও নয়। দোকানের জিনিস সে খরিদ্দারদের এমআরপি-র চেয়ে কমেই বিক্রি করে। চেনাজানা মানুষগুলোকে যতটা সুবিধে দেওয়া যায়, সে চেষ্টা করে দিতে। দেশের অর্থনীতির হাল মোটে সুবিধের নয়। বিশেষত নোটবন্দির মত বিচ্ছিরি ব্যাপারটা হওয়ার পর থেকে মানুষের যেন আরও হতচ্ছাড়া দশা হয়েছে। ছেলেমেয়েরা আজকাল খাতায় কলমে লেখাপড়া কম করে। তার জায়গায় মোবাইল এসেছে। সিম বিক্রি, রিচার্জের ব্যবসাটা ধরে খানিকটা পুষিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আজকাল সব নিজেরাই টপ-আপ, রিচার্জ করে ফেলে পটাপট। পেটিএম, গুগল পে...। নেহাত আতান্তরে না পড়লে কেউ দোকানমুখো হয় না। দৈন্যের দায়ে মায়ের অংশই না বেচতে হয়! তার ওপর এক রোববার সকালে ফুচু যখন অফুচুসুলভ লজ্জা লজ্জা মুখ করে সুখবরটা দিল তখন আনন্দ হল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে চিন্তাও বাড়ল বৈকি। একটা বাড়তি মানুষ। বাড়তি খরচ। দেখা যাক।

সমস্যা সেখানে নয়। আসলে সুকেশ যে দুষ্কর্মটা করে তা অনেকটাই বে-খেয়ালে। বা বলা যায় অন্য মানুষ বেখেয়ালি হলে তার হাত যেন নিজে থেকেই তাকে শাস্তি দেয়। এর পেছনে সুকেশের বাবা সুবোধেরও কিছু ভূমিকা আছে। সে খুব গোছান মানুষ ছিল। সুকেশের পাঁচ বছর বয়সে তার মা মারা যায়। বাপবেটার সংসার দেখে কেউ বুঝতে পারত না যে, সেটা নারীবর্জিত যাপন। জায়গার জিনিস জায়গায় না থাকলে সুবোধের মাথা গরম হয়ে যেত। দোকানে তালা দিয়ে সে অন্তত পাঁচবার টেনে দেখত, ঠিক আছে কিনা। অযথা জিনিস নষ্ট বা কিছু হারিয়ে ফেলা অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ বলে ধারণা ছিল তার। সুবোধ মা মরা ছেলেকে কখনই মারধোর করতো না। কিন্তু ক্লাস সিক্সে থাকতে স্কুলে ইতিহাস বই হারিয়ে আসার জন্য তিনদিন ছেলের সঙ্গে কথা বলেনি সুবোধ। ছেলেটা মানুষ হবে না এই আশঙ্কায় বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল সে। বাবার এই চিত্তবৈকল্য সুকেশের কিশোর মনে একটা গভীর দাগ ফেলে দেয়। সুবোধ অবশ্য ছেলেকে আরেকটা ইতিহাসের বই যোগাড় করে দিয়েছিল।

কিন্তু বই হারানোটা যে মোটেই ঠিক হয়নি, বাপবেটার বাক্যালাপ শুরু হওয়ার পর থেকে মাস তিনেক সুকেশকে এই তিরস্কার শুনতে হয়েছিল। মানুষের বে-খেয়ালে ফেলে রাখা জিনিস না বলে হাতিয়ে নিয়ে তার সেই ছোটবেলার শাস্তির ভাগ সুকেশ অন্যদের দিয়ে থাকে। অন্তত এইভাবেই সুকেশ মনে মনে তার অপরাধকে ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা করে আসছে।

প্রথম ঘটনাটা সে স্কুলেই ঘটায়। এইটে পড়ার সময় তাদের ক্লাসে এক বড়লোকের ছেলে এসে ভর্তি হয়। অভয়। তাকে বোধহয় শহরের কোনও বড় স্কুল থেকে রাস্টিকেট করা হয়েছিল। তাদের ছিল সোনার গয়নার কারবার। তার বাবা অনেক দান খয়রাত দিয়ে সাহেবগঞ্জ বয়েজ হাই-তে সেশনের মাঝামাঝি তাকে ভর্তি করে দিয়ে যায়। স্কুলে সে প্রায়ই আসত না। এলে বাড়ির মোটরগাড়িতে। চালবাজি আর বারফট্টাই। তার পকেটমানির গন্ধে চেলাচামুণ্ডা জুটে গেল অচিরেই। অভয় পড়াশোনায় জিরো কিন্তু উপকরণ আর দেখনদারিতে হিরো। দামি কলম, দামি হাতঘড়ি, দামি স্কুলব্যাগ। সুকেশ একটু তফাৎ রেখেই চলত। একদিন ছুটির সময় অভয় তার সভাসদদের নিয়ে ক্লাশরুম থেকে বেরোচ্ছে, সুকেশ নিয়ম করে তার সব বইখাতা গুণেগেঁথে ব্যাগে ঢোকাচ্ছে। অভয় সুকেশের দিকে করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নির্গত হল আর সুকেশ দেখল অভয়ের ডেস্কের পাশে তার দামি পার্কার কলমটা পড়ে রয়েছে। সেকালে পার্কার পেন মানে বিশাল ব্যাপার। মাস্টারমশাইদের কারো কাছেও সে কলম কেউ কখনও দেখেনি। সুকেশ নিঃশব্দে পেনটা তুলে নিজের ব্যাগে ভরে নেয়। অবাক এই যে অত দামি কলম হারানো নিয়ে অভয় কোনও হা-হুতাশ করেনি। অবশ্য পরে যেদিন স্কুলে আসে তুলনায় সস্তা দেশি কলম নিয়ে আসে। সুকেশ লক্ষ্য করেছিল। তবে অভয়ের হাতঘড়ি হারানোর পর হইচই হয়। টিফিনে সুকেশ বেসিনে হাত ধুতে গিয়ে দেখে অভয় হাত ধোওয়ার সময় তার রিস্ট ওয়াচ খুলে বেসিনের পাশে রেখে গেছে। স্কুলের সব ছেলের ব্যাগ তল্লাশি হয়। কিছু পাওয়া যায় না। সুকেশ হেডস্যারের ঘরের পাশের আমগাছের চেনা কোটরে ঘড়িটা ফেলে রেখেছিল। ঘটনার তিনদিন পর সব ঠান্ডা মেরে গেলে বের করে নেয়।

সুকেশের এই অপকর্মের কথা কেউ কখনও টের পায়নি। বাবা তো নয়ই। পেলে কী করতো কে জানে! তবে সুকেশ কখনও কারও কোনও জিনিস চুরি করেনি। জীবনে না। অন্যের হারানো জিনিস হাতে পেলে ফেরত দেয়নি, এই মাত্র। মন্দিরের বাইরে থেকে অন্যের জুতো নিয়ে আসাটা অবশ্য একটু অন্যরকম। কিন্তু অতো দামি জুতো পরে দেবালয়ে আসার দরকারটাই বা কী? কে না জানে, যে মন্দিরে জুতো জিম্মা রাখার ব্যবস্থা নেই, সেখানে ছেঁড়া হতশ্রী চটি, হাওয়াই চপ্পল ইত্যাদি পরে আসতে হয়। এও তো একরকম অসাবধানতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া। মন্দিরের দেব বা দেবী কি শরণাগতদের জুতোর সুরক্ষা করতে সক্ষম? না। তবে?

তবে আজকাল হনুমানের ডিম্যান্ড খুব বেশি। বাজারের কাছে বছর দুয়েক হলো মাখনলাল মাড়োয়ারি এক বজরংবলী মন্দির খুলে বসেছে। বজরংবলী হল কমলা রঙের হনুমান। হনুমান নাকি একদিন সীতাকে সিঁদুর পরতে দেখে প্রশ্ন করে, মা তুমি রঙ মাখছ কেন? সীতা বলে, শ্রীরামের মঙ্গলকামনায়। তাইতে ভক্ত হনুমান নিজেও সারা গায়ে কমলা সিঁদুর মেখে নেয়। যাতে তার প্রভুর আরও মঙ্গল হয়। তখন রাম তার নাম রাখে বজরংবলী। বজরং মানে কমলা। মন্দিরের পুরোহিত ঘনশ্যাম আচারিয়ার কাছে এই লোককথা শুনেছে সুকেশ। মঙ্গলবারের সন্ধেয় মন্দিরে পা রাখা যায় না। ভিড়ে ভিড়।

সেদিন দোকান থেকে ফিরলে ফুচু লম্বা লিস্ট ধরিয়ে বলল, অনেকদিন বাজার-হাট করোনি। এগুলো এনে দাও। নইলে কাল সকালে রান্না হবে না। ইচ্ছে না থাকলেও যেতে হল। মন্দিরের মধ্যে কে যেন সুর করে হনুমান চল্লিশা পাঠ করছে। সুকেশ কৌতুহলী হয়ে উঁকি

দিল। এক ঝলক দেখে মনে হল নির্ঘাৎ কলকাতা থেকে আনা আর্টিস্ট। মাখনলাল মাড়োয়ারি প্রকৃত ব্যবসায়ী। সে হনুমানকে যথাসময়ে ব্যবহার করতে পেরেছে। সুকেশ দু'মিনিট দাঁড়িয়েই বেরিয়ে এল। তার ছেড়ে রাখা সস্তা চপ্পলের পাশেই এক জোড়া নরম চামড়ার জুতো। ফিতের ব্যাপার নেই। পা গলিয়ে দিলেই হল। এতো দামি জুতো পরে কেউ মন্দিরে আসে? সুকেশ হাতের বাজারের ব্যাগ বাঁ বগলে চেপে সেই জুতো জোড়ায় একে একে পা গলিয়ে দিল।

এই পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু ঝিঙে থেকে তেঁতুলের আচার সব ফর্দ মিলিয়ে কিনে বাসায় ফিরে ঝামেলায় পড়ে গেল সুকেশ। তার চপ্পল কে পরে চলে গেছিল তাই সে তার বদলে এই জুতো পায়ে গলিয়ে চলে এসেছে, এই যুক্তি ধোপে টিকল না। প্রথমত সে মন্দিরে ঢুকতেই বা কেন গেল তাই বোঝা যাচ্ছে না। যদি পুজো দেওয়ার থাকতো তো তারা দুজনে মিলে একদিন যেতেই পারতো। তেঁতুলের সঙ্গে সুকেশ বাড়তি কুলের টকঝাল মিষ্টি আচারও নিয়েছিল। ছিদাম কাকার আচার পৃথিবী বিখ্যাত। সুকেশ জানে, এই সময় মেয়েরা টক খেতে পছন্দ করে। কিন্তু তার ভালোবাসার কোন কদর নেই। ফুচু লেগে পড়ল শৌখিন জুতো জোড়ার পেছনে। এক ঘণ্টা কথা কাটাকাটির পর সুকেশ বলে ফেলল, যা করি বেশ করি। নিজের জিনিস যত্ন করে দেখে শুনে রাখতে না পারলে তা অন্য লোকের ভোগেই লাগবে। কিছু করার নেই। স্কুলে পড়ার সময় থেকে আজ পর্যন্ত তার সমস্ত পরস্বাপহরণের গল্প সুকেশ গড়গড় করে বলে গেল। নাও, কী করবে করো? ফুচু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বাবা বলেছিল, তুমি নাকি খুব ভালো লোক, সরল, সৎ। ফুচু সঙ্গে আরেকটা মারাত্মক কথা বলে ফেলল। সুকেশ কী এমন যত্নে, কী এমন দেখেশুনে রেখেছে তাকে এই সংসারে? রাখেনি তো? তাহলে তাকেও যদি কেউ তুলে নিয়ে যায়, তবে কী বলবে সুকেশ? কথা শুনে সুকেশের হাত-পা ছেড়ে যাবার অবস্থা। পেনটা, ঘড়িটা, জুতোটা— এদের সঙ্গে অগ্নি সাক্ষী রেখে বিয়ে করা বউয়ের তুলনা! হায় বজরংবলী। হনুমান সত্যিই এই ঘোর কলির সবচেয়ে জাগ্রত দেবতা। শ্রীরামেরও এককাঠি ওপরে। কেন যে বজরংবলীকে ঘাঁটাতে গেল সে! রাত্তির বারোটায় বউয়ের মাথায় আর পেটে হাত রেখে সুকেশকে প্রতিজ্ঞা করতে হল, এই অপকর্ম আর কখনও করবে না সে। পেটের ভেতর তাদের ছেলে বা মেয়ে আছে। অর্থাৎ বউ-বাচ্চার যুগপৎ কসম খেয়ে তবে রাতের খাবার জুটলো।

তারপর থেকে খুব সাবধানে থাকতে হচ্ছে সুকেশকে। একদিন রাস্তায় পড়ে থাকা পঞ্চাশ টাকার নোট পেয়েও কুড়িয়ে নেয়নি। বউয়ের চেয়েও না দেখা বাচ্চার জন্য মায়া যেন আরও বেশি। বজরংবলীকে তার খুব সিরিয়াস টাইপের দেবতা বলে মনে হয়নি কখনও। সে কিনা তার রোষেই পড়ল?

ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে আরও দুই কাস্টমার ঢুকেছে মমতাবালা ঔষধালয়ে। দুজনেই বেশ বয়স্ক। সুকেশ এলেবেলে কাস্টমার। তাছাড়া দোকানের সবই তার অনেকদিনের চেনা। 'আরে বসো না, সিনিয়ারদের একটু ছেড়ে দিই'। বসার যদিও জায়গা নেই কোনও। সিনিয়ারদের প্রেস্ক্রিপশন মিলিয়ে ওষুধ দিতে দিতে বৃষ্টি একেবারে ধরে গেল।

বর্ষার দিনে এই দোকানে ঢুকতেই একটা বালতি রাখা থাকে, যাতে ভিজে ছাতা রাখা যায়। সুকেশ ওষুধ নিয়ে বেরোতে গিয়েই দেখল বালতিতে একটা ফোল্ডিং কালো ছাতা রাখা। দোকানে এখন কোনও খদ্দের নেই। তার মানে ছাতাটা ওই দুই বুড়োর এক বুড়োর হবে। ছাতাটা নতুন। মনে হচ্ছে শক্তপোক্তও। আজকালকার চাইনিজ মার্কা না। মহেন্দ্র দত্ত বা কে সি পাল হলেও আশ্চর্য না। বৃষ্টির মধ্যে বেরোলে ছাতা মাথায় বেরোতে হয়। তারপর কাজের শেষে বৃষ্টি ধরে গেলে ছাতার কথা অনেকেই ভুলে যায়। এটা খুব একটা নিন্দনীয় অন্যমনস্কতা নয়। সুকেশ আলগোছে বালতি থেকে ছাতাটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে

এল। বৃষ্টি থেমে গিয়ে এখন কটকটে রোদ উঠেছে। সুকেশ ছাতা খুলে মাথায় দিল। বেশ বড় বেড়ের ছাতা। শক্তপোক্ত। কোনও চেনা কোম্পানির ছাপ নেই অবশ্য। মাথার টুপিতে এসবি লেখা আছে। হয়তো শম্ভু ব্যানার্জির ছাতা। ব্রাহ্মণ কি ছাতার কারবারি হবে? তাহলে বসাক হতে পারে। যাই হোক।

কিন্তু বাড়ি যত কাছে আসছে, সুকেশের পা আর চলছে না। পা দুটো ভারি হয়ে রাস্তার ভিতর ঢুকে যেতে চাইছে। এ কী করলো সে? অনাগত সন্তানের দিব্যি দিয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ? বজরংবলীর হনুমানসুলভ হাসি হাসি মুখটা মনে করে প্রাণপণ ক্ষমা চাওয়ার চেষ্টা করছে সুকেশ। কিন্তু এই আপদের ছাতা নিয়ে বাসায় ঢোকা চলবে না কিছুতেই। শীতলা তলায় এক বুড়ি ভিক্ষে করে এই সময়টায়। আজকাল হিজড়েরা আসে মাঝে মধ্যে, জবরদস্তি ভিক্ষে চায়। যেন তাদের হকের পাওনা। কিন্তু হরি নাম, শ্যামা নাম করা ট্রাডিশনাল ভিক্ষুকদের বড় একটা দেখা যায় না। এই বুড়ি ব্যতিক্রম। গরুহাটার মোড় ঘুরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সুকেশ। বুড়ি শীতলাতলায় বসে আছে। সুকেশ বুড়ির হাতে খোলা ছাতার হাতলটা ধরিয়ে দেয়, 'রোদে মাথা ফেটে যাবে তো! এই ছাতাটা তুমি রেখে দাও বুড়িমা'। বুড়ি জানায় হরির কৃপায় সুকেশের অশেষ মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। হরির চেয়ে আজকাল হনুমানের ক্ষমতা বেশি, সুকেশ মনে মনে ভাবে। বুড়ির হাতে দুটো টাকাও ধরিয়ে দেয় সে। দোষ কাটান হলে ভালো। ফুচুর এখন পাঁচ মাস চলছে।

বাসায় ঢুকতেই ফুচু বলে, 'যা জল হচ্ছিল। আমি ভাবলাম তুমি ভিজে কাঁথা না হয়ে যাও। যাকগে। রান্না হয়ে গেছে, স্নান করে নাও'।

খেতে বসে ফুচু আরেক বৃষ্টিদিনের গল্প বলে। ইলেভেনে পড়ার সময় একবার ফুচু তার বন্ধু মুনিয়ার সঙ্গে লুকিয়ে ছায়ানট হলে সিনেমা দেখতে গেছিল। শো ভাঙলে বাইরে বেরিয়ে দেখে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি। এদিকে সন্ধে হয় হয়। বাড়িতে বলা আছে রাধাদের বাসায় ক্লাশনোট আনতে যাচ্ছে। হলের গায়ে পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান। এক বিহারী লোক দোকানিকে জর্দা পান বানাতে বলে একমনে পান বানানো দেখছে। মুনিয়া করল কী, লোকটা পানের বাক্সের পাশে তার ভেজা ছাতাটা দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। সেটা আলগোছে তুলে নিয়ে ফুচুকে ইশারায় বলল, চলে আয়। পরে নিজের ছাতা খুঁজে না পেয়ে লোকটার মুখের চেহারা কেমন হয়েছিল ভেবে তারা দুই বন্ধু নাকি সেদিন খুব হেসেছিল। কিন্তু উপায় কী, সময়ে না ফিরলে কপালে যে বকাটা জুটতো, বলো? ছাতাটার অবশ্য মুনিয়া শেষমেশ কী গতি করেছিল, ফুচু জানে না।

ফুচুর গল্প শুনে তাজ্জব বনে যায় সুকেশ। তবে একটা বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধে তার বউ বা যে নতুন মানুষটা সংসারে আসছে, তাদের কোনও ক্ষতির আশঙ্কা আর নেই। ছাতা চুরিটা অন্তত মাথা কাটা যাবার মতো অপরাধ নয়! এখন অনেকটা হালকা লাগছে তার। জয় বজরংবলী। ■

চুমকি চট্টোপাধ্যায়

ভালো আছি, ভালো থেকো

আপনা আপনি ঘুম ভেঙে গেল সুনয়নার। চোখ খুলে দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল কটা বাজে। বুঝতে পারল না। আজকাল চশমা ছাড়া ভালো করে দেখতেই পায় না। সুনয়না এখন দুনয়না। ভাবতেই হাসি পেল ওর।

অন্যদিন বন্ধ জানলার ভেতর দিয়েও আলোর আভাস দেখা যায়। আজ তেমনটা যাচ্ছে না। তবে কি মেঘ করেছে? বিছানার একদিকটা খালি। তিন মাসের ওপর মা ছিল ওর কাছে। দাদা এসেছিল, গতকাল মাকে নিয়ে চলে গেছে ব্যাঙ্গালোরে। দাদার কাছে ছ'মাস থাকে আর সুনয়নার কাছে ছ'মাস।

ইয়ার এন্ডিং-এর কাজের চাপ সামলানোর পর দিন পনেরো ছুটি নেয় সুনয়না। মে-জুন-জুলাই মাসের কোনও এক সময়ে। সেই সময় মাকে নিয়ে আসে ও।

দিন দশেকের জন্যে নির্জন নিরিবিলি কোনও পাহাড়ি জায়গায় বেড়াতে যায় মাকে নিয়ে। চরম আলসেমি করে কাটায় দিনগুলো। মায়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকে সময়ের হিসেব না করে। চুলে বিলি কেটে দেন মা। সেই বিলির ভেতর লুকোনো কষ্ট দিব্বি টের পায় সুনয়না।

গায়ের পাতলা চাদর সরিয়ে উঠে পড়ল সুনয়না। ঘরের দুটো জানলার একটা খুলে দিতেই দেখল গাঢ় ঘন মেঘ ছেয়ে আছে আকাশে। বৃষ্টি নামবে মনে হচ্ছে। মুখার্জিবাড়ির ছাদের পেঁপে গাছটা পর্যন্ত মেঘের শামিয়ানায় সুন্দর লাগছে দেখতে। পেঁপে গাছের কি আলাদা কোনো সৌন্দর্য আছে? আজকাল হাবড়জাবড় কথা মনে আসে সুনয়নার। বয়েসের দোষ।

জোরে শ্বাস নিয়ে ধরে রেখে দুটো হাত মাথার ওপর তুলে যতটা সম্ভব টানটান করে খানিক রেখে শ্বাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাত নামিয়ে নিল সুনয়না। দু-চারবার রিপিট করল একই স্ট্রেচিং। শরীরটা বেশ ছাড়ে এতে। তারপর চুলগুলো গুটিয়ে ড্রেসিং ইউনিটের ওপরে রাখা ক্লাচার লাগিয়ে বাথরুমের দিকে গেল।

এই বাড়িতেই জন্ম সুনয়নার। বাবা চলে যাবার আগেই দাদা চাকরি নিয়ে ব্যাঙ্গালোর চলে গেছিল। বিয়ের পরে বউ নিয়ে দাদা ওখানেই সেটল করে গেছে। এই বাড়ির ওপর কোনও দাবি রাখেনি দাদা। মা যতদিন আছেন বাড়ি ওঁর, তারপর সুনয়নার—উইলে তাই আছে।

পুরনো দিনের বাড়ি বলে অ্যাটাচড বাথরুম নেই। মাঝেমাঝে সুনয়নার মনে হয় ঘর-লাগোয়া বারান্দা ঘিরে বাথরুম বানানোর কথা। কিন্তু বারান্দাটা ছোট হয়ে যাবে ভাবলে আর ইচ্ছে করে না। তখন মনে হয়, চলছে যেমন

চলুক।

অফিস যেতে মোটেই ইচ্ছে করছে না সুনয়নার। আজ আলসেমি করার দিন। এক কাপ কফি নিয়ে গল্পের বই পড়া অথবা চোখ বন্ধ করে গজল শোনার দিন। কিন্তু না, অফিস যেতেই হবে। জরুরি মিটিং আছে। বেল বাজছে, টুম্পা এসেছে। মেয়েটা প্রচুর সামলায় সুনয়নার সংসারের যাবতীয় কাজ।

এটাকে কি সংসার বলে? সংসার মানে কি কেবল রান্নাঘর, বাজার, খাওয়া, স্নান, ঘুম, লোক লৌকিকতা, জামাকাপড়, সাজগোজ...? নাকি নিটোল একটা পরিবারের দিনযাপন। সেখানে বাবা-মা-সন্তানেরা থাকবে, পরবর্তী প্রজন্ম থাকবে। তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, হতাশা, দুঃখ, ভালোলাগা, ভালোবাসা, ঠাকুরঘর—সব থাকবে। কে জানে, সংসার আসলে কী!

ওফ, আজকাল বড় বেশি আজেবাজে চিন্তা ভীড় করে মাথায়। দরজা খুলে দিয়ে বাথরুমের দিকে গেল সুনয়না।

'দিদি, গুড মর্নিং।'

হেসে ফেলে সুনয়না। টুম্পা নিয়ম করে প্রভাতী শুভেচ্ছা জানায় সুনয়নাকে। বেশ লাগে ওর মুখে গুড মর্নিং শুনতে। সুনয়নাও শুভেচ্ছা জানায় টুম্পাকে।

টুম্পা এসে যাবার পর পুরো বাড়িটাই ওর দখলে চলে যায়। সুনয়না অফিস বেরবার আগে রান্নাবান্না, ঘর পরিষ্কার থেকে জামাকাপড় মেলা অবধি সব কাজ সেরে ফেলে টুম্পা। মেয়েটা রোবোটিক স্পিডে কাজ করে। কেবল ওয়াশিং মেশিনটা চালিয়ে দেয় সুনয়না।

'দিদি, আজকে তাহলে ইলিশ মাছের মাথাটা দিয়ে কচুর শাক করছি। ইলিশ মাছটা কালোজিরে কাঁচালঙ্কা দিয়ে পাতলা ঝোল করছি। ডাল আছে। ভাজা কিছু করব?'

'না রে, ভাজা লাগবে না।' বলে বাথরুমে ঢুকে যায় সুনয়না। অফিস ফেরত প্রয়োজন মতো মাছ বা মাংস আর ফল কিনে নিয়ে আসে ও। সবজি বাজারটা টুম্পাই করে।

একেবারে স্নান সেরে বেরোয় সুনয়না। জোর বৃষ্টি নেমেছে। উফ্ ভগবান, চাকরিটা ছেড়ে দিলে হয়! আবার সেই বেকায়দা চিন্তার পোকা নাড়া দেয় সুনয়নার মাথায়।

ওয়ার্ডরোব খুলতেই হুড়মুড় করে কিছু কাপড়জামা সুনয়নার ঘাড়ে এসে পড়ে। অনেকদিন ওয়ার্ডরোব গোছানো হয়নি। নিজের ওপরেই বিরক্ত হয় সে।

এখন গোছাতে বসলে হবে না। মেঝেতে পড়া জামাকাপড় তুলে খাটের একদিকে জড়ো করে রাখে। অফিস থেকে ফিরে দেখা যাবে। আজকে পরার মতো কিছু একটা বের করে নিই।

কালো ট্রাউজারটা হাতের কাছেই পেয়ে নামিয়ে নেয় সুনয়না। দুপায়ের আঙুলে ভর দিয়ে ভেতরে হাত চালান করে সে। উঠে আসে সাদা কালো প্রিন্টেড একটা লং টপ। ধক করে ওঠে সুনয়নার বুক। কোথায় ছিল এটা?

'সুনি, তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি। প্লিজ রাগ কোরো না। জানি না অবশ্য তোমার পছন্দ হবে কি না। তবে খুব মানাবে তোমাকে একথা হলফ করে বলতে পারি।'

'জানো তো আমি এসব পছন্দ করি না অতনুদা, তাও কেন করো বলো তো? তোমার নিজের তেমন রোজগার নেই, ওই কটা টিউশনি ভরসা, এসব ফালতু খরচ কেন করো?'

আগে দেখো তোমার পছন্দ হয় কি না তারপর অন্য কথা।'এ

'পছন্দ অপছন্দের কী আছে, হাতে করে এনেছ যখন নিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু প্লিজ গিফট আনা বন্ধ করো।'

'তুমি যদি এটা পরো তাহলে আমার খুব ভালো লাগবে। অবশ্য কোয়ালিটি তত ভালো নয়, দেখো কেমন লাগে।'

'তুমি সিএ-টা কমপ্লিট করলে না কেনো বলো তো অতনুদা? সিএ করা থাকলে আজ তুমি কোথায় থাকতে! কত ভালো চাকরি পেয়ে যেতে।'

‘সে অনেক ব্যাপার, পরিবারের কথা আর কী বলব। যা হয়নি তা হয়নি।’

‘ঠিক আছে, বুঝলাম না হয় অসুবিধে ছিল। কম্পিউটারে কিছু কিছু প্রোগ্রামিং তো শিখে নিতে পারতে। এখন তো পাড়ায় পাড়ায় সাইবার ক্যাফে। তাহলেও চাকরি পেয়ে যেতে। তাও তো করলে না। তুমি মনে হয় অলস।’

চুপ করে থাকে অতনু। ওর বাড়ির সমস্যা বোঝা সুনয়নার পক্ষে সম্ভব নয়। বাবা–মা দুজনেই বিছানায়। তাদের দেখভালো করতে সারা সকাল কেটে যায়। বিকেলে দিদি এলে তবেই ও পড়াতে বেরতে পারে। তাও আবার দশটার ভেতর বাড়ি ঢুকতে হয়, কারণ দিদি ফিরবে।

দিদি এটুকু দয়া করছে বলে সামান্য চারটে টিউশনি করতে পারছে। এ বাদে দু–ঘর ভাড়াটে যা আছে। কোনওমতে টেনেটুনে চলে যাচ্ছে দিন। বাবা মা–র ওষুধের খরচ দুই মামা ভাগ করে দেন। নাহলে কী হতো, বলা মুশকিল।

সুনয়নার দাদা নির্মাল্যর সঙ্গে স্কুলে পড়ত অতনু। সেই সূত্রে আসা যাওয়া ছিল ওদের বাড়িতে। স্কুল পেরনোর পর নির্মাল্য ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চলে যায় আর অতনু কমার্স নিয়ে কলেজে ঢোকে। সেই থেকে দুই বন্ধুর পথ আলাদা হয়ে যায়। তবে মাঝেমধ্যেই নির্মাল্যদের বাড়ি আসত অতনু। আসত সুনয়নার টানে। বড্ড ভালো লাগে মেয়েটাকে।

অতনু জানে, ও কোনওভাবেই সুনয়নার যোগ্য নয়। তবু ভালোবাসতে তো অসুবিধে নেই। ভালোবাসলেই কাছে পেতে হবে এমন কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। অতনু তেমনই ভালোবাসে সুনয়নাকে।

সুনয়নাও বোঝে, অনুভব করে অতনুর গভীর ভালোবাসা। কিন্তু বড় উচ্চাকাঙ্খী মেয়ে সে। এমবিএ পড়ছে উঁচু দরের চাকরির স্বপ্ন চোখে নিয়ে। দেশ–বিদেশ ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছের চারা সুপ্ত আছে মনের গভীরে। তাই ভালোবাসাবাসি এই মুহূর্তে গুরুত্বহীন তার কাছে।

উপহার দেওয়ার দিন দশেকের মধ্যে সুনয়না অতনুর মৃত্যুর খবর পায়। রাস্তা পেরোতে গিয়ে লরির ধাক্কায় শেষ হয়ে গেছিল অতনু। চেনা মানুষ চলে গেলে যে কষ্ট হয়, সেই কষ্ট পেয়েছিল সুনয়না। নির্মাল্যকে জানিয়েছিল খবরটা। নির্মাল্য বলেছিল, ‘এবার কলকাতা গেলে ওদের বাড়ি গিয়ে দেখা করে আসব।’ সে আর হয়ে ওঠেনি।

এমবিএ পাশ করে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউতেই চাকরি পেয়ে গেছিল সুনয়না। তারপর চাকরি পালটে পালটে এখন রীতিমতো লাখের ঘরে মাইনে পায় সে। ইচ্ছে করলে অভিজাত এলাকায় দামি ফ্ল্যাট কিনে চলে যেতে পারে। কিন্তু এই বাড়ি ওকে টেনে রেখে দিয়েছে, আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। তাছাড়া মা এই বাড়ি ছাড়া আর কোথাও থাকবে না বলেই দিয়েছে। দাদার কাছেই যেতে চায় না। দাদা প্রায় জোর করেই নিয়ে যায়।

সম্বন্ধ প্রচুর এসেছে সুনয়নার। ওর মা অনেক বুঝিয়েছেন, ‘দেখ, তোর বাবা তো চলেই গেছেন, আমিও চিরকাল থাকব না। তখন তো তুই একা! খুব কষ্ট হবে। তার থেকে ভালো ছেলে দেখে বিয়ে কর। আমিও থাকলাম, দাদাও থাকল, আবার তোর নিজের একটা সংসার হল। শ্বশুরবাড়িতে যদি নাও থাকিস, বরের সঙ্গে আলাদা থাকবি। তাহলেও তো একজন সঙ্গী থাকবে তোর। ভেবে দেখিস। সল্টলেকের ওই ডাক্তার ছেলেটাকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। কথা বলে দেখ না, ভালো লাগলে তবেই এগোবি।’

‘তোমার পছন্দ হয়েছে যখন তখন তুমি বিয়ে করো। তাছাড়া আমার বর যে আগে মরে যাবে না তার কোনও গ্যারান্টি আছে? সে তো এক্সট্রা শোক হবে। তাই না?’

এরপর আর কোনও কথা চলে না। চুপ করে যান সুনয়নার মা। বেশ কিছুক্ষণ পর বলেন, ‘তোর চিন্তায় শান্তিতে মরতেও পারব না।’ মায়ের এই কথার পৃষ্ঠে সুনয়না বলে, ‘চলো মা, এবার সুইজারল্যান্ড যাই। ওহ্, পাগলা হয়ে যাবে গেলে। ব্যবস্থা করছি।’

টপটা হাতে নিয়ে অতীতে হারিয়ে গেছিল সুনয়না। ‘দিদি’ ডাকে চটকা ভাঙতেই দেখে ঘড়িতে ন’টা পনেরো। টুম্পা খেতে ডাকছে। দ্রুত টপটা গলিয়ে ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসে সুনয়না।

ইলিশের মাথা দিয়ে কচুর শাক তুলে দিয়ে বলে, ‘এটা রেখে দে টুম্পা, রাত্তিরে খাব। এখন টাইম নেই।’

আজ আর সাজতে ইচ্ছে করল না সুনয়নার। অন্যদিন হালকা ফাউন্ডেশন লাগিয়ে কম্প্যাক্ট বোলায়, চোখে আই লাইনার লাগায়, লিপস্টিক তো মাস্ট। আজ মনে হল, কী হবে সেজে, কাউকে কিছু দেখাবার নেই, কাউকে আকর্ষণ করারও নেই। তাহলে? চুলটা বেঁধে মুখে পাউডার পাফ বুলিয়ে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে অফিস রওনা দেবে। টুম্পারও আপাতত কাজ শেষ।

গাড়ি চালাতে চালাতে রাজ্যের হাবিজাবি চিন্তা ভীড় জমালো মাথায়। আচ্ছা, অতনুদাকে বিয়ে করলে কী অসুবিধে হতো? অতনুদার রোজগার কম থাকলেও নিজে তো ভালো রোজগার করত। সেই রোজগারে সংসার ভালোভাবেই চলত। কেবল পুরুষমানুষেরই দায় সংসার টানার এমনটা ভাবার তো কোনও কারণ নেই। অতনুদা যদি বুঝত যে, সুনয়নাও তাকে ভালোবাসে, তাহলে হয়তো বাঁচার মানে খুঁজে পেত। অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তা পার হতো না।

টপটার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে সুনয়না বলতে থাকে, ‘আমাকে ক্ষমা করে দিও অতনুদা। আমি আজও তোমাকে ভালোবাসি। তার জন্যেই বিয়ে করিনি। তুমি আমার ভালো থাকা নিয়ে ভাবতে। আমি ভালো আছি, তুমিও ভালো থেকো অতনুদা। ■

প্রথম আলো-কে

শুভেচ্ছা

একজন

শুভানুধ্যায়ী

দেবযানী বসু কুমার

রামকৃষ্ণদা ভার্সেস বোবো

বোবো আমার অসমবয়সী বন্ধু বলা যেতে পারে। বয়সের আকাশ–পাতাল তফাৎ, কিন্তু তাও আমরা বন্ধু। বোবো লেখিকা, বিন্দাস আছে। এ মুলুক ও মুলুক ঘুরে বেড়ায়। কোথাও না যেতে পারলে বালি, বেলুড়, লিলুয়া, ধবধবি, বনগাঁ এসব জায়গায় ঘুরতে যায়। টাকা–পয়সা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতে হয় না। ওর মা বিরাট চাকরি করেন। আমি বেশ ভয় পাই ওর মাকে। খুব গুরু–গম্ভীর মানুষ। প্রয়োজন ছাড়া আমি ওঁর থেকে একটু দূরে দূরেই থাকি। আমার বন্ধুর মায়ের কথা কেন এতো বললাম, বোঝা যাবে গল্প যত এগোবে।

বোবোদের বাড়িতে রামকৃষ্ণদা বলে একজন থাকেন। বোবোর দাদুর আমলের লোক। ওঁর ওপরে বিশেষ কেউ কথা বলে না। বোবোর কথা অনুযায়ী, রামকৃষ্ণদা বাড়ির সর্বেসর্বা ওর মায়ের প্রশ্রয়ে। রামকৃষ্ণদাকে ইংরিজিতে বলতে গেলে বলতে হয়, বাড়ির কেয়ারটেকার আর বাংলায় সরকার মশাই। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবদিকে তীক্ষ্ণ নজর। পান থেকে চুন খসবার উপায় নেই ওঁর নজরদারিতে।

কয়েকবছর আগের কথা। বোবোদের টালিগঞ্জে তিনতলা বাড়ি। তখন বোবো শখ করে চাকরি করতে গিয়েছিলো দিল্লিতে। বোবোর দিদা থাকেন তিনতলায় আর বোবোর নিজের ঘর দোতলায়। বোবোর মা সব তলাতেই থাকেন সুবিধে মতো। রামকৃষ্ণদা থাকেন একতলায়, কিন্তু সারা বাড়িতেই ওঁর অবারিত যাতায়াত। বোবো যখন বাইরে, সেই সময় ওর দিদা অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিছুটা সুস্থ হতে বোবোর মা কাজে জয়েন করেন। গুরুত্বপূর্ণ পদ। বেশি ছুটি নিতেও পারেন না। বোবোর মা কাজে বেরোবার আগে রামকৃষ্ণদাকে প্রতিদিন বলে যান— যদি কেউ মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে, তুমি দুপুর বারোটা থেকে বিকেল পাঁচটা অবধি তাকে মায়ের ঘরে যেতে দিওনা। ডাক্তার বলেছেন, ওই সময় মা বিশ্রাম করবেন। রামকৃষ্ণদা একবার শুনে নিয়েছেন। সেই কথা আর নড়চড় হওয়ার উপায় নেই। এরকম বহু লোক ওঁকে দেখতে এসে ফিরে গেছে। ফোন করে বোবোর মাকে নালিশ জানিয়েছে। বোবোর মা ঢোক গিলে বলেছেন— আসলে ডাক্তারের কড়া হুকুম। ওই সময়টা মাকে ঘুমোতে হবে। বাড়ি ফিরে রামকৃষ্ণদাকে বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত কিছু বলে উঠতে পারেননি। ইতিমধ্যে দিল্লিতে বসে বোবোর মন অস্থির করছে দিদার জন্য। কাউকে কিছু না জানিয়ে টিকিট কেটে একদিন প্লেনে উঠে বসেছে। কলকাতায় নেমে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা বাড়ি। চমকে দেবে বলে বোবো ওর মাকেও কিছু জানায়নি।

তখন দুপুর সাড়ে বারোটা। কলিং বেল টিপতে রামকৃষ্ণদা দরজা খুলে দিয়ে বলেন— এখন তো তোমাকে বিকেল পাঁচটা অবধি একতলার বসার ঘরে অপেক্ষা করতে হবে। মা এখন ঘুমোচ্ছেন। তোমার মায়ের বারণ আছে। এখন কাউকে ওপরে উঠতে দেওয়া যাবে না। বোবো বলে— রামকৃষ্ণদা, আমি দিল্লি থেকে এসেছি আইকে অর্থাৎ দিদাকে দেখতে। আমার স্নান খাওয়া কিচ্ছু হয়নি। শান্ত মুখে রামকৃষ্ণদা জানান— আমার হাত-পা বাঁধা। আমি চাবি খুলতে পারবো না। তুমি তোমার মাকে ফোন করো। উনি বললে আমি নিশ্চয়ই সিঁড়ির দরজা খুলে দেব। বহুবার চেষ্টা করেও সেদিন বোবো ওর মাকে ফোনে ধরতে পারে না। কারণ পর পর মিটিং নিয়ে সেদিন তিনি ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। দুপুর দুটো নাগাদ আর একবার বোবো বলেছিল— রামকৃষ্ণদা, গ্রিলের দরজাটা খুলে দাও। আমি অন্তত আমার ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিই। উত্তরে তিনি বলেছিলেন— না, আমি তোমাকে ভালো মতো চিনি। চাবি খুলে দিলে তুমি ঠিক তিনতলায় গিয়ে মায়ের ঘুম ভাঙিয়ে মাকে বিরক্ত করবে। বোবো আমাকে বলেছিল— আর কথা না বাড়িয়ে আমি ধ্যানে বসলাম মনটাকে সংযত করতে। না হলে এর পরেই আমার রাগ গুলো ছিটকে ছিটকে বেরোতো। মাঝখানে বলি, এ হেনো রামকৃষ্ণদা কিন্তু বোবোকে জন্ম থেকে দেখছেন। মায়ের অফিস থেকে ফিরতে বোবো নালিশ জানালে বোবোর মায়ের উত্তর— তুমি তো বলে এলেই পারতে। তাহলে এতো ঝামেলা হতো না। রামকৃষ্ণদার তো কোনও দোষ নেই। আমি ওঁকে বারণ করেছি।

প্রচণ্ড গরম সেদিন। বাইরে যেন গরম হলকা বইছে। রাস্তাঘাটে গাড়ি কম। কুকুর, বেড়ালও ছায়াতে শুয়ে আছে। তাপমাত্রা তেতাল্লিশ ডিগ্রি দেখাচ্ছে, কিন্তু অনুভবে বাহান্ন। আমি আর বোবো বসে ওদের বসার ঘরে গল্প করছি। এয়ার কন্ডিশন মেশিন চলছে আঠারোয়। জানলায় মোটা পর্দা টানা। ঘরের মধ্যে আলোছায়া খেলা করছে। দু'জনের সামনে বেশি করে বরফ দেওয়া ভার্জিন মোহিতোর গ্লাস। আমরা দু'জনে গল্পে এতো মত্ত যে, কখন রামকৃষ্ণদা ঘরে এসেছেন কেউ খেয়াল করিনি। এসি মেশিনের সুইচ বন্ধ করে দিতে খেয়াল হয়েছে। কারোর দিকে না তাকিয়ে তখন রামকৃষ্ণদা বলছেন—এ মাসে কত ইলেকট্রিক বিল উঠেছে সেটা কি জানো? বারান্দায় বসে বরং গল্প করো। লেকের দিক থেকে ফুরফুরে হওয়া দিচ্ছে। তারপর বোবোকে বললেন— এতো বরফ দিয়ে সরবত বানিয়েছো? কাল গলা ব্যথা হলে কী হবে? কথা শেষ করে গম্ভীরভাবে বোবোর গ্লাসটা নিয়ে নিচে চলে গেলেন। বোবো ভ্যাবলার মতো আমার দিকে তাকালো। আর বোবোর মা অফিস থেকে ফিরে সব শুনে বললেন—রামকৃষ্ণদা একদম ঠিক কাজ করেছেন।

সেদিন মোহরদের বাড়িতে পার্টি। বোবো আর বোবোর মা নিমন্ত্রিত। আমিও উপস্থিত। চেনাজানা আরও অনেকেই এসেছে। মোহরের মা মধ্যমণি। এযারা দুইবোন এসেছে ওর মায়ের সঙ্গে। দারুণ চীনা খাবার এসেছে চাংওয়া রেস্তোরাঁ থেকে। কারোরই বাড়ি যাওয়ার দিকে মন নেই। তখন রাত প্রায় এগারোটা। মোহরের মা বললেন— সবাই আজ রাতটা থেকে যাও। সারারাত গল্প করা যাবে। খুশিতে সবাই লাফিয়ে উঠলাম। বোবোর মা ভয় মাখানো দুঃখ-দুঃখ মুখ করে রামকৃষ্ণদাকে ফোন করলেন। তৎক্ষণাৎ নাকচ হয়ে গেলো। রামকৃষ্ণদা বললেন—সেটা বিকেলেই বলে গেলে পারতে। আমি এতক্ষণ জেগে রইলাম। তোমরা থাকবে না জানলে বিকেলে পাম্প চালাতাম না। সদর দরজার আলোটা সেই বিকেল থেকে জ্বালা রয়েছে। কত কারেন্ট পুড়লো কারোর খেয়াল আছে? এমন কিছু রাত হয়নি। সবে রাত সাড়ে এগারোটা। অনেকদিন তোমরা এর চেয়েও দেরিতে বাড়ি ফেরো। একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এসো। সবার সব খুশিতে জল ঢেলে দিয়ে বোবোর মা বোবোকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমরাও পার্টি ভঙ্গ করে যে যার বাড়ি ফিরে গেলাম।

এবার সবচেয়ে মোক্ষম ঘটনা। বোবোর জন্মদিন সেপ্টেম্বর মাসের বারো তারিখ। প্রতিবছর ওর মা বড় করে মেয়ের জন্মদিন পালন করেন। প্রতিবার আমরা নিমন্ত্রিত থাকি হয় হোটেলে নয়তো কোনো নামি ক্লাবে। সেবার ঠিক হয়েছে ওদের বাড়িতেই হবে জন্মদিনের পার্টি। বোবোর মা আমাদের নিজে রান্না করে খাওয়াবেন। আমরা খুশি অন্য কারণে। অনেকক্ষণ আড্ডা দেওয়া যাবে। সন্ধেয় সবাই হাজির বোবোর বাড়িতে। বোবোর মা সেজেগুজে হাসিমুখে সবাইকে আপ্যায়ন করছেন। বোবো এটা পুরোনো জিন্স আর কালো টি-শার্ট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুখটা যেনো রাম গরুড়ের ছানা, হাসতে তাদের মানা। কিছু বলতে গেলেই ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে সরে যাচ্ছে। আমরা সবাই ভাবছি—কী আবার হল? পার্টি কিছুতেই জমছে না। রাতে খেতে বসে বোবো রাগের চোটে ফেটে চৌচির। তখন জানা গেলো পুরো ঘটনা—বোবোর মা ঠিক করেছিলেন রাতে মেনুতে থাকবে বাগদা চিংড়ির মালাইকারি, হাঁসের ডিমের ডালনা আর চিকেন কষা। সেই মতো লিস্ট করে দিয়েছেন রামকৃষ্ণদাকে। বাকি যা লাগবে বোবো আনবে। বোবো সকাল থেকে সব বাজার করেছে। নারকেল, নারকেলের দুধ, ফ্রেশ ক্রিম, কাজু, কিসমিস, আলমণ্ড পাউডার ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপরে ফিরেছেন রামকৃষ্ণদা। শুধু এনেছেন মুরগি, আর কাঁচা সবজি। মা-মেয়ে তখন দুজনেই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে— কোথায় চিংড়ি? কোথায় হাঁসের ডিম? ঠান্ডা গলায় রামকৃষ্ণদা বলেছেন— আনিনি তো? চিংড়ির খুব দাম। দাম কমলে তারপর খেও। আর হাঁসের ডিম না খাওয়াই ভালো, দোকানদার বললো। হাই প্রোটিন। আর দামও অনেক বেশি। বললে, আমি পোল্ট্রির ডিম এনে দেবো। আজ বরং চিকেন দিয়ে কাজ চালিয়ে নাও। এই অবধি তাও ঠিক ছিল। এরপর বোবোর মা মেয়েকে বলেছিলেন—রামকৃষ্ণদা কত ভাবে আমাদের কথা বল? ঠিকই তো বলেছেন, দাম কমলে চিংড়ি খাওয়া হবে।

বোবোর বক্তব্য—আমার মা এমন একজন হোমরাচোমরা, গুরুগম্ভীর মহিলা, যাকে সবাই ভয় পায়। তিনি কেন রামকৃষ্ণদার সব 'হ্যাঁ'-তে 'হ্যাঁ' মেলায় আমি বুঝতে পারি না। ■

প্রথম আলো-কে শুভেচ্ছা

একজন শুভানুধ্যায়ী

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

বসন্ত এসে গেছে

বসন্ত নেমেছিল চিত্রকূট পাহাড়ের গা বেয়ে। নীচ দিয়ে তিরতির করে বয়ে চলেছিল একচিলতে খরস্রোতা নদী। বসন্ত পা ডুবিয়েছিল সেই নদীর ঠান্ডা জলে। পাহাড় থেকে ঝর্ণা তিরতির করে ঝরে পড়েছিল নদীর বুকে। বসন্ত চেটেপুটে ঝর্ণার আস্বাদ নিল। ঝর্ণা তাঁকে দিল উজাড় করে। কখনো জলের ভেতরে, কখনো জলের বাইরে। কখনও গিরি কন্দরে কখনও খোলা আকাশের নীচে, নীল নির্জনে। হালকা ঠান্ডার ছোঁয়ায়, রূপোলী জ্যোৎস্নায় আর ভোরের কচি আলোয় ঝর্ণার স্নান তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছিল বসন্ত। তার সুঠাম পৌরুষ আর শাণিত তরবারির মত দাপুটে মেজাজ উড়িয়ে নিয়ে গেছে উদ্ভিন্নযৌবনা পাগলপারা ঝর্ণাকে। মাতাল বসন্তের উদ্দামতার সাক্ষী ছিল পাহাড়ের আগুন, পলাশের বৃষ্টি। কিন্তু প্রেম টিকলো না বসন্ত আর ঝর্ণার। ঝর্ণা লুকিয়ে পড়ল পাহাড়ের অজানা খাদে। মুখ লুকোল গিরিগুহায়, কিছুটা লজ্জায়। বসন্ত পাড়ি দিল অন্যত্র।

ঝর্ণা আরেক পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলতে চলতে থমকে গেল। ঝিমঝিম করছিল তার মাথা, বমিবমি পাচ্ছিল। বন্ধ হল বুঝি তার ঝরা। সে একটু বসে, আবার চলে। সে বুঝল বসন্ত তাকে দুয়ে নিয়েছে। এবার পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেতেই ঝর্ণার মাথা গেল ঘুরে। ঝর্ণা গর্ভবতী। বসন্তের বীজ তার শরীরে। কিন্তু বসন্ত পালিয়েছে তাকে ছেড়ে। পাহাড়ে ধাক্কা খেয়েই সে বইতে লাগল আগের মতো। গম্ভীর পাহাড় পিতৃস্নেহে ঝর্ণাকে আশ্রয় দিল তার গহ্বরে। প্রথম মাতৃত্বের স্বাদ, অবাঞ্ছিত হলেও আরামের। ঝর্ণা মনে মনে আপ্লুত, আবার অভিমানে ক্ষুব্ধ।

পাহাড় তাকে বলল, দেখো, একদিন ঠিক আবার এই পাহাড়েই বসন্ত আসবে তোমার কাছে।

যথাসময়ে ঝর্ণা দুই যমজ ছেলেমেয়ে প্রসব করল। নাম রাখল পলাশ ও অশোকা।

পাহাড় খুঁজে চলে ওদের বাবাকে। শিশুরা জানেওনা বাবা কেমন হয়, বাবা কোথায় থাকে। ঝর্ণা চলে আপনমনে।

হঠাৎ একদিন বসন্ত এল সেই পাহাড়ে। খেলতে খেলতে আলাপ হল ফুটফুটে অশোকা আর পলাশের সঙ্গে।

মায়ের নাম জিজ্ঞেস করায় ওরা বলল, মায়ের নাম বলতে নেই। বসন্ত বলল, আমাকে নিয়ে যাবে তার কাছে? ওরা বলল, মা তো ঘরে থাকেইনা। তুমি কে, আগে বলো।

বসন্ত বলল, ঠিক আছে, কাল দোলের দিন আমরা একসঙ্গে রং খেলব। তোমাদের মাকে থাকতে বোলো।

সেদিন ভোর থেকেই দোলের রং লাগল সেই পাহাড়ের গায়ে, কোলে, মাথায়। বসন্ত তার ঝর্ণাকে খুঁজে পাবে...। বসন্তকে দূর থেকে দেখেই ঝর্ণা লুকিয়ে পড়ল গুহার মধ্যে।

তার জীবন বইতে লাগল আপন খাতে।

আশোকা–পলাশ চিৎকার করে বলতে লাগল, মা, বসন্ত এসে গেছে। তাদের কথাগুলো প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরতে লাগল পাহাড় থেকে পাহাড়ে।

বোধিসত্ত্ব রায়

হারুন আল রসিদের আয়নামহল

ঝিনুকবাড়ি এক চিলতে পুরাতন গ্রাম। গ্রাম না বলে ছোট দ্বীপ বলা ভাল। পুবে সয়না নদী। কাচ কাচ জল। পশ্চিমে বিদ্যেধরী। কতশত বছর আগে বিদ্যেধরীর বুকে এ চরজমিন জেগেছিল সেকথা এ গাঁয়ের বিষ্ণু খুড়োও বলতে পারে না। তবে হারুন জামিলার কাছে গরগাছালিতে শুনেছে, তখন বাংলায় আফগানি আমল। সেসময় বারো রাজার এক রাজা ছিল প্রতাপাদিত্য। তেনার পুত্র ছিল উদয়াদিত্য। এই উদয়াদিত্যের দেওয়ান ছিল দুর্লভ বৈরাগ্য। তিনি একবার এই বাদাবনের দেশ পেরিয়ে তীর্থে যাচ্ছিলেন। সেসময় এদেশ তার মনে লেগে যায়। পরে আকবরের সেনাপতি মানসিংহ যশোর খুলনা আক্রমণ করলে ধলভূম ঘাটে ভয়ানক যুদ্ধ লাগে। সেই যুদ্ধে দুর্লভবাবু খুব কৃতিত্ব দেখান। তারপর উদয়াদিত্য বাদাবনের সাতাশটা গাঁয়ের প্রজাবিলি দেন দুর্লভবাবুকে। তেনারা থাকতেন সয়না নদীর ওপারে আরশিগ্রামে। সেখানে এখনও তাদের পুরামো রাজবাড়ি আছে। এদেশ সেদেশ থেকে লোকে দেখতে আসে।

অনেক বছর পরে বৈরাগ্যবাবুরা কর্নওয়ালিশ সাহেবের কাছ থেকে নিজেদের সম্পত্তি খাজনা মূল্যে ফের কিনে নেন। রায় রায়ান হন। সয়না নদীর এপারের নতুন চরে হাওয়ামহল গড়েন। নাম দেন ঝিনুকবাড়ি। সেকালে সয়না আর বিদ্যেধরীর সঙ্গমে নাকি খুব ঝিনুক পাওয়া যেত। ঝিনুকের মধ্যে মুক্তো উঠত। নতুন বসতির বিলি ব্যবস্থা করেন। বামুন, তেলি, কামার, কুমোর, নমঃশূদ্র, বাগদি আর ক'ঘর মুসলমান নতুন চরে ঘর-গেরস্থালি বসায়।

হারুন সেই ফজরের নামাজ শেষ হতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে সয়নার পারে চলে এসেছিল। তখনও জামিনা ঘুমাচ্ছে। আজ শনিবার। মঙ্গলে,শনিতে আরশি গ্রামে হাট বসে। দু'নদীর এপারে ওপারে কাছেপিঠে এই একটাই হাট। হারুন শাক-লতা, ফল-পাকুড় যা যেমন পায় হাটে নিয়ে যায়। কোনওদিন দোয়াড়ে মাছ বাড়-বাড়ন্ত হলে তাও হাটে নিয়ে বসে। অল্প মাছ হলে সে বাড়ি নিয়ে আসে। আমিলা মাছ ছাড়া খেতে চায় না।

আজ দোয়াড়ে কটা পুঁটি আর কই খলবলাচ্ছে। এ আর হাটে নিয়ে যাওয়ার নয়। হারুন লম্বা শ্বাস নিয়ে কুঁচলতা আর পানকলসের বনে খেবলে বসল। শেওড়া গাছে জড়িয়ে থাকা একটা জার্মানলতা টান দিয়ে ছিঁড়ল। তাতে প্যাঁচ দিয়ে একটা মুকুট গড়ল। কপালে ছড়িয়ে আসা লম্বা চুল গুলো সরিয়ে লতার মুকুটটা মাথায় পরলো। হাতের পাশে রাখা বাখারিটা তরোয়ালের মতো করে বাগিয়ে ধরে উঠে দাঁড়াল। গভীর গলায় বলল, আমি বোগদাদের খলিফা হারুন আল রসিদ। দোস্ত জাফর ইবনে ইয়াহিয়া, কী দেখে এলে? আমার প্রজারা সব

কুশলে আছে তো! কেউ সাড়া দিল না। সয়নার নদীর জলের ভিরভিরামি ছুঁয়ে থাকা বেড়াচিতের ডাল ছেড়ে উড়ে গেল মাছরাঙা। আর তখনই পিছন থেকে খিলখিল করে হাসির শব্দ ভেসে এল।

হারুন পিছনে তাকিয়ে দেখল মারুফা দাঁড়িয়ে। সে মুচকি হেসে বলল, তুমি কখন এলে! আমি টেরই পাইনি। মারুফা হেসে বলল, চুড়োটি বেঁধেছ কালা ময়ূরপঙ্খী দিয়া / নানা জাতের ফুলের মালা রহিয়াছে হেলিয়া...।' তুমি কোনও কালেই কিছু টের পাওনি খ্যাপা! জলে-কাদায় নামার আগে পায়ে সর্ষের তেল দিয়েছিলে? নইলে কিন্তু পাকুই লাগবে! হারুন হেসে বলল, ভুলে গেছিলাম গো! মারুফা কপট রাগের ভঙ্গী করে বলল, ভুলে যাওয়া তোমার সখ! তা বোগদাদের খলিফাকে রাজকন্যে জামিলা খুঁজে হয়রান। শাক তোলা হলে বাড়ি যাও। তুমি বাড়ি গেলে সে বসিরহাটে যাবে।

শুনে হারুন শাকের ঝুড়ি আর দোয়াড়টা দু'হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তায় উঠে এল। একগাল হেসে বলল, কলমি আর কুলেখাড়া শাক নিয়েছি। ঘরে চারটে মোচা কাল সন্ধের কাটা। আজকে হাটে এই নিয়েই যাব। তা তুমি কোন ঠাই যাচ্ছ এত সকালে? মারুফা বলল, সন্ধেয় বারাসাতে শো আছে। হারুন খানিক থমকে থেকে বলল, সে তো অনেক দূর। ফিরতে তো রাতভোর হয়ে যাবে, নাকি? অত রাতে তো ফেরি বন্ধ হয়ে যাবে। মারুফা সেকথার উত্তর না দিয়ে বলল, কাল বাদে পরশু ফিরব। তুমি পা চালিয়ে বাড়ি যাও। মেয়েটা তোমার পথ চেয়ে আছে।

মারুফা ফেরি ঘাটের দিকে চলে গেল। হিজল পাতার আড়ালে কুরো পাখিটা একঘেয়ে একটানা ডেকে যাচ্ছিল। তেলিপাড়ার বলাই গরু নিয়ে মাঠে যাচ্ছিল। সে হারুনের সঙ্গে প্রাইমারি স্কুলে পড়ত। হারুনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, এই হারু, ওখানে ফেকলুর মতো দাঁড়িয়ে কী করছিস? হারুন মারুফার চলে যাওয়া পথের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে আনমনে বলল, সবাই ব্যস্ত। সবাই কোথাও না কোথাও যায়। আমার তো কোথাও যাওয়ার নেই।

হারুনের ঘর বলতে ছিল মাটির দেওয়াল গড়ে ছাওয়া দোচালা। আয়লার সময় বিদ্যেধরী আর সয়নার জল এক হয়ে ভাসিয়ে দিয়েছিল ঝিনুকবাড়ির ঘরবসত। জল সরলে সাইক্লোন সেন্টার থেকে গাঁয়ে ফিরে চেনা ঘরগাছালি সব বেবাক অচেনা লেগেছিল হারুনের। হেলা পুঁইমাচা আর উপড়ে যাওয়া কাঁঠাল গাছের মাঝে দাঁড়িয়ে তার কান্না পেয়েছিল। জামিলা জল কাদা পেরিয়ে হারুনের কাছে এসেছিল। কাঁধে মাথা রেখে বলেছিল, আব্বা, সব আবার আগের মতো হয়ে যাবে। দেখো না আমি কটা বেশি টিউশন নেব। জানো তো, বসিরহাটে পড়ালে পয়সা বেশি দেয়। হারুন জামিলার দিকে তাকিয়ে বাষ্পরুদ্ধ গলায় বলেছিল, তোর মায় আকাশ থেকে সব দেখে। আর আমায় শাপশাপান্ত দেয়!

জামিলাই মেম্বারের সঙ্গে কথা বলে আর পঞ্চায়েতে ছুটোছুটি করে আয়লার ক্ষতি পূরণের টাকা জোগাড় করেছিল। নইলে ঘর গেরস্থালি তো গাঁয়ে কারুরই টিকে ছিল না। টাকা সবার জোটেনি। সেই টাকায় এখন হারুনের এক কামরার টিনে ছাওয়া পাকা ঘরবসত। জামিলা দরখাস্ত করে ইলেকট্রিক আলো এনেছে। গেলবার রথের মেলা থেকে বাপে-ঝিয়ে ক'খান সুপারির চারা কিনেছিল। জামিলা সখ করে সেগুলো বাসক গাছের বেড়ার পাশ দিয়ে সারি সারি বসিয়েছে। বড় হলে দেখতেও ভাল লাগবে। সুপারি হলে বিক্রি করে পয়সাও হবে।

মারুফার ছাগি ছা দিলে হারুন একটা চেয়ে এনেছিল। ধলা রঙের। জামিলা তার নাম দিয়েছিল সুখিয়া। সে এখন বেশ বড় হয়েছে। মারুফা বলেছে, এ বছর পাল থাইয়ে আনলে সুখিয়ার ছানাপোনা হবে। তখন জামিলা রোজ ভাতের পাতে দুধ খেতে পারবে।

শনি আর বুধে সত্যিই জামিলার দম ফেলার ফুসরত নেই। বসিরহাটে কোচিং ক্লাসে পড়তে যায়। চাকরির পড়া। ক্লাসের পরে সে ভ্যাবলায় এক বাড়িতে ব্যাচ করে টিউশন পড়ায়। করোনার সময় অনলাইনে পড়াড। এখন

সে ব্যবস্থা নেই। গিয়ে পড়ানো লাগে।

হারুন বাড়ি ঢুকে উঠোনে শাকের ঝুড়ি আর দোয়াড়টা নামিয়ে রাখল। তারপর 'মা, কোথায় তুমি' বলে ডাক দিল। জামিলা চুলে চিরুনি দিতে দিতে দাওয়ায় বেরিয়ে এল। ব্যস্ত গলায় বলল আব্বা, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। আর শোনো, কলকাতা থেকে আজ পরিচিত একজন আসবেন। খবরের কাগজের লোক। শুকদেব জ্যাঠার আয়নামহল দেখতে যাবেন। সঙ্গে করে নিয়ে যেও।

হারুন বলল, তা আমি তেনাদের চিনব কী করে? জামিলা ফিক করে হেসে বলল, ও তুমি দেখলেই চিনবে। ফরসা মতো। লম্বা করে। তোমার মতো লম্বা চুল দাড়ি। হারুন বলল, তাহলে ফেরিঘাটে গিয়ে বসি? জামিলা ঘরের থেকে পিঠে ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে এল। বলল, স্নান করে মুড়ি-জল খেয়ে যেও। আমি তোমায় ফোন করে দেব। তা ফোন কোথায় তোমার? হারুন একগাল হেসে বলল, তা কে জানে! জামিলা ভুরু কুঁচকে বলল, 'তা কে জানে' বললে চলছে না। খুঁজে নিয়ে চার্জে দাও। পাঞ্জাবির ঝুল পকেটে রাখবে। আর আমি ফোন করলে দু'বার রিং হলেই ধরা চাই! হারুন ঘাড় কাত করে সায় দিল। বলল, আমারে তো তুমি ছাড়া কেউ ফোন করে না। তা তুমি সন্ধের আগে ফিরে আসবা মা।

জামিলা জুতো পরে দ্রুত উঠোনে নেমে এল। সুখিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। কাঁঠালের ডালটা টেনে আর খানিক কাছে এগিয়ে দিল। তার পর বলল, সে বলা যাচ্ছে না। হারুন বলল, তা তোমার বন্ধু গাঁয়ে আসবেন। তুমি না থাকলে চলে? একটা হাঁস কুঁকড়ো জবাই দিয়ে আনি। দুপুরে ভাত জলের ব্যবস্থা করতে হবে তো! জামিলা বলল, আব্বা উনি কাজে আসবেন। শুকদেব কাকা বাকসিদ্ধ হয়েছেন। তাই ইন্টারভিউ নেবেন। আয়নামহলের ছবি তুলবেন। তুমি থাকলেই হবে।

এখন বিদ্যেধরীর ফেরিঘাটে একের পিঠে এক দোকান। সকালে বিলান মাছ আর সবজির বাজারও বসে। দরগাতলার বশির ক'মাস হল শাড়ি কাপড়ের পাকা দোকান দিয়েছে। সেটা একেবারে গাঙের ধার ঘেঁষে কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়। ক'বছর আগেও দোকান বাজার এত গমগমে ছিল না। ছিল বলতে শিশুগাছের ছায়ায় বগা নাপিতের সেলুন। নড়বড়ে চেয়ার। গাছে পেরেক ঠুকে ঝুলানো সাহেব আমলের ঘষটা কাচের আয়না। গোঁফ দাড়ি কাটালে সম্ভার ক্রিমে বাবুয়ানা। আর ফটকিরিতে শুদ্ধি। সঙ্গে রেডিওতে ফ্রি খুলনা বেতারের গান-বাজনা। গাঙ পেরিয়ে কুটুম বাড়ি যাওয়ার আগে ঝিনুকবাড়ির লোকেদের এখানে ক্ষৌরী হওয়া দস্তুর। আর ছিল নব গোঁসাইয়ের চায়ের দোকান। বিকালে গোঁসাইয়ের বউ চপ ফুলুরিও ভাজতো। করোনায় পেয়েছিল গোঁসাইকে।

বদরতলা সদর হাসপাতালে ভর্তি ছিল। ফেরেনি। গোঁসাইয়ের বউ রাধামণি এখন দোকান চালায়। খদ্দের এলে তেরচা করে তাকায়। হেসে গা দুলিয়ে কথা বলে।

হারুন ফেরিঘাটে এসে পৌঁছতেই জামিলার ফোন এল। সে বলল, আব্বা উনি এসে গেছেন। বোট পেলেই ওপারে চলে যাবেন। তুমি কোথায়? হারুন বলল, ফেরিঘাটেই দাঁড়িয়ে আছি মা। একেবারে মা বিদ্যেধরীর কোল ঘেঁষে। তুমি জলের কলকল ছলছল শুনবা? ওই শোনো কুলতলির লঞ্চে ভোঁ দিল। শুনতি পেলে? সেকথার উত্তর না দিয়ে জামিলা বলল, তোমার ফোন নম্বর দিয়েছি। ফোন করবেন। তুমি কোন জামা পরে এসেছ শুনি?

হারুন খুশির সুরে বলল, গেল বার বড় পুজোয় তুমি যে লাল পাঞ্জাবিটা দিয়েছিলে! যেটা পরিয়ে আমায় বসিরহাটে ঠাকুর দেখতে নে গেছিলে। জামিলা বলল, এহে, তুমি না আব্বা! ওই পাঞ্জাবিটা তো ইস্তিরি না করা! হারুন এক গাল হেসে বলল, তাতে কী! আমি টেনেটুনে সোজাসাপটা করে নিইছি!

ওপারের বোট ঘাটে লাগতেই হারুন তড়িঘড়ি ভিড় ঠেলে এগোল। তখনই তার মোবাইলে রিং হল। সে হ্যালো বলতেই ওদিক থেকে গম্ভীর গলা বলল, হারুনবাবু বলছেন? আমি জামিলার কাছ থেকে আপনার নম্বর পেয়েছি। হারুণ বলল, আজ্ঞে সে আমি বুঝে নিছি। আমায় তো তেমন কেউ ফোন করে না! আমি ফেরিঘাটেই

আছি। ওদিকের থেকে জবাব এল, আপনার লাল পাঞ্জাবি? আমার কালো। ফর্সা মতো। লম্বায় হারুনের মাথা ছাপিয়ে দু'আঙুল হবে। কাঁধ অবধি চুল। হালকা দাড়ি। কাঁধে লাল কালোয় ব্যাগপ্যাক। বোটের থেকে নেমে লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলল, নমস্কার। আমিই ফোন করেছিলাম। জামিলার বন্ধু। হারুন এক গাল হেসে বলল, আমি দেখেই চিনেছি। এট্টু চা-টা খেয়ে তার পর... কালো পাঞ্জাবি বলল, এখন তার দরকার নেই। আয়নামহল কত দূর? হেঁটে যেতে হবে? হারুন বলল, এই কাছেই। সোমবারে ভীড় হয়। পুজো থাকে তো। বাইরের লোক আসে। ভ্যান পাওয়া যায়। আজ তো দেখছি না। এই কাছেই, দরগাপাড়া পেরিয়েই এট্টুসখানি। সয়না নদীর পাড়ে মনসাপোঁতা। ওটাই আয়নামহল। শুকদেবদা তো আরদিরামের ফ্রি প্রাইমারি ইস্কুলের হেডমাস্টার ছিল।

কালো পাঞ্জাবি হারুনের পাশে পাশে হাঁটছিল। বলল, তারপর? হারুন বলল, শুকদেবদার ছেলে হরিদেব মিলিটারিতে ছিল। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ লাগল। সোমত্ত ছওয়াল শহিদ হয়ে বাক্সবন্দি লাশ হয়ে গাঁয়ে ফিরল। কালো পাঞ্জাবি বলল, কারগিলের যুদ্ধে! হারুন মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, শুকদেবদা ইস্কুলে যাওয়া ছাড়ান দিল। দিনভোর সয়নার পাড়ে বসে থাকত। মাঝেমধ্যে সয়নায় ছিপ নৌকো বেয়ে হেড়োখালির দিকে চলে যেত। সবাই মানা করত। ওদিকে তো বাঘের বন।

কালো পাঞ্জাবি বলল, এদিকে বাঘ আসে? হারুন হেসে বলল, সেসব অনেক আগে আসত। এখন সয়নার পাড়ে বনবিবির খান হয়েছে। গাজি মউলেরা গাঁ বন্ধকি করেছে। বাঘের ঢোকার উপায় নেই। তা যা বলছিলাম, কারও কথায় শুকদেবদা জবাব দিত না। এমন চলতে চলতে তারপর একদিন কোথায় হারিয়ে গেল। অনেক বছর কোনও খোঁজ ভলাশ ছিল না। বউদিদিরে ঝিনুকবাড়ির এয়োতি পোয়াতিরা বলল, এবার শাঁখা সিঁদুর ছাড়ান দাও। নিরামিষ খাও। বউদিদি কারও কথা নেল না।

কালো পাঞ্জাবি বলল, খুব ইন্টারেস্টিং। তার পর উনি ফেরত এলেন? হারুন বলল, হ্যাঁ। ছ-সাত বছর পর। জামিলা তখন ক্লাস নাইন হবে। আরশিগ্রামের হাই ইস্কুলে যায়। শুকদেবদা ফেরত এল। যদ্দুর মনে পড়ে রথের মেলার আগে পরে। বাড়িতে ওঠেনি। প্রথমে আরশিগ্রামে রায়বাবুদের কাত্যায়নী মন্দিরের ঠাকুর দালানে বসে থাকত। বউদিদি গিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে ফেরত এনেছিল। সেবার শ্রাবণ মাসে শুকদেবদাদের বকুলতলায় বড় করে মনসা পুজো হল। সবাই বলল, অ্যাদ্দিন কামরূপে সাধু সঙ্গ করে শুকদেবদা বাকসিদ্ধ হয়ে ফিরেছে। যারে যা বলে সব খেটে যায়। আর এই যে যাচ্ছেন, ওকে 'মা' ডাকবেন। মনসা ঠাকরুনের দয়ায় তো সব, ভাই!

কালো পাঞ্জাবি মৃদু হেসে বলল, আচ্ছা মা বলে ডাকতে হবে বুঝলাম। আর আয়নামহল? হারুন বলল, ওইটা রহস্য! শুনি শুকদেবদার একটা আয়না আছে। তাতে ভূত-ভবিষ্যৎ স্পষ্ট দেখা যায়। কালো পাঞ্জাবি বলল, আপনি দেখেছেন? হারুন মাথা নেড়ে বলল, আমার সাধ হয়নি কো! উপর থেকে যার জন্যে যা ঠিক করা আছে তাই হবে! তবে পাঁচ গাঁয়ের অনেক মানুষ দেখেছে।

দরগাতলায় এসে হারুন একগাল হেসে বলল, এই যে আমাদের মসজিদ। আর দূরে গেরুয়া রঙের পাঁচিল। মন্দিরের চুড়ো। নারকেল গাছ সারি সারি। ওই যে ঝুপসি বকুল গাছের মাথা দেখা যাচ্ছে, ওটাই আয়নামহল।

আয়নামহলে ঢুকে এসে হারুন বলল, আপনি কথা বলে আসুন। কালো পাঞ্জাবি বলল, আপনার মন্দিরে ঢোকায় মানা? হারুন হেসে বলল, না না। ফি-বছর শ্রাবণ মাসে মনসা পুজোয় আমি শুকদেবদাকে চাঁপার মালা দি যাই। ওই মালা মনসা ঠাকরুনের গলায় দেয় তো। আর জামিলা তো বিধু খুড়োদের বাড়িতে মনসার ভাসান গায়! ঝিনুক বাড়িতে জাতের ঠেলাঠেলির চেয়ে গনকালি বেশি।

কালো পাঞ্জাবি ভেতরে গেলে হারুন খানিকক্ষণ বকুল ফুল কুড়াল। আনমনে বলল, তুমি বাড়ি আসার

আগে মালা গেঁথে রাখবো। তোমার পড়ার টেবিলে রাখলে ঘরময় সুবাস ছাড়বে! তারপর আয়নামহলের দক্ষিণ দিকের পুকুরের ঘাটটায় এসে বসল। ঈষৎ সবজে জল মৃদু বাতাসে ভিরভিরিয়ে কাঁপছে। পুকুরের মাঝখানে লাল শাপলার পাতায় জলফড়িঙেরা ছোঁয়াছুঁয়ি খেলছে। পুকুর কান্ধার ঝুঁকে থাকা সজনে গাছের ডালে একটা কুঁচ বক ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হারুনের দিকে যেন সন্দিগ্ধ চোখে দেখছে। হারুন সেদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ফিক করে হাসল। বলল, আমি হলাম বোগদাদের খলিফা হারুন আল রসিদ। তুমি আমারে ডরাও নাকি পক্ষী? আসো, বসো এই খানে। পান,তামুক খাও। দুজনে গল্প করি।

ফেরার পথে কালো পাঞ্জাবি বিশেষ কথা বলছিল না। হারুন আগ বাড়িয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও সাহস পাচ্ছিল না। একবার বলেছিল, তা আমাদের আমাদের বাড়িতে দুপুরে চাট্টি খেয়ে যাবেন এমন ইচ্ছে ছিল। কালো পাঞ্জাবি অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিয়ে ছিল, আবার কখনও এলে তখন। রায়বাবুদের রাজবাড়ি। ঝিনুকবাড়ির বার বাড়ি। কিছুই তো এবার দেখা হল না। হারুন মাথা নেড়ে বলল, তা ঠিক।

বিদ্যেধরীর ফেরিঘাটে এসে হারুন বলল, এই শিশু গাছের ছায়ায় খানিক বসেন। ফেরি দুপুরে আধঘন্টা বন্ধ থাকে। গোঁসাইয়ের দোকান থেকে চা শিঙাড়া নিয়ে আসি। কালো পাঞ্জাবি ব্যাকপ্যাক থেকে জলের বোতল বার করে চুমুক দিল। মাথা নেড়ে বলল, শিঙাড়া লাগবে না। লাল চা চিনি ছাড়া। থাকে?

চায়ে চুমুক দিয়ে কালো পাঞ্জাবি বলল, আমার কেমন ভাব লেগেছে। বুঝলেন হারুন বাবু। ভদ্রলোক গডম্যান কিনা জানি না। কিন্তু পণ্ডিত মানুষ। দারুণ কথা বলেন। 'মা' বলে ডাকতেই বললেন, ওসব না বল্লেও চলবে। কিন্তু কোথায় ছিলেন তা নিয়ে স্পষ্ট কিছু বললেন না। কথার ফাঁকে কয়েকবার জ্ঞানগঞ্জ কথাটা এল। হারুন বলল, সেটা কী? কালো পাঞ্জাবি বলল, ও আপনি বুঝবেন না। মুসলিমরা জানে না। এটা হিন্দু কনসেপ্ট। দুর্গম হিমালয়ের কোথাও এক আজব গ্রাম আছে। সাধারণ মানুষ সে জায়গায় যেতে পারে না। পৌঁছলেও দেখতে পায় না। ফোর্থ ডাইমেনশন। সেখানে মানুষ অমর।

হারুন একটু চুপ করে থাকল। কালো পাঞ্জাবির কথাটা খারাপ লাগল। তবে জামিনার বন্ধু বলে হারুন তাকে মনে মনে মাফ করে দিল। উশখুশ করে বলল, তা ওই ফোর্থ ডাইমেনশানটা কী? মানুষ অমর হয়? আমাদের আনজুম রে নে গেলে বেঁচে যেত? চায়ে চুমুক দিয়ে কালো পাঞ্জাবি বলল, আনজুম কে?

শিশু গাছের নিচুর ডালে এক ঝাঁক ছাতারে পাখি কিচিমিচি করছিল। গাঙের দিক থেকে শনশনে বাতাস বইছিল। হারুন আনমনে বলল, দেখি ভব মুখ, বিদযে বুক/ কাল হইল তব দেহ। / গরুড় ময়ূরী, ওঝা ধন্বন্তরি, কিছু না করিল কেহ...। কালো পাঞ্জাবি বলল, কী বলছেন? হারুন বলল, ওই ক্ষেমানন্দের পালা বলছিলাম। গানের দলে ছেলাম এককালে। বাঁশি বাজাতাম। আনজুম ছেল জামিলার মা। দরগাতলায় সাপে কেটেছিল। জামিলা তখন দশ বারোর। ধেনো ওঝার পূতে বাঁধন দেল। মারুফায় বলল, বদরতলার সদর হাসপাতালে নে যাই চলো। বগা নাগতে তখনও চুল কাটানোর দোকান দেয়নি। বর্ষায় জমিন জিরেতে গাঙের পানি এলে আমরা এক লগে বড় গাঙে ইলিশ মারতে যেতাম। সেই বগায় নৌকা ভাসালো। আনজুমেরে নে আমি। আর বলাই, বগা, মারুফা। তা পথ তো আর অল্প নয় কো! যেতি যেতিই আনজুমডা শ্বাস ছাড়ল! বিষে বিষে সোনা অঙ্গে কালি ধরল। হাঁসির পালকের মতো নরম অঙ্গ কাঠ হল। জামিলায় তখন দশ কী বারোয়...।

ওপারের ফেরি এদিকের ঘাটে লেগেছে। তাই পথে বেশ ভিড়। কালো পাঞ্জাবি হারুনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, থ্যাঙ্কস হারুন বাবু। হারুন হাত জোড় করে বলল, আবার আসবেন। এই দেখুন, কথার ফেরে শোনাই হল না। আয়নামহলের আয়না দেখেছিলেন? কালো পাঞ্জাবি বলল, জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উনি উত্তর দেননি, হেসেছিলেন। হারুন বলল, কিন্তু কেউ কেউ

দেখেছে। আচ্ছা, পরের দিন এলে কিন্তু থেকে যেতে হবে। জামিলায় বড় সুন্দর রান্ধে! ওর মায়ের মতো!

সে রাতে হারুনের কিছুতেই ঘুম আসছিল না। অনেক দিন পরে আনজুমের কথা কাউকে বলে মন ভার হয়ে ছিল। হাটে গিয়ে ইয়ার দোস্তদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাশাতে মন লাগেনি। শাক আর মোচা খানিক বিক্রি হলে বাকিটা এরে তারে বিলিয়ে ছিল। তারপর তড়িঘড়ি জামিলার জন্যে গরম জিলাপি কিনে ফিরে এসেছিল।

ঘরের ভিতর থেকে জামিলা বলল, আব্বা ঘুমাও। দাওয়ায় শুয়ে হুঁশহাস করলে আমার ঘুম আসে না! কী এত ভাবো তুমি? হারুন লজ্জিত গলায় বলল, বেশি কিছু তো ভাবি না। তোমারে নিয়ে ভাবি! তোমার মায়েরে ভাবি। তুমি কচি প্রাণ কী বুঝবা তার! একটু বাদে জামিলা বলল, দাওয়ার ওই জানলাটা আমি মিস্তিরি লাগিয়ে বন্ধ করে দেব। ওইটা দিয়ে তুমি আকাশ দেখো। মায়েরে ভাবো। আর মন খারাপ করো! হারুন হেসে বলল, মাগো কেউ কারও আকাশ বন্ধ করতে পারে বুঝি? আকাশ তো সবখানে। আকাশ হল আল্লার মতো। চাইলেই টের পাওয়া যায়, সে ছুঁয়ে আছে! শুকদেবদা কি বলে জানিস মা? গীতায় নাকি লেখা আছে, ঠতেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্'। মানে হল, তাঁর প্রতি মন নিবেদন দিলে, তিনিই তাঁকে পাওয়ার বুদ্ধি দেন। জামিলা ঘুম জড়ানো গলায় বলল, আল্লা রে, এত তুমি মনে রাখো কী করে? আর মৌলবি চাচায় তোমারে জানতে পারলে দেবে নে! মোসলমান হয়ে এত হিন্দু ধম্মের গান গাও!

হারুন বিড়বিড় করে বলল, গানের দলে ছেলাম যে। ভাল কথা শুনলেই মনে থেকে যায়। দেখো, ভগবানের দু'কথা ভাল। আল্লার দু'কথা ভাল। আর ভাল কথা হল সত্যের মতো! যেই বলুক তা ভাল। এবার তুমি ঘুমাও!

বিদ্যেধরীর উপরের আকাশে সারি সারি মেঘকিশোরী আলুথালু কেশে চলেছে সয়না পেরিয়ে দূরের দেশে। বড় গাঙের দিক থেকে ফুরফুরিয়ে জলজ বাতাস বইছে। দরগাতলার মসজিদ থেকে ভেসে আসছে মাগরিবের আজান। বহতা বাতাসে হারুনের শীত শীত লাগে। তেলিগাড়ায় বলাইয়ের বউ শাঁখ বাজায়। উলু দেয়। হারুন কাঁথাটা গায়ে টেনে শোয়। জামিলার ঘর কানাচির গন্ধরাজ গাছে এবার খুব ফুল এসেছে। হারুনের মন জামিলার জন্যে। কইকাভারি যায়! ভরন্ত ডোবার ধারে কলমি কুলেখাড়ার বনে ঝিঁঝিরা তান দেয়।

মারুফা হুড়দুড়িয়ে দাওয়ায় উঠে এল। দাওয়ার এক পাশে হারুন কাঁথা গায়ে শুয়ে ছিল। সে বলল, ও আল্লা, ভোর সন্ধেয় ন্যাতানেতি গায়ে চাপিয়ে আছো কেন? এই যে দেখো, তোমার জামিলার জন্যে হাঁসির ডিম এনেছি। রেন্ধে খাবে ক্ষণ রাতে। মুখখান এত শুকনো লাগে কেন? আমার, 'আঁধার কালো, পাখি কালো, কালো চোখের মণি/ তা হইতে অধিক কালো রাখাল নীলমণি...'। কথা কও না কেন খ্যাপা?

হারুন মৃদু স্বরে বলল, জামিলায় আজ দুই দিন বাড়ি ফেরেনি! কলকাতায় পরীক্ষা দেওয়ার ছেল। বলল, দমদমে কোন বন্ধুর বাড়ি কজন মিলে এক রাত্তির থাকবে। তা আমি দু'দিন ফোন দিচ্ছি, ফোন যাচ্ছে না। মারুফা বলল, ওহ্, তাই তুমি ফোনে রে পাশবালিশ বানায়ে পড়ে আছো! দেখি ফোন তোমার।

মারুফা হারুনের হাতের পাশ থেকে ফোন নিয়ে 'খুকি'-তে ডায়াল করল। তারপর লাইনটা কেটে দিয়ে বলল, তোমার ফোনে পয়সা নেই তো! যত পাগুলে বুদ্ধি। বলে ফোন যাচ্ছে না কেন! রান্ধাবাড়া করেছিলে? হারুন মাথা নেড়ে বলল, ফেরিঘাটে বসে ছেলাম। এই আসে...ওই আসে... করে দিন গেল!... মারুফা খানিক চুপ করে থেকে নিজের মোবাইল থেকে জামিলাকে ফোন করল। একবার, দু'বার...। তারপর বলল, আউট অফ রিচ। হয়তো মোবাইল বন্ধ করে চার্জে দিয়েছে। ভেবো না আবার করব।

মারুফা চালে-ডালে খিচুড়ি চাপালো। হ্যারিকেন ফিতে বাড়িয়ে হারুনের পাশে এল। বলল, এখনও মন খারাপ করে থাকবা? 'অষ্ট মাসে পুকুর ঘাটে কানাই দেখা দিল / কানাই রে দেখিয়া রাধে ঘোমটা টানিল।/ তরুতলে কালা সোনা যেই মুরলী দিল টান/ শুনে যত

ব্রজের গোপীর না ধরে পরাণ...!' কই এদিকে তাকাও না খ্যাপা! ওমা এ কী! তোমার গা তো জ্বরে পুড়ছে!

হারুনের গায়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে মারুফা বলল, দেখো দেখি পাগলের কান্ড! জ্বর বাঁধিয়ে বসে আছে! স্নেহ প্রশ্রয়ের ছোঁয়ায় হারুনের চোখ ভিজে এল। সে মারুফার কাঁধে মাথা রাখল। মারুফার গায়েও আনজুমের মতো গন্ধ। আম্মার গায়েও ছিল। হারুন জানে সব মেয়েতেই একটা মা থাকে। মনে কষ্ট হলে তখন মা গন্ধটা আর সব গন্ধকে ছাপিয়ে যায়! মারুফা হারুনকে শক্ত করে নিজের গায়ে চেপে ধরে রাখল। হারুনের মুখে গলায় চোখের পাতায় আলতো ঠোঁটে আদর করল। তারপর ফিসফিস করে বলল...চলিতে চলিতে রাধে ঢলিয়া পড়িল/ কালো সোনার নাম ধরে ডাকিতে লাগিল...।' খ্যাপার মন কান্দে মনের টানে। শরীল জাগে শরীল জ্ঞানে। খিচুড়ি বাড়ছি খেয়ে নাও। আমি বাড়ি থেকে ওষুধ নি আসি।

সে রাতেও জামিলা এল না। তারপর দিনও না। তারপরের দিনও না। মারুফার সঙ্গে হারুন বসিরহাটের কোচিং ক্লাসে গেল। বিকালে ভ্যাবলার টিউশন ব্যাচে খোঁজ করল। তারা কিছু বলতে পারল না। সন্ধের খেয়ায় ঝিনুকবাড়ি ফেরার সময় মারুফা বলল, তোমার মোবাইলটা রিচার্জ করে দিই। তুমি মন করলে ফোন করতে পারবা! হারুন মাথা নাড়ল। বলল, আমার ফোন করা লাগেনি কোনও দিন!

সয়নার পারে এসে মারফা বলল, সাতদিন গেল। পুলিশে একটা খবর দিলে হতো। হারুন নিচু গলায় বলল, যখন মানুষ ইচ্ছে করে লুকায়, ইচ্ছে করে ঘুমায়, তখন তারে ছোঁয়া যায় না! মারুফা বলল, আমার সঙ্গে তো আড়ালের সম্পর্ক ছিল। আমায় দেখলে পালিয়ে বেড়াত। সেই বাচ্চাকাল থেকে। আব্বা কই তোর? বললেই বলত, এত খোঁজে তোমার দরকার কী? যাও খুঁজে দেখো গে। বিল কানাচে, নয় সয়নার পাড়ে ঘুরে বেড়ায় দিনভর!

সারাদিন বৃষ্টির পর আকাশে এক ফালি ভিজে চাঁদ জেগেছে। সয়নার জলে সেই চাঁদরেখা রুপালি জরির মতো নড়েচড়ে ফিরছে। হারুন একটা মস্ত অর্জুন গাছের নিচে দাঁড়াল। মারুফাকে দু'হাত দিয়ে কাছে টেনে নিল। নিচু গলায় বলল, আমায় পুলিশ দেখাইও না! ওতে মান যায়। আমি বোগদাদের খলিফা হারুন আল রসিদ। দোস্ত জাফর ইবনে ইয়াহিয়াকে বললেই জামিলাকে খুঁজে দেবে। কিন্তু যখন মানুষ ইচ্ছে করে লুকায়। ইচ্ছে করে ঘুমায়। তখন তারে ছোঁয়া যায় না!

মারুফা হারুনের হাতে বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, ইচ্ছে করেই, একথা কেন মনে হচ্ছে তোমার? হারুন সেকথার উত্তর দিল না। হনহন করে দরগাতলার দিকে হাঁটা শুরু করল। মারুফা দৌড়ে এসে পিছন থেকে হাত টেনে ধরল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, কোথায় যাও খ্যাপা? বাড়ি চলো...।

রাক দ্বিপ্রহর। অন্ধকারে ডুবে সয়নার পাড়ে ঝিনুকবাড়ি বারমহল। সেকালে বাবুরা এখানে গানের জলসা করতেন। বেনারস, লখনউ থেকে নাচনি আনাতেন। এখন এ বাড়ি শুনশান এক খণ্ডহর। যারা ছিল, কেউ কোথাও নেই। এখানে যেন অনেক কাল কেউ জীবনের দাবি নিয়ে আসেনি। চারপাশে যারা নিঃশ্বাস ফেলছে, তারা এই দুনিয়ার কেউ নয়। সাবেক দালানের কড়িবরগায় সারি সারি সংসার পেতেছে বট অশ্বত্থেরা। মাঝরাতে সয়নার বুক উজাড়ি বাতাসে যেন ভাসছে হঠাৎ না বলে ফুরিয়ে যাওয়া মানুষদের দীর্ঘশ্বাস।

হারুনের পাশাপাশি হাঁটছে মারুফা। পথের পাশে আঁকশি হেলেঞ্চার ঝোপ লতানিতে জোনাকির আলোয় জ্বলছে নিভছে। হারুন সেদিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল, মানুষের ভালবাসা আর ইচ্ছেরা সব জোনাকির আলো। যেই ছুঁতে গিয়েছ, অমনি সে অন্যখানে জ্বলে ওঠে। তোমার আর নাগাল পাওয়ার উপায় নেই। মারুফা বলল, বাড়ি চলো খ্যাপা! হারুন বলল, দমবন্ধ লাগে। নেই আর নেই! আমি সইতে নারি। মারুফা বলল, কোথায় যাবা এই এত রাতে? হারুন বলল, আয়নামহল! সেই আয়নাটায় একবার তারে দেখার ইচ্ছে হই।

বকুলতলায় সারি সারি মোম জ্বলছে। বেদির উপরে

বন্ধ চোখে বসে শুকদেব। পরনে কেবল একটা ধুতি। খালি গা পাতাঝরা জলে ভেজা। পায়ের কাছে ধুনুচিতে ধুনো, অগুরু পুড়ছে। তাই ধোঁয়াটে চারপাশ। ভুরভুরে ঝাঁঝালো মিষ্টি গন্ধ নড়েচড়ে ফিরছে। কেউ কোথাও নেই। এক-দু ফোঁটা বৃষ্টির সঙ্গে বকুল ফুলেরা টিপিস টি ঝরছে। হারুন আর মারুফা পায়ে পায়ে গিয়ে বেদির কাছে বসলো। মারুফা ইশারায় হারুনকে জিজ্ঞাসা করল ডাকবে কিনা। হারুন হাত নেড়ে অপেক্ষা করতে বলল।

মাথার উপর দিয়ে ডানা ঝাপটে উড়ে গেল রাতচরা পাখিরা। পুকুর কান্ধার শ্যাওড়া গাছের দিক থেকে ভাসল তক্ষকের ডাক। আয়নামহলের দুলি কুকুরি ভিজে বাতাসে সুর তুলে ডাকল। অমনি শুকদেবের ঠোঁট নড়ে উঠল। তিনি চোখ খুললেন। মারুফা কিছু বলতে যাচ্ছিল। শুকদেব হাত তুলে থামালেন। কোমল স্বরে বললেন, হারুন। 'ভভৈষণা সর্বে যষুধীরাস্তপোবনম'। ভাগবতে আছে। বাসনা না গেলে তপোবনে যাওয়ার ফল পাওয়া যায় না। হারুন বলন, বাসনা কী শুকদেবদা?

শুকদের খানিক চুপ করে থেকে বললেন, ইচ্ছেরা। মারুফা হাতজোড় করে বলল, মা ওর মেয়ে বাড়ি ফেরে না। মানুষটা পাগালপারা ঘুরে ফেরে গাঁ-ময়। আমি দরগাতলায় পীরের থানে দোয়াদরুদ করে এসেছি। কিছুতে কিছু হয়নি মা!

শুকদেব থেমে থেকে বললেন, মানুষ কিছু নিয়ে আসে না। জীবন পায় এখানে। জীবন ব্যবহার করতে করতে সে এখানে মায়া গড়ে। সম্পর্ক বানায়। রোজ জীবন ব্যয় করি। আর যা পেয়েছি তা হারানোর খেলা শুরু হয়। খোলা হাতে ফেরাই মনুষ্যের নিয়তি। একে-একে সব পর হয়ে যায়।

হারুন অস্ফুটে বলল, অনেক মায়া। মা মরা মাইয়্যা আমার। শুকদেব মৃদু হেসে বললেন, মা মরা ভাবিস কেন? মা কি কেবল জন্ম দিলেই মা? তুই তো গায়েনের দলে ছিলি। দেবকী মায়ের বাড়া হল মা যশোদা। মারুফার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে শুকদেব বললেন, এই তো মায়ের আকুলিবিকুলি। মারুফা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। হারুন বলল, সমাজ তা নেয় না! শুকদেব বললেন, তুমি সমাজেরে নাও? নিশুতি রাতে দুইজন ঘুরা-ফেরা। এইডা সমাজ নেয়? শোন হারুন, দেহ রে ভালবাসে সাধারণ মনুষ্য। তুই যে আনজুমেরে মনে করো, তা ওই তার মনুষ্য চেহারাটায়। আসলে এই ছুঁড়ির অন্তরে একখান আনজুম আছে। তাই হ্যারে তুমি কাছ ঘেঁষতি দাও। কেবল কেন দাও তার উত্তর জানো না!

হারুন বলল, আমার প্রাণ জামিলারে দেখার মন করে। তোমার আয়নামহল দি তারে একবার দেখার ইচ্ছে করি। শুকদেব স্মিত হেসে বললেন, আয়নামহল হল চোখের সামনে যা দেখিস। আর মনে যা ভাবিস। সেই দুনিয়াদারি। যারে ভালবাসিস তারে তো চোখবন্ধ করে ভাবতে পারিস। কারণ, মনের আয়নায় সে বান্ধা রয়েছে। তাই আর কেউ না জানে, তুই জানিস জামিলায় ভাল আছে! মারুফা চোখ মুছে বলল, তিনি কোথায় আছে মা? শুকদেব বললেন, সময় সব সময়ে জানায়। তুই আগে জানবি, খোঁজ। মা তো!

আকাশের গভীর নীলে এখন ধুনুরির উড়িয়ে দেওয়া তুলোর মতো মেঘের রাজ্যপাট। বিদ্যধরীর দু' পাড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাশের মেলা। গাঙের পানির বুক উজাড়ি বাতাসে তারা একে অন্যের গায়ে ঢলে ঢলে সোহাগ করছে। বিদ্যেধরীর বুকে দাঁড় নৌকো, ভটভটির ভিড়। মাঝে মধ্যে ঘোলাটে ঢেউ তুলে ভোঁ বাজিয়ে যাচ্ছে নারী বোঝাই লঞ্চ। হারুন এক ঠোঙা মুড়ি হাতে নিয়ে ফেরিঘাটের কাছে বসে ছিল। সে রোজ বিকাল থেকে সন্ধে অবধি এখানে বসে থাকে। বোট থেকে নামা ভিড়ের মুখ দেখে। পাঞ্জাবির পকেট থেকে মোবাইলটা বার করে হাতে নাড়াচাড়া করে। কাউকে কিছুটি বলে না। শেষ ফেরি ঝিনুকবাড়ির ঘাট ছাড়লে সে বাড়ি ফিরে আসে।

কাল নয় পরশু বড় পুজো। আজকাল হারুনের দিনের হিসাব ঠিকঠাক থাকে না। শেষ বিকালে ঢাক, কাঁসর বাজিয়ে ঘাটে প্রতিমা নিয়ে এল বলাইরা। বলাই হাতছানি দিয়ে ডাকল। হারুন মাথা নেড়ে বলল, তোরা যা। আমার শরীল বেজুত।

তখনই হারুনের মোবাইল বাজল। সে চমকে উঠে পকেট থেকে মোবাইলটা বার করল। মারুফা! 'হ্যালো' বলতেই ওপার থেকে তার উচ্ছ্বসিত গলা ভাসল। সে বলল, কতবার ফোন করছি। শুনতে পাচ্ছ না? খুব ভাল খবর আছে! হারুন বলল, বলাইরা প্রতিমা নিয়ে এল তো। খুব ঢাক,কাঁসর বাজছিল। তাই শোনা যায়নি। মারুফা বলল, আমি এপারে ফেরিঘাটে। তুমি কোথায়? হারুন বলল, ফেরিঘাটে। মারুফা বলল, কোনও ঠাঁই যেও না কো! খানিক খাঁড়াও।

মারফা ভিড় ঠেলে হারুনের কাছে এসে বলল, বশিরের কাপড়ের দোকানের ওদিকে চলো। এখানে খুব ভিড়। হারুন বলল, সেদিকেও ভিড়। কত কেউ সবাই নতুন শাড়ি জামা কিনতে এসেছে। মারুফা বলল, তা তোমার জামিলারে নতুন জামা দেবা না? হারুন ফ্যাল ফ্যাল করে মারুফার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। মারুফা হেসে বলল, উঁহু কাঁদতে বসলে চলছে না। খাঁড়াও দেখাই। দেখো চিনতে পারো কিনা!

মারুফা ব্যাগের থেকে মোবাইল বার করে ফেসবুক খুলল। তার পর হারুনের হাতে ফোনটা দিয়ে বলল, দেখো! হারুন কাঁপা হাতে মোবাইলটা নিয়ে স্ক্রিনের উপর ঝুঁকে এল। তার ঠোঁট কাঁপছিল। 'কালের নয়ন জলে বয়ান ভেসে যায়। মাগো কেমন করে কই গো কথা তোমায়! হারুনের চোখের পাতায় সপ্তদরিয়ার পানি খলবলালো। দৃষ্টিপথ ঝাপসি হল। সারা গা জিনে পাওয়া মনিষ্যির মতো খরখরাল! সে অস্ফুটে বলল, মা! মাগো! ... মারুফা তাকে চট করে দু'হাতে আঁকড়ে ধরলো। নইলে হারুন পড়েই যেত!

ঘর কানাচির শিউলি গাছটা এবার বেবাক ফুলে ছয়লাপ। হারুন সেদিকে তাকিয়ে বসেছিল। মারুফা ভাত চাপিয়ে হারুনের পাশে এসে বসল। পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, কথা কও না কেন? হারুন ঘাড় ঝুঁকিয়ে তার কাঁধে মাথা রাখল।

মারুফা মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, ফেসবুক বোঝো? জামিলার সেখানে অ্যাকাউন্ট আছে। আমি তেনারে অনেক কাল আগে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট করেছিলাম। এত দিন সে রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করেনি! এই ক'মাস রোজ তারে কিছু না কিছু লিখতাম। সে মেসেজ খুলেও দেখত না। আজ রিহার্সাল থেকে বেরিয়ে দেখি নোটিফিকেশন এসেছে। জামিলা অ্যাকসেপ্টেড ইওর ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট। কিন্তু মেসেজ খোলেনি। আমি অবশ্য তারে তোমার কথা লিখেছি। বাড়ি আসতে লিখেছি! খুব বড় ঘরে বে করেছে! রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি। প্লেনে চেপে আর কত দেশ ঘুরতে যায়। মারুফা মোবাইলটা হারুনের হাতে এগিয়ে দিল।

হারুন মোবাইলটা হাতে নিয়ে অপলক চোখে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকল। মারুফা খানিক বিরক্ত গলায় বলল, কিছুই তো বলছ না। খালি হুসহাস করে শ্বাস ফেলছ! এই দেখো তোমার জামাই। কী সুন্দর চেহারা। তোমার চেয়েও মাথায় লম্বা হবে। খানিক যেন কম বয়সের তুমি! গায়ের রংটা কেবল সাদা...।

হারুন দেওয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে ক'বার কাশলো। হাত বাড়িয়ে গামছাটা টেনে নিয়ে নাক ঝাড়ল। তারপর ঘুরে বসল মারুফার দিকে। আনমনে বলল, হ্যারিকেনটায় ভাল আলো দেয় না। কাল চিমনিটা বেলাকালে ধুতে হবে। একটু সলতেটা বাড়িয়ে দেবা? আন্ধার লাগে চারপাশ।

মারুফা হ্যারিকেনের ফিতে বাড়িয়ে দিল। ঝুঁকে এল হারুনের কাছে। চোখে চোখ রেখে বলল, কাল মহাসপ্তমী। যাবা তোমার জামিলারে দেখতে? ওর শ্বশুরঘরে দুর্গা পুজো হয়। ফেসবুকে সবাই রে দাওয়াত দিছে!

হারুন বলল, কোথায়? মারুফা হারুনের দু'হাত নিজের হাতের মধ্যে নিল। হেসে বলল, 'উত্তরে গারো পাহাড় ছয় মাস্যা পথ। তাহার উত্তরে আছে হিমানী পর্বত। চান্দ সূরুজ নাই আন্দারিতে ঘেরা। বাঘ ভালুক বইসে মাইনসের নাই লরাচরা...। ভয় খাও ক্যান খ্যাপা? এই ফেরি পার হয়ে সক্কাল করে বসিরহাট। সেখান থেকে রেলে বারাসাত। আর বারাসাত থেকে আধঘণ্টায়

গঙ্গার পাড়। চৌধুরী প্যালেস। জমিদার বাড়ি বললে যে কেউ দেখিয়ে দেবে!

হারুন উঠে ঘরে গেল। দড়িতে ঝোলানো দলামোচড়া লাল পাঞ্জাবিটা এনে মারুফার কোলে রাখল। আহ্লাদের সুরে বলল, এট্টু ইস্তিরি ঘষে দেবা? আর বছর বড় পুজোর সময় এটা সে কিনে দিছিল! এইটা পরায়ে আমারে ঠাকুর দেখতে নে গেছিল!

মস্ত সাতমহলা বাড়ি। মস্ত আয়োজন। বাড়ির লোকে আর বাইরের লোকে মিলেমিশে যেন মেলা বসেছে। তাদের যানবাহন বদলে বদলে আসতে বেলা পড়ে এসেছে। বাড়ির সামনের রাস্তাতেও সার সার গাড়ি দাঁড়িয়ে। হারুন এত জাঁক কখনও দেখেনি। সে ঘাড় ঘুরিয়ে মাথা উঁচিয়ে চারধার দেখছিল। মস্ত ডাকের সাজের প্রতিমা। সামনে বাড়ির মেয়ে বউদের ভিড়। সেদিকটা ধূপে-ধুনোয় ভাল ঠাওর করা যায় না। মণ্ডপ ঘিরে সারি সারি ঢাকি ঢাকের খেল-তামাশায় মেতে। ঠাকুরদালানের সামনে লম্বা তিন সারি টেবিল পেতে খাওয়ার ব্যবস্থা। সুন্দর দেখতে একদল ছেলেমেয়ে ঘুরে ঘুরে অন্নভোগ, মিষ্টান্ন পরিবেশন করছিল।

নাকে ঝোলা নথ, শাড়ি পরা সুন্দর মতো একটা মেয়ে হারুনের কাছে এসে বলল, কাকু তোমরা খেয়েছ? শিগগিরি ওদিকটায় বসে যাও। মারুফা হারুনের পাঞ্জাবিতে টান দিয়ে বলল, এদিক সেদিক কী দেখো এত? ভোগ খাবে চলো!

মারুফা চুপচাপ খাচ্ছিল। হারুন এক গরাস খায়। আর এদিক সেদিক তাকায়। মারুফা থাকতে না পেরে বলল, জামিলাকে আজ দেখার আশা ছাড়ান দাও। এত মানুষ। এত বড় কাজের বাড়ি। হারুন কিছু না বলে ঝপ করে মারুফার হাত চেপে ধরল। বলল, ওই যে কালো পাঞ্জাবি! আর পেছনে ওইটা কে! ওইটা কে? ওই যে হেসে হেসে কথা বলছে! মারুফা তার হাত ধরে টেনে বসান। ফিসফিস করে বলল, ওইটা তো জামাই! ছবিতে দেখেছি। কিন্তু বউ মানুষটা আমার জামিলা নয়। সে এত খাটো না! জামাইরে তুমি চেনো নাকি? হারুন উত্তর দিল না। ফের বসে পড়ল।

অবিরাম মানুষ সিংহদরজা দিয়ে ঢুকছে বেরোচ্ছে। ধূপ-ধুনো-ফুল আর তাদের গায়ের সুগন্ধির সুবাসে দরদালান ম ম করছে। হারুন আর মারুফা পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল। এমন সময় ভিড় ঠেলে সেই ঝোলা নথ পরা মেয়েটা হারুনের সামনে এল। এক গাল হেসে বলল, কাকু তোমরা খেয়েছ? হারুন বাধ্য বালকের মতো ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল। মেয়েটা তার হাত ব্যাগের থেকে একটা নীল খাম বার করল। বলল, নতুন বউদিদি এটা তোমায় দিতে বলেছে। হারুন মারুফার দিকে এক পলক তাকাল। তারপর খামটা হাতে নিল। ধরে আসা গলায় হারুন বলল, তিনি কই মা?

ঝোলা নথের সুন্দর মতো মেয়েটা হাত উঁচিয়ে দূরে দেখিয়ে বলল, ওই-ই যে ঠাকুর দালানে ভিড়ের সামনে দাঁড়িয়ে। লালপেড়ে গরদের শাড়ি। নাকে মা দুর্গার মতো নথ। দেখেছ? এদিকেই তো তাকিয়ে আছেন! মারুফা হারুনের কাঁধের ঝোলা থেকে সদ্য কেনা লাল ডুরে শাড়িটা বার করে মেয়েটার হাতে দিল। বলল, এইটা তোমার নতুন বউদিদিকে দিও। 'আচ্ছা' বলে সে শাড়িটা নিয়ে ভিড় ঠেলে ছুটে ঠাকুরদালানে চলে গেল।

জামিলা শাড়িটা হাতে নিয়ে অপলক তাকিয়ে থাকল। সোজা দাঁড়িয়ে ক'পা পিছিয়ে গেল। তারপর দ্রুত ঘুরে ভিড়ে মিশে গেল! মারুফা হারুনের হাত ধরে সিংহদরজা পেরিয়ে এল। বলল, খামটা খুলবা না খ্যাপা? হারুন হাতের চেটোয় চোখের জল মুছে খামটা মারুফার দিকে এগিয়ে দিল। মারুফা মাথা নেড়ে বলল, না তুমি খোল!

রাস্তার জ্বলে ওঠা ইলেক্ট্রিকের আলোয় কাঁপা হাতে হারুন খামটা খুলল। গঙ্গার পাড়ের দিক থেকে শনশনিয়ে বাতাস বইল। সেই বাতাস পেয়ে তিন কথার চিঠিটা যেন জামিলার সুরে ফিসফিসিয়ে বলল, আব্বা, মায়ের হারটা পাঠালাম। মারুফারে দিও! আব্বা, এ বাড়িতে তুমি আর আইসো না! ■

দীপান্বিতা রায়

স্বর্ণচাঁপার সুগন্ধ

গাড়িটা গ্যারেজে তার নির্দিষ্ট জায়গায় পার্ক করল সুচেতা। তার গ্যারেজ স্পেসটা একটা কোণায়। পার্ক করা একটু কঠিন। সুচেতার কোনও অসুবিধা হয় না, কারণ সে পাকা ড্রাইভার। নীল একবার পার্ক করতে গিয়ে দেওয়ালে ঘষে ফেলেছিল। তারপর থেকে নীলকে আর পার্ক করতে দেয় না। সত্যি কথা বলতে কী, নীল তার গাড়িটা চালাক এটাও সুচেতার খুব পছন্দ নয়। একমাত্র এই একটি ক্ষেত্রেই নীল আবদার করলেও সহজে রাজি হয় না সে। আসলে গাড়ি সুচেতার একটা প্যাশন। সে শুধু গাড়ি চালাতে, উদ্দেশ্যহীন লং ড্রাইভে যেতে ভালোবাসে তা নয়, গাড়িটাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখাও তার অভ্যাস। সুন্দর সিট কভার, ভিতরে ছোট্ট আরামদায়ক কুশন, ঠিকঠাক ফ্লোর ম্যাট এবং অবশ্যই সুন্দর সুগন্ধি ছাড়া সে নিজের গাড়ি ভাবতেই পারে না। অবশ্য শুধু গাড়িতে নয়, সুগন্ধ নিয়ে বাড়ি-গাড়ি সর্বত্রই তার একটু মাথাব্যথা বেশি। স্টার্ট বন্ধ করে রোজকার মত ডাস্টার দিয়ে একবার ড্যাশবোর্ডটা ঝেড়ে নিল সুচেতা। হলুদ রঙের স্যাময় লেদারের ডাস্টারটা পরিপাটি করে ভাঁজ করে রাখতে গিয়ে হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল নিজেরই। মানুষের অভ্যাস কী সাংঘাতিক! মন যেদিকেই চলুক না কেন, শরীর কীরকম যন্ত্রের মত নিয়ম মেনে চলে।

ফ্ল্যাটটা আটতলার ওপরে। লিফটে ওঠার সময় ফিফথ্ ফ্লোরের রাহুলের সঙ্গে দেখা হতে একটা নিয়মমাফিক প্লাস্টিক হাসি। চাবি ঘুরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে আলো না জ্বালিয়েই কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সুচেতা। নীল বেরনোর সময় জানলা বন্ধ করেনি। বৈশাখের মাঝামাঝি। এ সময়টায় কালবৈশাখী হতেই পারে। সব জানলা কাচের। ভেঙে গেলে ঝামেলার একশেষ। তাই নীলকে বারবার বলা থাকে জানলা বন্ধ করে বেরোতে। কিন্তু নীল সবসময় ভুলে যায়। আসলে কাচ ভাঙলে সেটা সারানো, তার জন্য মিস্ত্রি ডাকা, ভাঙা কাচ এবং জলে ভেসে যাওয়া ঘর পরিষ্কার এসবই তো সুচেতার কাজ। তাই নীল জানলা বন্ধের মত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না। বাইরে কোথাও বোধহয় বৃষ্টি হয়েছে। হালকা জলের গন্ধওয়ালা বাতাস ঘরের ভেতর হুটোপাটি করছে। লুটোপাটি খাওয়া পর্দাগুলোর দিকে তাকিয়ে সুচেতা ভাবল, সত্যিই! কত কিছুই তো নীল মনে রাখে না। তাকে মনে রাখতে হয়। সে খুব জোর দিয়ে কখনও নীলকে বলেও না যে মনে রাখতে হবে, মনে রাখাটা দরকার, নাহলে তার অসুবিধা হয়। কবে থেকে এই অভ্যাসটা চলে গেল সুচেতার! ছিল কি কোনওদিন? অন্ধকার ঘরে একলা দাঁড়িয়ে মনে করতে চায় সুচেতা।

একটা সময় তো তার ইচ্ছেতেই চলত গোটা বাড়িটা। দোলার পছন্দমত বিছানার চাদর থেকে পর্দার কাপড়।

পুজোর ছুটিতে পাহাড় না সমুদ্র ঠিক করবে দোলা। মায়ের মাস্তাসা গড়ানো হবে একটু মাপে বড় করে, কারণ দোলার কবজি চওড়া। শুধু একমাত্র সন্তান বলে নয়, মেয়ে যে রীতিমত গর্ব করার মতো। স্কুলে বরাবর ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট। তারপর তো কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে ভর্তি হল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। পাড়া-প্রতিবেশী-আত্মীয়স্বজনের কাছে মেয়ের কথা শতমুখে বলেও যেন আশ মিটত না মা-বাবার। মেয়ের জন্য কখনও কারও কাছে হেঁটমুখ হতে হয়নি। কলেজ থেকে পাস করে বেরোতে না বেরোতেই ভালো চাকরি।

নিজের মতে চলার অভ্যাসটা দোলার প্রথম ধাক্কা খেল ঋষিদের বাড়িতে গিয়ে। অথচ ধাক্কা যে খেতে পারে সেটা সে ভাবেইনি কখনও। দু'বছরের সিনিয়র ঋষির সঙ্গে প্রেম কলেজে পড়ার সময় থেকেই। একসঙ্গে নাটক, সিনেমা দেখা, ময়দানে হাত ধরে বেড়ানো, গ্রুপে মন্দারমণি গিয়ে একঘরে রাত কাটানো। সুচেতার ধারণা ছিল ঋষিকে সে হদ্দমুদ্দ চেনে, কিন্তু বিয়ের সপ্তাহখানেকের মধ্যেই বোঝা গেল ব্যাপারটা ঠিক সেরকম নয়। সেদিন রবিবার ছিল, কিন্তু ছুটির দিন হলেও একবার অফিসে যেতে হবে সুচেতাকে। এদিকে শাশুড়ি আগেই বলে রেখেছেন, সারা সপ্তাহ সময় হয় না, তাই রবিবার সকালে ব্রেকফাস্টের দায়িত্ব নতুন বউয়ের। আপত্তি করেনি সুচেতা। আগের দিন জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখেছিল। সকালে সবার জন্য ফলের রস, টোস্ট, অমলেট, সন্দেশ গুছিয়ে টেবিলে সাজিয়ে নিজে গেছিল তৈরি হতে। ফিরে এসে দেখে টেবিলে ঋষির সঙ্গে শ্বশুর-শাশুড়ি বসে আছেন, কিন্তু মুখ গম্ভীর তিনজনেরই।

রবিবার সকালে আমরা লুচি আর সাদা আলুর তরকারি খাই তুমি জানো না সুচি! অনেকবার বলেছি তো তোমায়।

ঋষির কথায় অবাক হয় সুচেতা।

জানব না কেন? কিন্তু আজ তো আমায় বেরোতে হবে। লুচি বানাব কখন? সেজন্যই টোস্ট-অমলেট রেডি করেছি...।

তোমার পছন্দে আমাদের খেতে হবে নাকি! এতো ভারী অদ্ভুত ব্যাপার।

শ্বশুরমশাইয়ের গলায় বিরক্তি।

আগে বললেই পারতে পারবে না। তাহলে আমিই করে নিতাম। খামোখা এতগুলো জিনিস নষ্ট হতো না...।

অবাক হয়ে যায় সুচেতা। একদিন লুচির বদলে টোস্ট খাওয়া যাবে না! রাতে বিছানায় শুয়ে জিজ্ঞাসা করে ঋষিকে।

একটা রবিবার লুচির বদলে ব্রেড খেলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়! মা কোনওদিন অসুস্থ হলে তোমাদের লুচি কে ভাজে?

এমারজেন্সি একটা আলাদা ব্যাপার সুচি। কিন্তু তুমি নিজের সুবিধার জন্য আমাদেরকে তোমার খুশি মতো চালাতে চাইলে সেটা আমাদের বাড়ির কারও ভালো লাগবে না।

সুচির খুশি কিংবা সুবিধাটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তার থেকে অন্যদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেটা মনে রাখতে হবে সুচেতাকে। মনে রাখার দায়িত্বটা মূলত তার। কারণ সে এসেছে এই পরিবারের সঙ্গে একাত্ম হতে। তাকেই তো বুঝে নিতে হবে, কীভাবে সে একদম খাপে খাপে বসে যেতে পারে, যাতে এতটুকুও উঁচু-নীচু মালুম না দেয়।

এই বোঝাটা চলতে থাকে, কিন্তু চিরকালের বুদ্ধিমান ছাত্রী সুচেতা বিশ্বাসের সংসারের সমীকরণ বুঝতে বড্ড বেশি সময় লাগে। তার অফিসে বেরনোর তাড়া আছে। ঋষি পরে বেরোবে। বাড়িতে শাশুড়ি আছেন। সবসময়ের কাজের লোক সুরমাদি আছে, কিন্তু তবু ঋষির খাবারটা যে তারই টেবিলে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা উচিত, টিফিনটা যে ব্যাগে ভরে দেওয়া উচিত এসব মনে থাকে না সুচেতার।

মাইনে পেলে আমি হাতখরচটা রেখে বাকি টাকাটা মাকে দিয়ে দিই...।

দু-চারবার রাতে যখন তারা ঘরের ভিতর শুধু দু'জনে মিলে গল্প করছে কিংবা বিছানা পাতছে,

সুচেতাকে বলেছে ঋষি। সুচেতা ইচ্ছে করেই শোনেনি। শেষকালে আবার একদিন বলতে, হাতের কাজ থামিয়ে বিরক্ত চোখে তাকিয়েছিল সুচেতা।

আমি দিতাম না। আমার মাকেও দিতাম না, যা দরকার মা চেয়ে নিত।

তুমি কি এক্সপেক্ট করো আমার মা তোমার কাছে হাত পাতবে?

হাত পাতার প্রশ্ন আসছে কেন! আমিও তো ফ্যামিলির একজন, দরকার হলে আমার কাছে নেবেন। মাকে যদি সব টাকাটা দিয়ে দিই, তাহলে আমাকেও তো দরকার হলে ওঁর কাছে চাইতে হবে, মানে হাত পাততে হবে।

তোমার থেকে মায়ের সম্মান অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সুচেতা। আমি জানি না তুমি কী করে কথাটা বলতে পারলে!

কথাগুলো বলে ঘর থেকে উঠে বারান্দায় চলে গেছিল ঋষি। তারপরে তিনদিন সুচেতার সঙ্গে কথা বলেনি। মা শুনে বলেছিল,

এত সামান্য ব্যাপার নিয়ে ঝামেলা করিস কেন দোলা? না হয় দিয়েই দিলি টাকা। দরকার পড়লে শাশুড়ির কাছেই চাইতে হবে তার কী মানে আছে? তোর বাবার কাছ থেকে নিবি। বাবা তো তোর নামে আলাদা অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিল। সেখানে বলব মাসে মাসে আলাদা করে টাকা রাখতে।

নিজে চাকরি করে বাবার কাছ থেকে টাকা নেবে! ব্যাপারটা প্রায় অবিশ্বাস্য ঠেকেছিল সুচেতার, কিন্তু রোজ অফিস থেকে বাড়ি ফিরে বরের হাঁড়ি মুখ দেখতে কারই বা ভালো লাগে? তাই পরের মাসের প্রথমে স্যালারির টাকাটা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে এনে শাশুড়ির হাতে দিয়ে ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেলেছিল।

কিন্তু মজার ব্যাপার হল, ঝামেলাটা মেটেনি। ঋষি ঝামেলাটা মেটাতে চায়নি। তাই ঠিক আশশেওড়ার লতার মত নতুন নতুন ঝামেলা ক্রমশ তাকে পাকে পাকে বেঁধে ফেলছিল। বাঁধন শক্ত হতে হতে একসময় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল সুচেতার। বাধ্য হল বাঁধন কাটতে। জিনিসপত্র গুছিয়ে ঋষিদের বাড়ির পাট চুকিয়ে তাদের দমদম পার্কের ছিমছাম দোতলা বাড়িতে প্রথম রাতটা কাটিয়েই কিন্তু সুচেতা নিশ্চিত বুঝে গেল যে, সে আর আগের দোলা নয়। যে জায়গাটা ছেড়ে সে লাল বেনারসী পরে ঋষির সঙ্গে গাড়িতে উঠেছিল, সেখানে আর ফিরে আসা যাবে না। জীবনে এই প্রথম সুচেতা অনুভব করল, তার মা-বাবা মেয়ের কারণে সঙ্কুচিত হচ্ছেন, লজ্জিত হচ্ছেন, এড়িয়ে যাচ্ছেন পাড়া-প্রতিবেশী বা আত্মীয়-স্বজনকে।

ঋষি লম্পট নয়। অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক হয়নি। মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে গায়ে হাত তোলেনি কিংবা বমি করে ঘরও ভাসায়নি। শাশুড়ি সুচেতাকে জিন্স পরতে বারণ করতেন না। শ্বশুর একবারও বলেননি চাকরি ছাড়তে হবে। বিয়ের দু'বছর পরেও কেন বাচ্চা হল না, এমন আলোচনাও হতো না ও বাড়িতে। তাহলে কীসের অসুবিধা?

প্রশ্নগুলো তার আর মায়ের মাঝখানে সঙিনের মত মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে টের পায় সুচেতা। বুঝতে পারে সে মানিয়ে নিতে পারেনি। মেয়েদের মানিয়ে নিতে হয়।

বছর দুয়েক পর নীলের সঙ্গে যখন তার সম্পর্কটা আস্তে আস্তে দানা বাঁধছে, ততদিনে ওই কথাগুলো তার মস্তিষ্কের কোষে কোষে কুয়াশার মত ঢুকে পড়েছে। নীলের সঙ্গে তাই সে প্রথম থেকেই মানিয়ে চলে। নীলের ইচ্ছেয় সায় দেয়, তালে তাল মেলায়। নীল চেয়েছিল তারা লিভ-ইন করবে। প্রথমে কিছুদিন একসঙ্গে থেকে বুঝে নেবে পরস্পরকে। তারপর বিয়ে। তারপর সমাজের শিলমোহর নিয়ে একসাথে চলা। লিভ-ইন করার কথা আগে কখনও ভাবেনি সুচেতা, কিন্তু রাজি হয়েছিল। নাহলে যদি নীল সম্পর্ক ভেঙে দিয়ে চলে যায়। অসুবিধা কী আছে? সে তো মোটা মাইনের চাকরি করে। স্বাধীন মহিলা। নিজের খুশি মতো জীবন যাপনের অধিকার তার আছে নিশ্চয়ই। নিজের মনকে বুঝেয়েছিল সুচেতা। মিথ্যে কথা বলেছিল মা-বাবাকে।

রেজিস্ট্রি করে নিয়েছি। নীল এখনই অনুষ্ঠান করতে চাইছে না। চিন্তা কোরো না, কিছুদিনের মধ্যেই করে নেব...।

লিভ-ইন তাঁদের ধারণাতেই নেই। তাই অবিশ্বাস করেননি। ও বাড়িতে গেলে নীলও দিব্যি জামাইয়ের মতই ব্যবহার করে।

ফ্ল্যাটটা বুক করেছিল সুচেতা। নীল উঠে এল সেখানেই। সেটাই তো স্বাভাবিক। একসঙ্গে থাকা হবে তো ঠিক হয়েছে। ফ্ল্যাটের ইএমআই সামলে ইন্টিরিয়র করালো সুচেতা। বসার ঘরে নীলের পছন্দের নীচু ফার্নিচার। সমুদ্রের রঙের শোয়ার ঘর ইচ্ছে ছিল সুচেতার। নীল একটু বেশি রোম্যান্টিক। ওর লাইল্যাক ভালো লাগে। যখন-তখন ফ্রিজ খুলে টুকটাক খেতে ইচ্ছে করে নীলের, তাই ঠান্ডা আলমারি ভর্তি রাখে সুচেতা। সপ্তাহশেষের জন্য বন্ধুদের দিয়ে ডিউটি ফ্রি শপ থেকে আনিয়ে নেয় দামি হুইস্কি। নিজের জামা-কাপড়ের দিকে কোনও খেয়াল থাকে না নীলের। তাই দামি সুতির ব্র্যান্ডেড পোশাক কিনে আনতে হয় সুচেতাকেই। নিজের গাড়ি নিয়ে খুঁতখুতানি আছে। তাই নীলের জন্য একটা আলাদা গাড়ি কিনতে হয়েছে। নাহলে মুখ হাঁড়ি হচ্ছিল নীলের। কারণে-অকারণে মন কষাকষি। তবে গাড়ি আলাদা হলেও পেট্রোল ভরার দায়িত্ব সুচেতার। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। মাইনে মাসে ছয় অঙ্কের। তাও শেষের দিকে হাত খালি হয়ে যায়। জমে না প্রায় কিছুই।

সুচেতার জন্মদিনে উপহার কিনে আনার কথা মনে থাকে না নীলের। একটু ঠোঁট ফুলিয়ে মানিয়ে নেয় সুচেতা। আলমারিতে তুলে রাখা নতুন জামদানি পরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অফিস থেকে ফেরার সময় কিনে আনা কেক কাটে। ফেসবুকে ঝলমলে সুখি দম্পতির ছবি পোস্ট করে নীচে লেখে, সুতোয় বোনা আদর।

নীল একটু মুডি। তার ইমোশন সব সময়ই বেশ চড়া তারে বাঁধা। বিছানায় সুচেতার নগ্ন শরীরটা নিয়ে তার যেমন বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস, তেমনি আবার মেজাজ খারাপ থাকলে সে জের সামলানোও সহজ নয়। প্রথম যেবার রেগে গিয়ে সুচেতার হাত মুচড়ে দিয়েছিল, যতটা না ব্যথা পেয়েছিল, তার থেকেও বেশি অবাক হয়েছিল সুচেতা। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারেনি। নীলের অবশ্য রাগ পড়ে গেছিল একটু পরেই। তারপর বরফ দেওয়া, আয়োডেক্স লাগানো এবং সঙ্গে প্রচুর আদর। চোখে-গলায় চুমুর বন্যা। নীল যে খুবই অনুতপ্ত এটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি সুচেতার। ক্রমশ এটাও বুঝেছে যে, নীলের ভালোবাসার ধরনটাই এরকম। রেগে গেলে গায়ে জিনসপত্র ভাঙা, সুচেতার গালে সপাটে চড় কিংবা চুল টেনে ছিঁড়ে দেওয়া এসব হতেই পারে। আবার রাগ পড়ে গেলেই মাফ চাইবে নীল। তারপর বিছানায় একটা দারুণ সময় কাটাবে তারা দু'জনে। বুঝে গেছিল সুচেতা। মেনে নিয়েছিল। মানিয়ে নিয়েছিল।

কিন্তু এই মানিয়ে নেওয়ার গণ্ডিটা যেন ক্রমশ বাড়ছে। আজকাল বড্ড সহজে রাগ হয়ে যায় নীলের। সুচেতা ব্যথা পেলেও তেমন মাথা ঘামায় না। একেকদিন তো বিছানাতেও কিছুতেই যেন মিটমাট হতে চায় না। কোথাও একটা ফাঁক তৈরি হচ্ছে সন্দেহ হয় সুচেতার। নিয়ম করে তাই রোজ অন্তত দু'জনে মিলে একটা হাসি মুখে, গলা জড়িয়ে সেলফি তোলে। মলে গ্রসারি কিনতে গেলেও ছবি পোস্ট করে ফেসবুকে। শুধু রাতে যখন নীল একটা চুমু পর্যন্ত না খেয়ে উল্টোপাশে ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে, তখন কেমন একটা বুকচাপা ভয় ঘিরে ধরে ওকে। কেন এত খারাপ লাগা নীলের! চলে যাবে না তো তাকে ছেড়ে? আবার একলা হয়ে যাওয়া। আবার মা-বাবার হতাশ মুখ। এবারেও মানিয়ে নিতে পারলি না দোলা!ঘুমন্ত নীলের পিঠের কাছে সরে এসে আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করে সুচেতা।

অফিস থেকে মাঝে মধ্যে ট্যুরে যেতে হয় নীলকে। ইদানিং সেটা বেড়েছে। বাড়ি ফেরার সময় পাল্টে গেছে। সকালে উঠতে হয় বলে সুচেতা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে। নীল আজকাল দশটার আগে ফিরতেই পারে না। ফিরলেও ব্যস্ত থাকে ফোনে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে সুচেতা দেখে বারান্দায় নিচু স্বরে ফোনে কথা বলছে নীল। স্বর

নিচু, কিন্তু ভীষণ একটা নরম গলা, যেমনটা ছিল তাদের শুরুর দিনগুলোতে।

এই সপ্তাহেও ব্যাঙ্গালোর যেতে হবে নীলকে। দু'দিনের ট্যুর। বিকেলের ফ্লাইট। এয়ারপোর্টে গাড়ি রেখে চলে যাবে। নীলের বেরনোর সময়ের কিছুক্ষণ আগে ওদের রাস্তার বাঁকে একটা কালভার্টের আড়ালে চুপ করে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল সুচেতা। নীল বেরোল বেশ কিছুটা পরে। এয়ারপোর্ট নয়, গাড়ি যাচ্ছিল সল্টলেকের দিকে। পিছনে স্টিয়ারিং হাতে সুচেতা। মাঝপথে গাড়িতে উঠল একজন। বেশ নামকরা একটা হোটেলের ভেতরে গাড়ি ঢুকে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে রিসেপশনে খোঁজ নিতে গেল সুচেতা। আন্দাজ ঠিকই ছিল। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস নীল পালিত দু'দিনের জন্য ঘর বুক করেছেন।

হোটেল থেকে বেরিয়ে বেশ কিছুক্ষণ রাস্তায় ঘুরেছে সুচেতা। ক্রমশ রাত গভীর হয়েছে, লোক চলাচল কমেছে। গোটা শহরটা একটু একটু করে তার মতো নিঃসঙ্গ হয়ে উঠেছে। তখন ফিরে এসেছে ফাঁকা ফ্ল্যাটে। তার আগে অবশ্য বিভিন্ন দোকান থেকে মায়ের প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে ঘুমের ওষুধ কিনে নিয়েছে কয়েক ডজন। অন্য কিছু সে পারবে না, নিশ্চিন্ত নিদ্রায় তলিয়ে যাওয়াই সবথেকে সহজ। মানিয়ে নেওয়ার, হেরে যাওয়ার এই খেলায় সে বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। দু'দিন ফিরবে না নীল। গরমকাল। দুদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই পচা গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে। ঘরে সবসময় রুম ফ্রেশনার স্প্রে করে রাখা সুচেতার অভ্যাস। সেই সুবাস ছাপিয়ে পূতিগন্ধে ভরে যাবে ফ্ল্যাটের করিডর, ল্যান্ডিং...।

পোশাক বদলায় সুচেতা। ওষুধের স্ট্রিপ, জলের জাগ সব গুছিয়ে রাখে খাবার টেবিলে। বিছানা ঝেড়ে বালিশ, পাতলা কম্বল সাজিয়ে নেয়। এসি চালিয়ে দেবে, তার আগে শেষবারের মত গিয়ে দাঁড়ায় বারান্দায়। খুব হালকা একটা সুগন্ধ। একটু অবাক হয়ে এগিয়ে যায় কোণের দিকে। টবে পুঁতেছিল স্বর্ণচাঁপার চারা। বাড়েনি তেমন। ফুলও ফোটেনি। ইদানিং আর যত্নও করত না। মনের উথাল-পাথাল সামলে বারান্দার গাছে জল দেওয়া হয়নি কতদিন, কিন্তু কী আশ্চর্য! ফুল ধরেছে একটা। সব পাপড়িগুলো মেলে দিয়ে তাকিয়ে আছে সুচেতার দিকে। ফুলটার ওপর আলতো করে হাত রেখে বুক ভরে সুগন্ধি নিঃশ্বাস নেয় সুচেতা।

কী ব্যাপার সুচি, তুমি ফ্ল্যাটের দরজায় একটা নতুন তালা লাগিয়েছ? চাবিও রেখে যাওনি? আমি ঢুকব কেমন করে?

তোমাকে ঢুকতে দেব না বলেই তো চাবি রেখে যাইনি।

তার মানে! আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেবে না!

বাড়িটা তো আমার নীল, তাই না ? কাকে ঢুকতে দেব, কাকে দেব না, সেটা তো আমি ঠিক করব।

তাই নাকি! হঠাৎ এরকম কথা! তুমি কি ঠিক করেছ আমাকে ঢুকতে দেবে না?

এক্স্যাক্টলি। আমি হায়দরাবাদে একটা ওয়ার্কশপে এসেছি। তোমার মত ব্যাঙ্গালোরে যাওয়ার নাম করে সল্টলেকের হোটেলের ট্যুর নয়। সত্যিকারে ওয়ার্কশপ। তাই ব্যস্ত আছি। আমাকে বিরক্ত কোরো না। সামনের সপ্তাহে ফিরে তোমার যা জিনিসপত্র আছে বার করে কেয়ারটেকারের কাছে রেখে দেব। সময়মত এসে নিয়ে যেও।

লাইনটা কেটে দেয় সুচেতা। কফির কাপে একটা চুমুক দিয়ে ঠিক করে নেয়, রাতে দমদমের বাড়িতে ফোন করে বলে দেবে, নীলের সঙ্গেও সম্পর্কটাও সে ভেঙে দিয়েছে। এবারেও মানিয়ে চলতে পারেনি। এরপর ভবিষ্যতে আর কখনও মানিয়ে চলার চেষ্টাও করবে না। ■

অদিতি সেন চট্টোপাধ্যায়

ভিত

আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপর... তারপর? সদর দরজার লোহার আংটা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে ওপরের দিকে তাকালো সুমনা। দরজার শেডের ওপর থেকে একটা বটগাছের চারা উঁকি দিচ্ছে। তার চারপাশে আরও কয়েকটা অজানা গাছ, ঘাসের মতো লম্বা পাতাওয়ালা। সুমনা আবার ভাবলো মনে মনে, তারপর? এই একশো বছরের পুরনো বাড়িটার ছাদ আর দেওয়াল ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। খুঁড়ে ফেলা হবে মাটির নীচের প্রায় একতলা সমান ভিত। এ বাড়ির দেওয়াল এতো শক্ত, সহজে হাতুড়ি ঠুকে পেরেক পোঁতা যায় না। বাবা গর্ব করে বলতেন, এই একতলা বাড়ির নীচে আরও একতলা আছে। বড় শক্ত সবল ভিত, বুঝলি?

সুমনা মনে মনে বাবার সঙ্গে কথা বলে,—কী হল বাবা? কী হল এত মজবুত ভিত, এতো শক্ত দেওয়াল বানিয়ে? সব তো গুঁড়িয়ে যাবে! তারপর? তারপর কী বানাবে এখানে ওরা? আবাসন? মার্কেট কমপ্লেক্স?

সুমনাদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে বাস চলাচল করে এখন। সেই রাস্তার দুধারেই গা ঘেঁষাঘেঁষি করে তৈরি হয়েছে পরপর সব দোকানঘর। একটাও গৃহস্থ বাড়ি আর দেখা যায় না। যাঁদের এ তল্লাটে বসতবাড়ি ছিল, কবেই তাঁরা সেগুলি প্রোমোটারের হাতে তুলে দিয়ে এখানকার পাট চুকিয়েছেন। তাঁদের সন্তানরা সব দু-তিন দশক আগে জেলা সদরে বা কলকাতায় চাকরি-বাকরি নিয়ে থিতু হয়েছে। সীমান্তবর্তী এই মফস্সল গৃহে মা-বাবাকে তারা কেউউ সে সময়ে একা ফেলে রাখার সাহস পায়নি। এখানে ডাক্তার বলতে ছিলেন ওই স্যান্যালকাকা। ছোটখাটো সাধারণ জ্বর পেটখারাপে স্যান্যালকাকুর কম্পাউন্ডার হরিকাকাই রোগী দেখে ওষুধ দিয়ে দিতেন। যে কোনও অসুখেই একটা গোলাপি রঙের সিরাপের শিশি ছিল বাঁধা। যার গায়ে এক ফালি খাঁজকাটা সাদা কাগজ সেঁটে দিয়ে প্রতিদিনের ডোজ কাগজের সেই দাগ অনুযায়ী বাতলে দিতেন হরিকাকা। ভয়ানক শরীর খারাপ হলে আঠারো কিলোমিটার দূরের কৃষ্ণনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যেতে শুধু ভ্যানরিক্সা সম্বল ছিল। এখনও সেই ভ্যানরিক্সা আছে, তবে তাতে মোটর লাগানো হয়েছে। আর হয়েছে টুকটুক, ব্যাটারি চালিত তিন চাকার যান। সুমনাদের ছেলেবেলায় ওরা দেখেছে, কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে, খুব রাতবিরেত না হলে প্রবীরজ্যাঠার গাড়িটা পাওয়া যেত। সারা গ্রামের মধ্যে কাঠের ব্যবসায়ী প্রবীরজ্যাঠারই শুধু একটা অ্যাম্বাসেডর ছিল। চোরাচালান আর মাদকের ব্যবসা রমরমিয়ে চলত এই সব অঞ্চলে। দু-একটা বোমাবাজি,

মাঝেমধ্যেই খুনটুন এখানকার বাসিন্দাদের রোজনামচায় খুব সরল স্বাভাবিকভাবে যোগ হয়ে গেছিল যেন। একটা মেয়েদের স্কুল, একটা ছেলেদের স্কুল আর মাদ্রাসা একটা—সবই বারো ক্লাস পর্যন্ত। তারপর কলেজে পড়তে হলে সেই ওদিকে কৃষ্ণনগর বা এদিকে বেলডাঙা যেতে হতো। কেউ কেউ বহরমপুর যেত, মেসে বা হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করতো। এখন তো কলেজ হয়েছে একটা, স্টেশনের কাছেই। বাড়ি আসার পথেই দেখেছে সুমনা। চকচকে কালোপিচের স্টেশন রোডের দুধারে চারটে এটিএম, ঝাঁ-চকচকে দুটি আবাসন, একটি মার্কেট কমপ্লেক্স দেখতে দেখতে গাড়িতে আসছিল সুমনা। আর ভাবছিল, গত তিন দশকে আমুল পালটে গেছে জায়গাটা। সেই মাটির রাস্তায় ধুলো ওড়ানো গরুর গাড়ি, রাস্তার দুধারের বুনো ঝোপঝাড়, বাতাসে হঠাৎ ভেসে আসা অচেনা ফুলপাতার গন্ধ—কিচ্ছু আর নেই। কাঁচা রাস্তার মাটির গন্ধ আর সেই রাস্তায় পড়ে থাকা গোবরের গন্ধের জন্য প্রাণটা আকুলি বিকুলি করে উঠলো সুমনার। কিন্তু বাতাসে পোড়া মোবিলের গন্ধ পেল শুধু।

বাসরাস্তার ধারে সুমনাদের বাড়িটাই শুধু হাড়-পাঁজরা বের করে দাঁড়িয়ে আছে। এপাশ ওপাশ থেকে দোকানঘরগুলো অনেকটাই চেপে দিয়েছে বাড়িটাকে। বাড়ির দুপাশে অনেকটা করে জমি ছেড়ে রেখেছিলেন বাবা। সেখানে সুপুরি, নারকেল, খেজুর, আম, লিচু, পেয়ারার গাছ লাগিয়েছিলেন। বাড়ির পিছনের দিকে উঠোন লাগোয়া পুকুর কাটিয়েছিলেন। সেই বাগান আর পুকুরের আশি শতাংশই গত দশবছর ধরে একটু একটু করে বেদখল হয়ে গেছে। আমেরিকায় বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর এ বাড়িতে আর আসা হয়নি তার। যতবার সুমনারা ভারতে এসেছে, মা-বাবাই সে কদিন তাদের কলকাতার ফ্ল্যাটে গিয়ে থেকে এসেছেন আর একবার আমেরিকায় গিয়ে ঘুরে এসেছেন মেয়ের কাছে, নাতি হওয়ার পর। কিন্তু এ বাড়ি ছেড়ে আজীবন ঠাঁইনাড়া হননি। কত যে ঝগড়াঝাটি করেছে সুমনা এই নিয়ে, কতবার! এইসব জমি পুনরুদ্ধার করার জন্য একা লড়াই করা, তাও আবার বিদেশে বসে, সম্ভব নয় সুমনার পক্ষে। তাই বাড়িটা এখন বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও। নইলে, ক'বছর পর এটুকুও আর থাকবে না।

সদর দরজার লোহার আংটাটা ধরে নাড়ালো সুমনা। একটু অপেক্ষা করার পর বাবু এসে দরজা খুলে দিল। সুমনাকে দেখে একগাল হেসে বললো-আসুন, পিসি!

চৌকাঠ পেরিয়ে উঠোনে পা রাখতেই সমস্ত শরীর যেন নিঝুম হয়ে এলো সুমনার। মায়ের হাতে তৈরি তুলসীমঞ্চে আলপনা দিয়ে ঝারা বাঁধা হয়েছে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি যেন মা স্নান সেরে উঠে ঝারায় জল দিয়ে গেছেন। ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে ঝারা বেয়ে তুলসীগাছের ওপর। ধীর পায়ে এগিয়ে পায়ের চটি খুলে গড় হয়ে বসে আলপনার ওপর মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলো সুমনা। সমস্ত শরীর ঝেঁপে দমকা কান্না এলো একটা। কেঁপে কেঁপে উঠলো সুমনা কান্নার সেই দমকে। তখনই পিঠের ওপর হাত রাখলো কেউ। চোখ বন্ধ রেখেও সুমনা চিনতে পারলো সেই স্নেহ স্পর্শ গৌরাঙ্গ পিসির। কান্নার দমক আরও বাড়িয়ে বসে থাকা অবস্থাতেই পিছন ফিরে গৌরাঙ্গ পিসির হাঁটু জড়িয়ে ধরল সুমনা। গৌরাঙ্গ পিসি কিচ্ছু বললেন না। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদতে দিলেন সুমনাকে। একসময় কান্নার বেগ স্তিমিত হয়ে আসলে সুমনা উঠে দাঁড়ালো। সদর দরজার পাশেই কাঠগোলাপ গাছের দিকে তাকালো। দুপুরবেলা মায়ের চোখ একটু লেগে আসলেই এই গাছ বেয়ে উঠে সুমনা চড়ে বসতো দরজার শেডের ওপর। সেই গাছে বাসা বেঁধেছিল কাঠবেড়ালি টুসি। সে সারা দুপুর এ ডালে সে ডালে দৌড়ে বেড়াতো, আর সুমনা অনর্গল বকে যেত টুসির সাথে। মনে পড়তেই ঠোঁটের কোণে একটা হাসির ঢেউ খেলে গেল সুমনার। সেই ঝাঁকড়া চুলের টেপফ্রক পরা শৈশবের সুমনাকে পঞ্চাশোর্ধ সুমনা দেখতে পেলো আজকের ফাটাফুটি গাছ গজানো শেডের ওপর বসে পা দোলাতে। খিড়কি দোরের পাশে থোকা টগরের

গাছে প্রচুর ফুল এসেছে। তার পাশেই অতসী গাছ। ও বলতো ঝুমঝুমি গাছ, ঝুমঝুম করে বাজাতো অতসীর শুকনো ফল। গৌরাঙ্গ পিসি সুমনার বাঁহাত ধরে আছেন নিজের বাঁহাতে। ডানহাত সুমনার পিঠে। খিড়কি দরজা দিয়ে উঁকি মারছে পুকুর। এই গরমেও টলটলে জলের গন্ধ নাকে এসে লাগলো। খুব আরামে ঘুম এসে গেল সুমনার। পিসি আস্তে করে বললেন, 'ঘরে চলো'। ঘরে চলো শুনেই ভয় পেয়ে গেল সুমনা। ও ভাবলো, এতো স্মৃতির ভার সহ্য হবে না ওর। সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠলো আবার। পিসিকে জড়িয়ে ধরলো। পিসির সাদা নরম শাড়ির গন্ধ নিল প্রাণ ভরে। তুলসী মঞ্চের ওপর ঝুঁকে তুলসীমঞ্জরির গন্ধ নিল। পিসিকে প্রণাম করলো এই এতক্ষণ পর। পিসির নাতি সদ্য গোঁফ ওঠা বাবুকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকলো। ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ওর মাথায় চুমু খেল একটা। তারপর দু'হাতে দুজনকে ধরে বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে উঠে বারান্দায় রাখা কাঠের চেয়ারে বসলো। পিসির বউমা রমা এতক্ষণ বারান্দা থেকে নামেনি। সুমনার থেকে বয়সে অনেকটাই ছোট রমা। পিসির ছেলে লালুদা ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেছিল যখন, এই বাবুর বয়স তখন সাতমাস। আর গৌরাঙ্গ পিসি, বাবার অনেক দূর সম্পর্কের বোন, যখন বিধবা হয়ে এ বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, লালুদার বয়স তখন ছিল পাঁচ বছর আর সুমনার তিন। রমা কাঁসার গ্লাসে মিছরির সরবত এনে দিল। সুমনা গ্লাসটা হাতে নিয়ে ঢকঢক করে খেয়ে ফেললো সরবতটা। সমস্ত শরীর বলে উঠল— আহ্!

রমার চেহারার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। তেমনই মিষ্টি গোলপানা মুখ। একঢাল চুলে এলোখোঁপা বাঁধা। কালো গভীর চোখে সারল্যের সঙ্গে মিশে আছে শান্তি। সুমনা খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলো রমার মুখের দিকে। রমার এই সরল মুখখানি তাকে বিড়ম্বিত করতে থাকলো। ও গৌরাঙ্গ পিসির দিকে তাকালো এবার। কঠিন কঠোর একটা মুখ, অথচ বাৎসল্যের অভাব নেই। পিসি যেন তাঁর এই কাঠিন্যটুকু দিয়ে রমার সারল্যকে আগলে রেখেছেন। সংসারে কোথাও এতটুকু বাড়তি কিছু না থেকেও যে শান্তির অভাব ঘটেনি, তা যেন এই কাঠিন্যটুকুর অর্গলের জন্যই। সুমনা, রমার হাতে গ্লাসটা ফেরত দিতে গিয়ে, ওর হাতটা ধরে থাকলো কিছুক্ষণ। যেন ওর ভেতরের শান্তিটা নিজের মধ্যে শুষে নিতে চাইল একটু। রমা মিষ্টি হেসে বললো, 'পুকুরে জাল ফেলিয়ে আজ বড় রুই ধরেছি, ঠাকুরঝি! আপনার প্রিয় দইরুই রান্না করেছেন মা আজ নিজের হাতে! আপনি আসবেন শুনে দেশি মুরগি রান্না করে দিয়ে গেছে নাসিরের দাদি। বলে, মেয়েটা আমার হাতের মুরগির ঝোল খুব ভালোবাসে।' সুমনা বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠল প্রায় চেয়ার থেকে, 'নাসিরের দাদি বেঁচে আছে?' পিসি বললেন, 'হ্যাঁ রে। নব্বুই হল প্রায়। পিঠ বেঁকে ধনুক হয়ে গেছে। শ্বাসের কষ্ট হয় আজকাল। আমি তো খুব বকলাম। বললাম, এই শরীরে তুমি রান্না করেছ নূরদিদি? শুনে বুড়ি একগাল ফোকলা দাঁতের হাসি হেসে চলে গেল। যেতে যেতে বলে গেল, 'আমার রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী মেয়েটা আসছে গো গৌর! বিকালে আসব আমি, বলে রেখো তাকে।'

সুমনা কেমন যেন গলে যেতে থাকলো। ওর মনে হল, এতো ভালোবাসা তার সহ্য হচ্ছে না। সে তো এই স্নেহগুলো ভুলে গেছিল! ওর মনে হল, ও কিছুতেই বর্তমানে ফিরতে পারছে না। তার কিশোরীবেলা এখানে, এই বাড়িতে, এই পাড়ায়, এই নূরদাদি, এই গৌরাঙ্গপিসির আঁচলে থেমে আছে। এক্ষুনি যেন তার দুই গালের পাশ দিয়ে লাল ফিতে বাঁধা দুটো বিনুনি নেমে আসবে। উঠোনে খোলামকুচি দিয়ে ঘর কেটে এক্কাদোক্কা খেলতে নামবে সে।

বাবু এসে হাত ধরে বললো, 'পিসি, আমার ঘরে চলেন। আপনার দেওয়া কম্পিউটার দেখবেন, চলেন না, পিসি!'

'চল, চল। তোর ঘর দেখি।'

এই ঘরেই গৌরাঙ্গপিসি আর লালুদা এসে উঠেছিল।

এই ঘরে ছোটবেলার অনেকটা সময় কেটেছে সুমনার। মা স্কুল থেকে ফেরার আগে পর্যন্ত এই ঘরেই বেশিরভাগ সময় কাটতো তার। এখন বাবু আর রমা থাকে এ ঘরে। সুমনার কিনে দেওয়া কম্পিউটার সুমনাকে দেখাতে পেরে বাবুর চোখেমুখে খুশি উপচে পড়ছে যেন। রমা এসে বললো, 'ঠাকুরঝি, হাতমুখ ধুয়ে নেন। শাড়ি ছাড়বেন? মা এই শাড়িটা দিলেন, যদি পরেন।'

'না গো, এইমাত্র আবার বেরোতে হবে। দুলালের সঙ্গে পঞ্চায়েত অফিস যাব। অল্প খেয়েই বেরিয়ে যাবো।' দুপুরে অনেকদিন ভাত খাওয়ার অভ্যেস নেই সুমনার। সেটা বলতে গিয়েও বলল না। ঠাকুরদার আমলের সেগুন কাঠের ডাইনিং টেবিলে কাঁসার থালাবাটিতে খাবার বেড়েছে গৌরাঙ্গপিসি। মোবাইল বের করে সে সবের ছবি তুলতে ভারি লজ্জা লাগল যেন সুমনার। জিজ্ঞেস করল, 'এ কী, আমি একা খাব নাকি? তোমরা খাবে না?' রমা হেসে বলল, 'আমাদের আজ নীলের উপোষ তো! সন্ধেবেলায় বাবার মাথায় জল ঢেলে প্রসাদ খাব। বাবু আপনার সঙ্গে বসতে লজ্জা পাচ্ছে। আর তাছাড়া বেলা দু'টোর আগে ও খেতেই চায় না।'

সুমনা লজ্জায় গুটিয়ে গেল একেবারে। 'উপোষ রেখে আমার জন্য মাছ রান্না করেছ, পিসি! ছিঃ ছিঃ, আমি একদম জানতাম না, আজ নীলষষ্ঠী! তাই তুলসী গাছে ঝারা বেঁধেছ, না? মা বাঁধতেন, চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন।'

'হ্যাঁ রে। তোর মায়ের শেখানো সব রীতি পালন করি। আর, তুই লজ্জা পাচ্ছিস কেন এতো? দ্যাখো মেয়ের কান্ড! বাবুর জন্য আমরা রাঁধতাম না? দ্যাখ খেয়ে, তোর মায়ের মতো হয়েছে কিনা। বৌদি হাতে ধরে রান্না শিখিয়েছিলেন আমায়, জানিস তো? অতো শিক্ষিত, অথচ কী যে নরম মনের মিষ্টি এক মানুষ, অমন আর এ জীবনে দুটি দেখলাম না। খা মা, খেয়ে দ্যাখ।'

সুমনা সব খাবার একটু একটু করে নিয়ে খেল। ওর খাওয়া দেখে পিসি যেন হাহাকার করে উঠলেন, 'এই পাখির খাবার খাস তুই? কী কাণ্ড!'

খেয়ে উঠে বারান্দার কোণায় হাত ধুয়ে উঠতেই বারান্দার ওপারে চোখে পড়লো মায়ের ঠাকুরঘর। মায়ের গোপাল। এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল দরজার বাইরে থেকেই। এর পাশেই মা-বাবার ঘর। তার পাশের ঘরটা সুমনার। বাবু ছুটে এসে শেকল খুলে দিল, 'দ্যাখেন, পিসি! আপনাদের ঘর দ্যাখেন। মা আর ঠাকুমা রোজ এই ঘরগুলো গুছিয়ে রাখে।' ঘর! ঘরের বাইরে চৌকাঠ। সে চৌকাঠে গেঁথে গেছে সুমনার পা। মা-বাবার খাট, সে খাটে মায়ের হাতের ফুলতোলা সেই সাদা চাদরটা পাতা। খাটের পাশের টেবিলে মায়ের হাতের ফুলতোলা টেবিলক্লথ। কাঠের আলমারিতে মায়ের শাড়ি, বাবার পাজামা-পাঞ্জাবি থাক থাক করে রাখা। ড্রেসিং টেবিলে পাউডারের কেস, চিরুনি! রূপোর সিঁদুর কৌটোটি অবধি অবিকল আগের মতো রাখা আছে। যেন এক্ষুনি মা স্নান সেরে এসে চুল আঁচড়ে সিঁদুর পরে গেছেন। যেন এইমাত্র বাবা আলমারির পাল্লাদুটো খুলে মাকে জিজ্ঞেস করবেন, 'হ্যাঁ গো, শুনছ! বিকেলে আজ কোন পাঞ্জাবিটা পরবো?' সুমনার আর সাহস নেই, ওর নিজের ঘরে উঁকি দেওয়ার। ও বুঝে গেছে, গৌরাঙ্গ পিসি এ বাড়ি থেকে কাউকে যেতে দেয়নি। ওর ঘরের খাটে, বইয়ের তাকে, পড়ার টেবিলে, খাটের একপাশে রাখা হারমোনিয়ামে, ঘরের কোণে দাঁড় করানো তানপুরায় প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াচ্ছে আঠারোর সুমনা। এ বাড়ি সেই সুমনার মা-বাবার বাড়ি। এই বাড়ি তার নয়।

'পিসি, আপনার ফোন বাজছে!'

দুলালের ফোন। ফোন ধরল সুমনা। দুলাল বলছে, 'দিদি, সব কাজ হয়ে গেছে। সবার সাথে কথা বলে নিয়েছি। পঞ্চায়েত অফিস থেকে ওয়ারিশন সার্টিফিকেটটা তুলে নিয়ে একেবারে প্রোমোটারের পার্টির সঙ্গে...।' পুরোটা না শুনেই সুমনা বললো, 'রং নাম্বার। আপনি ভুল লোককে ফোন করেছেন।' তারপর কল কেটে দিয়ে সুইচ অফ করে দিল মোবাইলটা। ■

অমৃতা মুখার্জি

পুনরাবর্তন

দুপুরবেলা কেউ দেশ থেকে ফোন করে না। যদি করে বুকের ভেতরটা এখনো কেঁপে ওঠে। তিরিশ বছর হয়ে গেল আটলান্টিক পেরোবার পর।

তবু দুঃসংবাদরা আজও পথ করে নেয়। পরিবার, বন্ধু, পাড়ার লোক, সোনা বৌদি, এক-একটা পাতা জীবনের সোনালি দিনের অজড়, অমর, অক্ষয় বটগাছ থেকে নিরালা ঘুঘু ডাকা দুপুরে ঝরে পড়ে। কেউ শুনতে পায় না পড়ার আওয়াজ। কিন্তু বুকের ভেতর রক্ত পড়ে। ছেড়ে আসা সম্পর্ক, স্মৃতি আর মায়ার তারগুলো কে যেন টানটান করে বাঁধে। আবার অদেখা ভায়োলিন কান্না ছড়ায়।

বুবুর ফোন। স্কুলের বন্ধু প্লাস কী রকম যেন দূর সম্পর্কের আত্মীয় হতো। যোগাযোগটা থেকেই গেছে।

'কী রে, কী ব্যাপার? তোদের তো গভীর রাত! পিসিমা ঠিক আছে তো?'

'মা ঠিক আছে, তবে বাকি সব লন্ডভন্ড রে, ভয়ঙ্কর অবস্থা।'

'কী হয়েছে রে?'

'পুটুদিকে রাখা যাচ্ছে না রে, বার বার ফেইন্ট করে যাচ্ছে। নিজের হাতে নিজে কামড়ে রক্ত বের করে ফেলেছে, লোকাল ডাক্তার এসে ইঞ্জেকশন, ফিনোবার্বিটল সবই দিয়েছে। তবু আমার ভালো ঠেকছে না। তাই তোকে ফোন করলাম।'

'বলিস কী? এতটা বাড়াবাড়ি তো আগে কখনও হয়নি। ওষুধ বন্ধ করে দিয়েছিল নাকি?'

"না না! সেসব কিছু নয়। ফিটের ওষুধ তো নিয়ম করেই খায়। এখন সেলফোন হয়ে সুবিধা হয়েছে। অ্যালার্ম দেওয়া আছে। ভুলবার কোন সিন-ই নেই।'

'তবে?'

'আর বলিস কেন? সায়ন তো ওইভাবে অকালে চলে গেল। কেনই যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হতে একটা গড ফরবিডেন জায়গাতে গিয়েছিল! ঠান্ডা, বরফ পুকুরের জলে সারারাত চুবিয়ে হারামজাদা সিনিয়ররা মেরে ফেলল। বলল, সাঁতার জানত না, মদ খেয়ে ডুবে গেছে। সেই থেকেই তো পুটুদির এরকম হয়। ভাইটুদাও মারা গেছে গত বছর। একদম একা। নেহাত ওপর তলায় আমরা থাকি। পুটুদিকে তো আর ভাড়াটে বলে জানিনি কোনওদিন। কোলেপিঠে করে আমাদের সবাইকে মানুষ করেছে। আমরাই ওর আত্মীয় এখন।'

তিতাস শুনছিল। কিন্তু চোখের সামনে ভাসছিল বুবুদের ঢালাই করা, রোদ ঝলমল, নারকেল পাতা ছাওয়া

স্বপ্নের ছাদটার কথা। যেখানে কেটেছে ছোটবেলার তুমুল হই-হল্লার দিনগুলো। রে রে করে লাল, নীল, পেটকাটি চাঁদিয়াল ঘুড়ি নিয়ে, কাচের চুড়ি গুঁড়ো করে, মোম,আঠা দিয়ে মাঞ্জা লাগিয়ে বন্ধুরা মিলে ঝাঁপিয়ে পড়া পাশের বাড়ির ইকবালদের ঘুড়িগুলোর ওপরে। লাটাই ধরে থাকতো কোমরে বাসন্তী রঙের শাড়ির আঁচল গোঁজা এক সদা হাস্যময়ী তরুণী। যাকে দূর থেকে অনেকটা চিতচোরের জারিনা ওয়াহাবের মত লাগত। এইসব উদ্ভট কাজে পুটুদির জুড়ি ছিল না। ঘুড়ির মাঞ্জা, কয়েতবেলের আচার, লুকিয়ে লুকিয়ে চ্যাপলিনে 'গন উইথ দ্য উইন্ড', রথের মেলায় গিয়ে হারিয়ে যাওয়া, তারপর ঝুম বৃষ্টিতে ভিজে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফেরা। পুটুদি হাসলে গজদাঁত দেখা যেত, সব রকম দুষ্টুমির লুকনো আভাস নিয়ে। মা আর বনি পিসিমার বকাবকি, নালিশ অগ্রাহ্য করে বুবু, তিতাস, রন্টু, মিতুদের প্রচুর আদরে বাঁদর করার সব দোষ আর দায় নিতে নিতে সে বাড়ির লোক হয়ে গেছিল কখন যেন। সে যে নিজের দিদি নয়, সামান্য ভাড়াটে একথা কারও মনে ছিল না।

বুবুর গলায় একটা অচেনা ভয় কথা বলছিল।

'কী করি বল তো? তিনকুলে তো শালা কেউ নেই। এত রাতে, কাকে খবর দেব? হাসপাতালে ট্রান্সফার করি?'

'করতেই পারিস। সেটাই সেফ হবে সবচেয়ে। এদেশে আমরা চেষ্টা করি আটিভান, তোরা যেটাকে ভ্যালিয়াম বলিস সেটা দিয়ে। তবে টোনিক, ক্লোনিক জার্কিং বা আদার্স কমপ্লিকেশন্স থাকলে বেশিরভাগই নাইন ওয়ান ওয়ান কল করে আম্বুলেন্স ডাকতে হয়। কিছু কি আন ইউসুয়াল ইন্সিডেন্ট হয়েছিল? কোনও ট্রমা বা শক? নাকি কোনও শারীরিক অসুস্থতা চলছিল?'

'আর বলিস কেন! এদেশে তো থাকিস না, মিডিয়ার চরকিবাজিতে জিনা হারাম করে দিচ্ছে আজকাল। টিভি দেখছিল মার সঙ্গে বসে। নিউজে দেখাচ্ছিল যে, কসবার কোনও কলেজে এক ছাত্রকে নাকি সেক্সুয়ালি হ্যারাস করে, মারধোর করে, ছাদের ওপর থেকে ফেলে দিয়েছে। স্পট ডেড। কিন্তু আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা হচ্ছে। এত ভয়ঙ্করভাবে ডিটেলে এসব বডি-ফডি দেখাচ্ছিল। হঠাৎ গোঁ গোঁ করে পুটুদি মাটিতে পড়ে গেল। ব্যস, তারপর এই হুলস্থুল।'

'কসবার কলেজের এত বাড়? বলিস কী?'

'তিতুমির, জাস্ট চেপে যা, আর চাখাসনি। সাতকান্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার হিরোইন? আসিসনি তো অনেক দিন, এলে পালটি খেয়ে যাবি! ওই কসবার ঠেকে যা গাঁজা আর চরস চলে, সে খেলে তোর শিকাগোর গ্যাং হামাগুড়ি দেবে। লেখাপড়া কী হয় কে জানে, হোস্টেল একটি হলোকস্ট চেম্বার। টর্চার সেল। সিনিয়র দাদা-দিদিরা মেদিনীপুরের মফস্সলিদের ওপর হিটলারি প্র্যাক্টিস করে। জামাকাপড় খুলিয়ে, গায়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়ে নবীন বোকাদের মানুষ করার মহান কাজ নিয়েছে তারা। বছর বছর ফেল করে তারাই হোস্টেলের আসল বাসিন্দা।'

'সে কী রে? পুলিশ, আডমিনিস্ট্রেশন কিছু করে না?'

'হাসালি মাইরি। এসব তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা দেওয়ার সময় আছে নাকি তাদের? আর মাথা দিলে পার্টির দাদারা এসে হোক কলরব বলে ঘেরাও করে, জল না দিয়ে, বাথরুম আটকে আন্দোলনের ফোয়ারা ছুটিয়ে দেবে! সে আর এক তামাশা! ছাড়! তিরিশ বছর আগে কেটে পড়েছিস, বেঁচে গেছিস, এসব বুঝবি না, থাকলে আমাদের মত রোজ কেঁচো হয়ে বুকে হাঁটতে হতো। হাসপাতালেই দিচ্ছি তাহলে।'

'সিটি নার্সিং-এ আমার এক পুরনো বন্ধু আছে। কন্ট্যাক্টটা হোয়াটস অ্যাপ করছি। ইন কেস যদি লাগে! আর টাকা পয়সা যা লাগে আমায় বলিস। ডোন্ট ওরি, ওকে?'

'কেন? আমরা কি মরেছি নাকি? ডলারের গরম দেখাসনি রে তিতুমির! তবে তোর দিল এখনও গরম আছে দেখে ভালো লাগছে। চল আমি তোকে আপডেট

করব।'

বুবু ফোন রেখে দেওয়ার পর চারিদিকটা খুব নিঃস্তব্ধ হয়ে গেল। তিতাসের বুকের মধ্যে কেমন ফাঁকা একটা গর্ত হয়ে যাচ্ছিল। এতদিন হয়ে গেছে? এত পালটে গেছে সব কিছু? দেশে গেলে সে কি বটু হয়ে যাবে? শান্তিনিকেতনে বোকা টুরিস্টদের বটু বলা হতো। তিতাস আর বুবুর ছাড়াছাড়ি উচ্চ মাধ্যমিকের পর। বুবু কলকাতায় থেকে গেল। তিতাস গেল বিশ্বভারতীতে। বায়োকেমিস্ট্রি পড়ার সুযোগ ছিল। তাছাড়া মা-ও সিউড়িতে ট্রান্সফার হলেন। ছুটি-ছাটায় চট করে বাড়ি যাওয়ার সুবিধা। সে অবশ্য ভালো হোস্টেল পেয়েছিল অনেক পরে। সে খুব সাহসী হলেও ছলবলে ছিল না। আর রাজনীতি থেকেও দূরে থাকত। প্রিয়াঙ্কা হোস্টেলে সিট পেতে তাকে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

নার্স এসে ডাকল। রুগি রেডি। আজ বেশ কয়েকটা প্যাপ স্মিয়ার করতে হবে। গাইনোকোলজি তার স্পেশালিটি নয়। কিন্তু সে এই ছোটখাটো প্রসিডিওরগুলো করে দেয়। রুগিদের ঘোরান্তি ভোগান্তি কম হয় আর তারও হাতের প্র্যাক্টিসটা থাকে। সে পা চালালো। এক্সাম টেবিলে রোগিনী শুয়ে আছে পা স্টিরাপের ওপর। গ্লাভস পরে সে জেল লাগিয়ে নিল প্রথম দুটো আঙুলে। সাবধানে অরিফিস এনলার্জ করে অন্য হাতে স্পেকুলাম ঢোকাতেই একটা তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধের সঙ্গে আঠালো সবজেটে ডিসচার্জ দেখা গেল। যা সন্দেহ করেছিল তাই। সব হয়ে গেলে রোগিনী ভিতু ভিতু মুখে হাসল।

'ইস এভরিথিং অলরাইট ডক্টর?'

'ইয়েস, হোপফুলি! কালচার করতে পাঠাচ্ছি। আর প্রিকোশন হিসাবে পেনিসিলিন ইঞ্জেকশনও দিয়ে দিলাম। নো মোর সেক্স উইদাউট প্রোটেকশন। গনোরিয়া ইস নট ফান। আর তোমার বয়ফ্রেন্ডকেও কাল এনো। ওকেও একটা ইঞ্জেকশন দিতে হবে।'

মেয়েটির হাসি কৃতজ্ঞতায় ভিজে গেল।

'আই হ্যাভ সামথিং স্মল গিফট ফর ইউ।'

একটা ছোট কী রিং, তাতে একটা ছোট সবুজ হাসকুটে ফ্রগের ট্যাগ।

আরে না না, এসবের কী দরকার? সো সুইট অফ ইউ দো!

'ইউ মাস্ট টেক ইট, ইন মাই কালচার ফ্রগ ব্রিংস ইউ কারেজ, ইউ আর সো ব্রেভ এন্ড বিউটিফুল!'

বোঝো! ব্যাঙের এত মহিমা কে জানত? এরপর আর না করা যায় না।

বাড়ি ফেরার পথে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। তিতাস বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। হাত সরে যাচ্ছিল স্টিয়ারিং থেকে। সবুজ ব্যাঙটা টানছে। কী যেন একটা মনে পড়ছে। ঘষা কাচের ওপার থেকে একটা আবছা গল্প উঠে আসছে। কবে যেন? ব্যাঙ নিয়ে কী যেন হয়েছিল? প্রাণপণে স্মৃতি হাতড়াচ্ছিল সে।

নাঃ, মনে পড়ছে না। বায়োলজির ডিসেকশন ক্লাসে কি? না তো। এই সব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে সে বাড়ি ঢুকল। যথারীতি তারস্বরে টিভি চলছে। চারিদিকে ভেজা টাওয়াল, জুতো, এঁটো বাসন, খোলা বই, ল্যাপটপ, কোকের বোতল, কুকুর লাফাচ্ছে। চির চেনা যুদ্ধক্ষেত্র। মেয়েকে গলা ফাটিয়ে না বললে শুনতে পাচ্ছে না, কানে হেডফোন। কয়েক ঘণ্টা পরে সে সন্ধে বেলার ঢোলা জামা পরে নিউজ শুনছিল। হাতে ল্যাপটপ। অনেকগুলো চার্ট এখনও বাকি। আচমকা মিহির বলল, "জানো, রতু আজ একটা স্ট্রেঞ্জ ভিডিও পাঠিয়েছে। তোমাদের কলকাতায় কসবা না কী একটা জায়গায় নাকি খুব টেনশন চলছে, ছাত্র খুন হয়েছে, তোমাদের সেই শ্রীমন্তীদি খুব সেনসেশনাল কভারেজ দিয়েছে।'

তিতাস ধড়মড় করে উঠে বসল।

'কই দেখাও তো! শ্রীমন্তীদি? মানে সেই প্রিয়ঙ্কা হোস্টেলের?'

'আরে হ্যাঁ রে বাবা! তিনিই এখন খুব নাম করেছেন। কোন একটা বড় কাগজে লেখেন।'

তিতাস হাঁ করে দেখছিল। সেই শ্রীমন্তীদি! ছোটখাটো, বেশ পুতুল পুতুল চেহারা দেখে যে কেউ ভুল করবে। সারা হোস্টেলে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত ওর কথায়। তার একটি বাহিনী ছিল। যারা প্রায় জেকিল অ্যান্ড হাইডের মত দিনে রাতে চেহারা পালটে চমক লাগিয়ে দিতে পারত। হোস্টেলের সুপার জিনিদি পর্যন্ত এদের সমীহ করে চলতেন। যে কোনও মেয়েকে দিয়ে যা খুশি করানোর বা তাকে অকথ্য অপমান করে সবার সামনে নৌটংকি বানিয়ে দেওয়ার খেলাটা খুব সফিস্টিকেটলি খেলতেন এরা। মিহিরের পাঠানো ভিডিও-তে বেশ হাত-পা নেড়ে নেড়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করছিল শ্রীমন্তীদি। একটু চুলে পাক ধরেছে, গালের চামড়া ঝুলে গেছে। তবু চেনা যায়। জ্বালাময়ী ভাষণ। এই অন্যায়, অত্যাচার মেনে নেওয়া হবে না। প্রশাসনকে জবাবদিহি করতেই হবে। এ আমাদের সম্মানের লড়াই। আমরা দুর্নীতির কালো হাত ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব...।

তিতাস সোফায় ঘুরে বসতে গিয়ে পায়ের নীচে কী যেন ফুটে গেল। সেই চাবির রিংটা। সবুজ একটা ব্যাঙ। বিদ্যুতের মতো মাথার মধ্যে যেন সশব্দে বাজ পড়ল।

হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে যেন মনের জানালাটা উল্টোপাল্টা হয়ে দড়াম করে খুলে গেল। মনে পড়েছে। মনে পড়ে গেছে।

সেদিন ছিল ফাইনাল পরীক্ষার আগের দিন। প্রিয়াঙ্কা হোস্টেলের শেষ ঘরটাই পড়েছিল তিতাস আর তার দুই রুমমেটের ভাগ্যে। ওরা রাত জেগে পড়ছিল। হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল। বাইরে হালকা বৃষ্টি পড়ছিল। সঙ্গে মেঘের গুরুগুরু। ওদের ঘরের পাশেই চারুকলা বিভাগের ছেলেদের হোস্টেল। হল্লাটা যেন একটু বেশিই হচ্ছিল সেদিন। অন্যদিন মন্দ লাগে না ওদের ভাঙা গলার বেসুরো গান। কিন্তু পরীক্ষার আগের রাতে মনে হয় কানে যেন কেউ বিষ ঢালছে। রানীগঞ্জের মেয়ে বীণাই আগে উঠল। আলো চলে গেছে, লণ্ঠন জ্বালাতে হবে। তিতাস পা-টা বাড়িয়েছে খাট থেকে নামার জন্য। হঠাৎ নিকষ কালো জানালা ভেদ করে ঠপাস করে একটা কাগজের ভারী ঠোঙা এসে পড়ল বিছানার ওপর। রোমি তখনও শুয়ে ছিল। সে আর্তনাদ করে উঠল, 'ও মাগো ! কী রে? মাগো আমার গায়ে কী রে? কিলবিল করছে।'

দপ করে ঘরে আলো জ্বলে উঠল। কারেন্ট ফিরে এল সেই অদ্ভুত মুহূর্তে।

ভয়ে বিস্ময়ে আতঙ্কে কাঠ হয়ে গিয়ে ওরা দেখল ওদের বিছানার ওপর একটা নোংরা ভেজা বাদামি কাগজের মোড়ক ছিঁড়ে কিলবিল করে বেড়িয়ে আসছে বড় বড় কতগুলো গুটিওয়ালা কোলা ব্যাং। দূরে কারা যেন দৌড়ে পালাচ্ছিল। হা হা করে হাসছিল।

'মামণিরা শুয়ে পড়ো, আর পড়তে নেই।'

চারুকলা বিভাগের অধ্যক্ষের অফিসে ওরা তিনজন বসেছিল। অধ্যক্ষের চেহারা সৌম্য, বুদ্ধ ভিক্ষুর মত হলেও, বোঝা যাচ্ছিল রাগে তার চোয়াল শক্ত। তিনি হাতজোড় করে ক্ষমা চাইলেন। সেই দুঃস্বপ্নের রাতের পর বীণা আর রোমির চোখ কেঁদে কেঁদে ফুলে গেছে। রোমি অনেকবার বমি করেছে। সারা হোস্টেল ক্ষুব্ধ। সকলে সাইন করেছে প্রতিবাদ পত্রে। ওরা তিনজন সেটা নিয়ে এসেছে। অধ্যক্ষ শান্তভাবে বললেন 'আমি অত্যন্ত লজ্জিত এই ঘটনায়। কথা দিচ্ছি এর বিহিত হবে। তোমরা যে আজ পরীক্ষা দিতে পারোনি, তার জন্য আমি চ্যান্সেলরকে বলে স্পেশাল পারমিশন নিয়েছি। তোমরা যেন পরীক্ষা দিতে পারো। আর এই কাজ যারা করেছে, আমার ভবনে, আমার ছাত্রাবাসে তারা থাকবে না।'

পরের দুটো অগ্নিগর্ভ দিন কেটে গেল। ওরা পরীক্ষা দিয়ে হোস্টেলে ফেরামাত্র শ্রীমন্তীদির বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল। 'এত সাহস তোদের? আমাদের না বলে সই কালেক্ট করেছিস? বাদল, পুচাই, রমিতের নামে কমপ্লেন করতে গেছিস? তোদের কোনও আইডিয়া আছে ওরা কী করতে পারে? ওদেরকে যদি হোস্টেল থেকে তাড়িয়ে

দেয়, ওরাও কিন্তু ছাড়বে না তোদের। মনে রাখিস অদের পিছনে পুরো পার্টির সমর্থন আছে।'

পরে বীণা মিনমিন করে জিজ্ঞেস করল 'ওদের উপর শ্রীমন্তীদিদের এত দরদ কেন রে?'

রোমি ঝাঁঝিয়ে উঠল 'আহা ন্যাকা! কোন জগতে থাকিস? শ্রীমন্তীদি রোজ রমিতের হাত ধরে আশ্রম মাঠে সন্ধেবেলা ঘুরতে যায় দেখিসনি নাকি?'

পরেরদিন বিকেলে তিতাস ফিরছিল ডিপার্টমেন্ট থেকে। নন্দন সদনের মোড়ে ওরা ওকে থামালো। ওরা তিনজন। জিন্স, বুক খোলা পাঞ্জাবি, হাতে সিগারেট।

'তিতাস! তোমরা কমপ্লেনটা উইথড্র করে নাও। আমাদের ভুল হয়ে গেছে। ইয়ার্কি মারতে গিয়ে বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। সো স্যরি। এটা আমাদের ভবিষ্যতের ব্যাপার।'

'মাফ করবেন। আপনারা যখন ব্যাঙ ছুঁড়েছিলেন, তখন আমাদের ফাইনাল পরীক্ষা। আমাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেছিলেন কি?'

'না, মানে বুঝতেই পারছ, ইট ওয়াজ জাস্ট আ কিক, টু হ্যাভ সাম ফান, নাথিং সিরিয়াস! আর তোমার যা চেহারা, তোমার ভবিষ্যত তো খুবই উজ্জ্বল। এসো না একদিন আমাদের ক্যান্টিনে, বেশ আলাপ করা যাবে।'

তিতাস হাসল। তার আর ভয় করছিল না। করুণা হচ্ছিল। সে ঠান্ডা গলায় বরফের ছুরির মত কেটে কেটে বলল, 'সেদিন যেমন হল্লা করতে করতে সবার চোখের সামনে আমাদের ঘরে ব্যাং ছুঁড়েছিলেন, সেই রকম আজ দিনের আলোয় সবার সামনে, আমাদের সবার কাছে হোস্টেলে এসে স্যরি বলে যাবেন। কে বলতে পারে, আমার বন্ধুরা হয়তো উইথড্র করে নেবে। আর চেহারার কথা বাদই দিন, আপনাদেরও তো দেখে ভদ্রলোকই মনে হয়। কেউ ইমাজিন করতে পারে রাতের অন্ধকারে আপনারা কী কী পারেন?'

মুখগুলো দ্রুত ভাঙচুর হচ্ছিল।। হিস্‌হিস্‌ করছিল সাপের মত।

'এত স্পর্ধা? দেখে নেব।'

সেদিন রাতে অন্ধকারটা ফালাফালা হয়ে যাচ্ছিল। ওদের তিনজনের নাম করে অশ্লীল, অশ্রাব্য ভাষায় তিনটি মাতাল যুবক হোস্টেলের সামনে দাঁড়িয়ে খিস্তি করছিল। ওদের বাবা-মা, বোন, না দেখা ভবিষ্যত প্রেমিকদের যৌনাঙ্গ আর যৌনাচার নিয়ে গলগল করে বমির মত তরল অপমান উগরে দিচ্ছিল আগামী দিনের চারুকলা বিভাগের চিত্রকর আর ভাস্কররা। সবাই চুপ করে শুনছিল। বীণা আর রোমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। তিতাসের মনে হচ্ছিল কানের মধ্যে দিয়ে গরম লোহার শলাকা ঢুকে যাচ্ছে। একটু পরে দূর থেকে একটা পুলিশের জিপের আওয়াজ আসতেই তাড়া খাওয়া নেড়িকুত্তার মত ওরা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

একটু পরে শ্রীমন্তীদি এসে ছদ্ম সহানুভূতির গলায় বলতে লাগল, 'দেখলি তো, তোদের তখনই বলেছিলাম। ওরা বদলা নেবে।'

এর একবছর পরে তিতাস দার্জিলিং মেলে দিদির বাড়ি জলপাইগুড়ি যাবে বলে ট্রেন ধরতে রিকশা নিয়েছে বোলপুর স্টেশনের পথে। শ্রীমন্তীদি এসে উঠে বসল। চল তোর সাথে যাই স্টেশন অবধি। কেন যেন মনে হচ্ছিল শ্রীমন্তীদির চোখে ডুয়ার্সের সব মেঘগুলো ভীড় করে আছে। একটু নাড়া দিলেই টুপটাপ ঝরে পড়বে অকালবর্ষণ হয়ে। ট্রেনে ওঠার আগে ব্যাকুল হয়ে হাত চেপে ধরল, 'আজ রমিত আমাকে ছেড়ে দিল। ও আমাকে আর চায় না। আমি স্যরি রে তিতাস! তোদের সবাইকে কত ইনসাল্ট করিয়েছি ওকে দিয়ে, ওর জন্য। পারলে মাফ করে দিস এই বোকা দিদিটাকে।'

তিতাস হাঁ করে দেখছিল সেই বোকা দিদিটাকে। সেই একই রকম। জ্বালাময়ী ভাষণ। ভিডিও শেষ হয়ে আসছিল।

জয়নারায়ণ সরকার

আমার মা কখনও মেট্রো রেল চড়েননি

আমার মা কখনও মেট্রো রেল চড়েননি। মহানগরে যখন মেট্রো রেলের কাজ শুরু হয়, তখন মা ভরা সংসার নিজের কাঁধে বয়ে বেড়াচ্ছেন। বাবার অফিসে যাওয়ার আগে রান্নাঘরে প্রাণপাত পরিশ্রমের ফল টিফিন ক্যারিয়ারে বন্ধ হয়ে বাবার ব্যাগে ঢুকে পড়ত। সকালে স্নান সেরে বাবা চটপট তৈরি হতেন অফিস যাওয়ার জন্য। সেই ফাঁকে থালা ভরতি ভাত, ডাল আর আলুভাজা দিতেন বাবার সামনে। প্রতিদিন থালা চেটেপুটে খেয়ে তবে অফিসের উদ্দেশে বেরোতেন বাবা। পাশাপাশি আমাদের স্কুল যাওয়া ও টিফিনের খাবার দিতে একদিনের জন্যও ভোলেনি মা। তাঁর সারাদিনের ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলার একমাত্র ওষুধ ছিল গল্পের বই। প্রায় বিকেল হয়ে আসা হালকা রোদের আলোতে চোখ বুজে একটু জিরিয়ে নেওয়া।

একদিন মা বললেন, হ্যাঁরে, মাটির নীচ দিয়ে নাকি রেলগাড়ি যাবে?

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, হুঁ।

মা ভীত কণ্ঠে বলল, ওমা, যদি মাটি চাপা পড়ে যায়!

আমি হেসে বললাম, তা কেন হবে?

দেখলাম মায়ের ভয়ার্ত চোখ দুটো চকচক করছে।

মায়ের জীবনে ভয় কখনও কাটেনি। বাবার অবসরের পর আমরা সেভাবে চাকরি না পাওয়ায় ভয়টা আরও বেশি গ্রাস করেছিল। মেট্রো রেল চলতে শুরু করলে বাবা বলেছিলেন, চলো একবার অন্তত চেপে আসি।

মা আবার আঁতকে উঠে ছিলেন! মুখে কিছু না বলে তড়িঘড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যান। আসলে দুশ্চিন্তা মায়ের ভয়কে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

বাবা একবার চেপে এসে মায়ের কাছে বলতে গিয়েছিলেন। মা কোনও কথা শুনতে চাননি, বরং সংসারের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কাহিনি বলার চেষ্টা করেছিলেন। তারপর থেকে বাবাও কেমন যেন চুপ করে গিয়েছিলেন।

মাস পেরোতে না পেরোতে আচমকা বাবা চলে গেলেন চিরতরে। মেট্রো রেলের অন্ধকার সুড়ঙ্গের মতো আমাদের সংসারটাও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। ট্রেন এলে সুড়ঙ্গের আলোর দেখা মিললেও আমাদের সংসারে তেমন কোনও আলোর রেখা দেখা যায়নি। একটার পর একটা স্টেশন পার হয়ে অন্তিম স্টেশনে এসে দাঁড়ায় ট্রেন। আমাদের সংসারও যে অন্তিম দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে, মা হয়তো টের পেয়েছিলেন। তাই সুড়ঙ্গের আলো-আঁধারির মতো মায়ের মুখেও ভালো-খারাপের দ্বন্দ্ব ধরা পড়ত। দ্রুত ছুটে চলা ট্রেন ধরতে ব্যস্ত হয়ে

পড়ায় আমরা ভাইবোনেরা কখনও মায়ের মনের কথা জানতে চাইনি।

বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে বছর দুই হয়েছে। ওর হাজব্যান্ড শশাঙ্ক দিলখোলা একটা মানুষ। যখনই সময় পেত ওরা দুজনে মেট্রো রেল চেপে চলে আসত আমাদের বাড়ি। সারাদিন এটা-ওটা গল্প আর হইহুল্লোড়ে কেটে যেত। মা খুব একটা খুশি হতেন না। বোন একবার থাকতে না পেরে বলেছিল, কী হয়েছে তোমার? আমরা আসলে মুখটা ভার করে রাখো। মেয়ে-জামাই এসেছে বলে কোথায় খুশি থাকবে, তা না!

সোফায় বসে উদাস দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকত। মেয়ের কথাগুলো যেন শুনতে পাননি।

বোন অভিমান ভরা গলায় বলেছিল, আমাদের আসাটা তোমার অপছন্দ হলে আর আসব না।

জানলা থেকে মুখ ঘুরিয়ে গম্ভীর স্বরে মা বলেছিল, নিজের সংসারটা আগলে রাখ। দেখবি তাতে কত সুখ। শ্বশুর- শাশুড়ির বয়েস হয়েছে, তোদের সঙ্গ পেতে তাদেরও তো ইচ্ছে করে।

বোনের পাশে চুপ করে বসে থাকা শশাঙ্ক বলে, আমার মা-বাবাকে নিয়ে ভাববেন না। ওঁরা নিজের মতো বাঁচতে ভালোবাসেন।

কথাটা শুনে মায়ের ঠোঁটের কোণে একচিলতে হাসি দেখা যায়। বলেন, কেউ কি আর একা একা বাঁচতে ভালোবাসে! উপায় না থাকলে কী আর করবে!

মায়ের কথা শোনার পরও ওদের আসা-যাওয়ার কোনও তফাৎ হয়নি, কয়েক মিনিট অন্তর অন্তর ছুটে চলা মেট্রো রেলের মতো।

সেদিন সকাল থেকে শহরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় বাসের সংখ্যা কম। পাশের বাড়ির হরেনজেঠু অফিস যেতে পারেননি। বাসস্টপে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বাড়ি ফিরে এসেছেন। রুনা জঠিমা বলেছিলেন, মেট্রো রেলে চলে যেতে পারতে! হরেনজেঠু সঙ্গে সঙ্গে বলে, যা ভিড় হবে, ওঠা যাবে না। তাছাড়া মাটির নীচে আমার কেমন দমবন্ধ হয়ে আসে। রুণা জেঠিমা হেসে বলেছিল, ওটা তোমার ফোবিয়া।

একটু বেলা বাড়তে জেঠিমা কথাগুলো শুনিয়ে যায় মাকে। বৃষ্টি এখন একটু ধরেছে। স্যাঁতস্যাঁতে ভিজে ওঠা দিনে খিচুড়ি রান্নাতে মগ্ন হয়ে পড়েছেন মা।

বিকেল হতেই মেঘ কেটে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে গেছে। অল্প অল্প আলো দেখা যাচ্ছে। মা রেডিও চালিয়ে রবিঠাকুরের গান শুনছেন। বাড়ির সামনে একটা রিকশা এসে থামে। রিকশা থেকে নেমে মায়ের ঘরে ঢুকে যান বোনের শাশুড়ি। ঘরে ঢোকামাত্র বিছানায় শরীর এলিয়ে দেওয়া মা চটপট উঠে বসেন। হাতে ধরা গল্পের বই। খানিকটা বিস্ময়ের সুরে বলেন, দিদি, আপনি!

বোনের শাশুড়ি মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন, হ্যাঁ বেয়ান। নিরুপায় হয়ে আপনার শরণাপন্ন হলাম।

বোনের শাশুড়ি শিক্ষকতা করতেন। গুরুগম্ভীর হওয়ায় ছাত্রীরা নাকি ওঁকে ভয় করত। কিন্তু আমরা কেউ কখনও ওঁকে সেভাবে দেখিনি। হাসি, গল্পে মেতে থাকতে দেখেছি। সবার খোঁজখবর নিতেন। যখনই ওঁদের বাড়ি গিয়েছি, কখনও না খেয়ে আসতে দেননি। বরং আমরা কেউ গেলে বোন অসন্তুষ্ট হতো। সেটা ওর ব্যবহারে প্রকাশ পেত। সেই কারণে ধীরে ধীরে আমাদের যাতায়াত প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। একমাত্র পুজোর জামা-কাপড় দিতে ওই একবারই যাওয়া হতো। শেষবার বোনের শাশুড়ি বার বার খেয়ে যেতে বললেও বেরিয়ে আসতে হয়েছিল সাত তাড়াতাড়ি। সংসারে আধিপত্য হারানো এক মহিলার কথা কেউ শুনেও শোনেনি। ভদ্রমহিলার মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়ার ভয়।

ঘরের এক কোণায় দাঁড়িয়ে ওঁকে দেখছিলাম। হঠাৎ মায়ের চোখে চোখ পড়তে মা বললেন, দরজা ভেজিয়ে দিয়ে তুমি তোমার ঘরে যাও। আমরা একটু কথা বলব। দরকার পড়লে তোমায় ডেকে নেব।

আমি আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে এলাম। উনি চলে যাওয়ার পরে মাকে দেখে চমকে উঠেছিলাম। এক কঠিন মুখ নিয়ে বিছানায় বসে আছেন। দাঁতের পাটি দুদিকের গালে ঝুলে পড়া চামড়ার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কয়েকদিন বাদে বোনও এসেছিল। মায়ের ঘরের দরজা বন্ধ করে দুজনের গুরুগম্ভীর কথাবার্তা হয়েছিল। শশাঙ্ক এসে আমার ঘরে বসে নানা গল্পে মেতে উঠেছিল। হঠাৎই বিভ্রান্ত মুখে বোন এসে শশাঙ্ককে জোর করে নিয়ে রওনা হয়। শশাঙ্কের যাওয়ার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। সে রাতের খাবার খেয়ে যেতে চেয়েছিল। অবশ্য ওভাবে ওদের চলে যেতে দেখে মা একটা কথাও বলেনি। নিজের ঘরে, নিজের বিছানায় বসে একমনে টিভি দেখছিলেন।

কয়েক দিন পরে একটা বড় মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে হাজির হয়েছিলেন বোনের শাশুড়ি। মিষ্টির প্যাকেটটা মায়ের হাতে দেওয়ার সময় মুখে ছিল বিজয়িনীর হাসি। অন্যদিকে মা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ওঁর মুখের দিকে।

তারপর থেকে বোন, শশাঙ্ক কদাচিৎ আসে মেট্রো রেল চেপে। একমাত্র ভাই খানিকটা দাঁতে দাঁত চেপে বাড়িতে ছিল। বিয়ে হওয়ার কয়েক বছর বাদে শ্বশুরবাড়ির কাছাকাছি ঝকঝকে ফ্ল্যাটে আনাগোনা, তারপর স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছে ওই মেট্রো রেল চেপে।

মেট্রোরেল চাপতে আমাদের কারোর ভয় করেনি। একমাত্র মায়ের ছাড়া। তাই হয়তো শেষ সম্বলটুকু আঁকড়ে ধরেছিলেন!

অন্তিম স্টেশনে গাড়ির কামরা খালি করার ঘোষণা হতেই বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। খালি ঘরে পড়ে থাকা একাকিনী মায়ের শক্ত হয়ে ওঠা শরীরটা পুলিশের হেফাজতে চলে যায়। খবর পেয়ে যে বাড়ি থেকে রওনা দিই, সেই বাড়িটা আমার নয়। শ্বশুরমশাই বলেছিলেন, এখানে থাকতে তোমার কোনও অসুবিধা হবে না। না, তা হয়নি। সেই কবে মেট্রো রেল চেপে তড়িঘড়ি উঠেছিলাম হাইরাইজ বিল্ডিংয়ের প্রশস্ত ব্যালকনির ঘরে।

মায়ের কাটা-ছেঁড়া দেহ ফিরে পেতে আমাদের মধ্যে ছটফটানি শুরু হয়। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট কী হবে, তা নিয়েও যথেষ্ট উত্তেজনায় ভুগছিলাম আমরা সবাই। রিপোর্ট দেখার জন্য অন্য ঘরে চলে যাওয়ায় মায়ের শক্ত হয়ে যাওয়া দেহটা একাকী শুয়ে থাকে বড় একটা ট্রের মধ্যে। কতক্ষণ ওভাবে ছিলেন, সময়ের হিসেব করা হয়ে ওঠেনি, উত্তেজনা নিরশনে আমরা ব্যাকুল। মেট্রো রেলে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসা যাত্রীদের মতো তিন সন্তান বসেছিলাম পোস্টমর্টেম ঘর লাগোয়া বাইরের বারান্দায়।

মেট্রো রেলে কোনও দিন না ওঠায় মা জানতেই পারেনি, এভাবেও বেঁধে বেঁধে থাকা যায়। মায়ের কোনও অভিব্যক্তি ধরা পড়েনি কঠিন হয়ে ওঠা চোখে-মুখে।

শেষবার মায়ের ঘরের মেঝেতে দেহটা রাখা হয়েছিল। সেই স্যাঁতসেঁতে, ভিজে ওঠা দেওয়ালে মেট্রো রেলের প্রতিচ্ছবি! ■